শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
২৫টি প্রাপ্তবয়স্কদের গল্প

# ২৫টি প্রাপ্তবয়স্কদের গল্প

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

দীপ প্রকাশন
২০৯এ, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৬

শ্রীমতী কণা বসু মিশ্র
প্রীতিভাজনেষু

প্রাপ্তবয়স্কদের গল্প নামাঙ্কিত এই সংকলনটিতে আমার কয়েকটি গল্প আছে যা বেশ পুরোনো, কয়েকটি তত পুরোনো নয়, আর কতিপয় অত্যল্পকাল আগে লেখা। সম্পাদক শ্রীমান অয়ন বেশ ভেবেচিন্তে গল্প চয়ন করেছেন। তবে একমাত্র আমিই জানি যে, কিছু গল্প আছে যা লেখার সময় তার ওপর আমার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিলনা। লেখক সর্বদা একই ভাবভূমিতে থাকেন না, কিংবা নানা কারণে তাঁর মনোবিক্ষেপ ঘটতেই পারে, তবু তাঁকে হয়তো লিখতেই হয়। সেই কারণে গল্পের বুনন তাঁর মনোমতো হয়ে ওঠে না। এই সংকলনে যেমন 'কয়েকজন ক্লান্ত ভাঁড়' গল্পটি। এটি আমার কাঁচা বয়সে লেখা। লেখার সময়েই টের পাচ্ছিলাম যে, নির্মানটি আমার ভিতর থেকে আসছে না, রচিত হচ্ছে বটে, কিন্তু তাতে আমার অন্তরাস নেই।

আর 'নীলুর দুঃখ' গল্পটির কথাও বলা দরকার। এটি আমি লিখেছিলাম দেশ পত্রিকার জন্য। কিন্তু লেখার পর মনে হল, গল্পটি এতই নিম্নমানের হয়েছে যে, দেশ পত্রিকায় দেওয়া যায় না। তাই তখন এক অখ্যাত পত্রিকা বায়না করায় দিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু প্রকাশের পর গল্পটি নিয়ে প্রায় হৈহৈ পড়ে গেল। এত সাধুবাদ আমি খুব কম লেখার জন্য পেয়েছি। তা এরকম সব হয়। আমি নিজে আমার লেখার মূল্যায়ন করার মতো জায়গায় নেই। নিজের লেখার বিচার করার আমি কে? আমি শুধু আমার মতো করে লিখি, তার ভালমন্দ বুঝতে পারি না।

সব গল্পেরই এরকম কিছু প্রেক্ষাপট আছে। তবে সেই ঝাঁপি খুলে বসে লাভ নেই। রচনাগুলি সবই বিভিন্ন সংকলনে গ্রন্থিত হয়েছে। তবে এই গ্রন্থে তা এক বিশেষ মাপকাঠি মেনে স্থান পেয়েছে।

পাঠকের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হল বটে, তবে গ্রন্থটি পাঠকের মনঃপুত হয় কিনা, তারই অপেক্ষা।

বিনীত
গ্রন্থকার

# গল্পক্রম

# কয়েকজন ক্লান্ত ভাঁড়

প্রথমে ভূপতি ঢুকল। তারপর অনিমেষ। সব শেষ সুকুমার।

ভূপতির হাত সামান্য কাঁপছিল, যেন এই ঘরে ও প্রথম আসছে। ইন্টারভিউ দেওয়ার মতো উত্তেজনা। মুখের হাসিটা ছিলই। সেটাকেই শেষ অবলম্বন করে চৌকাঠ পেরোতে গিয়ে শব্দ করে হাসল ভূপতি।

অনিমেষ পর্দাটিকে অনেকটা সরিয়ে দিল যেন ওটা যে এ ঘরের আব্রু সেটা তার মনে হয়নি। ভ্রূ কুঁচকে নিজের মুখে কয়েকটা ভাবনাচিন্তার রেখা ফুটিয়ে তুলল। ওর মনে হল ওকে দেখেই সবাই হেসে ফেলবে।

সুকুমার সবচেয়ে আস্তে ঢুকল, যেন ওর ঢোকাটা কেউ মনোযোগ দিয়ে দেখছে। খুব মেপে মেপে পা ফেলল আর যতদূর সম্ভব শিরদাঁড়াকে টান রাখল। জানে দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরলে ওকে সুন্দর দেখায়।

তিনজনের কেউ আগে কেউ পেছনে দাঁড়াল। প্রত্যেকেরই নিজের দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে মনোযোগ।

ঘরটা ছোট, নিখুঁত চৌকোণা। কেউ যেন খুব সাবধানে মেপে একটা সাদা পাথর খুঁজে ঘরটা তৈরি করেছে। তিনটে জানলা দিয়ে বিকেলের আলো আসছে—ঘরটা এত ছোট যে মনে হয় এত আলোর দরকার ছিল না। পাতলা মিহি সাদা গোলাপি রঙের পরদা জানলায়। নতুন কেনা টেবিলের ওপর কিছু বই উপহারের দেয়াতদানি, বাসি ফুল এলোমেলো, নতুন খাটের ওপর নতুন বিছানার চাদর, পাটভাঙা নতুন শাড়ি, শার্ট, সিল্কের পাঞ্জাবি এলোমেলো। একটা ছোট আলমারি আয়না দেওয়া। মেঝেতে খোলা ট্রাঙ্ক, পাশে খবরের কাগজ বিছিয়ে কেউ থাক করে করে লাল, হলদে এবং মিশ্রিত অদ্ভুত রঙের অনেকগুলো শাড়ি সাজিয়ে রেখেছে। যেন শাড়িগুলো গোনা হচ্ছিল, তাদের পায়ের শব্দ পেয়ে কেউ উঠে গেছে।

—এসে ডিস্টার্ব করা গেল। ভূপতি বলল। সে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আয়নায় নিজের মুখ দেখতে পাচ্ছিল। অনিমেষ নিজের কাঁধ দেখছিল। সুকুমার জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল যেন কেউ না ডাকলে মুখ ফেরাবে না।

—ওরা বোধহয় বেরোতো। অনিমেষ বলল।

—বাঃ, আমাদের আসতে বলা হয়েছিল যে—সুকুমার মুখ না ফিরিয়ে ফিসফিস করে বলে।

ভূপতি হাসে। অনিমেষ খাটের কাছে এগিয়ে গিয়ে পাটভাঙা নতুন শাড়িটা সরিয়ে দিয়ে বসবে কিনা ভাবতে ভাবতে দাঁড়িয়ে থাকে। ওকে চিন্তিত প্রবীণের মতো দেখায়। যেন এই ঘরের কোনো জিনিসপত্র বা বিষয়বস্তুর ওপর তার সমর্থন নেই।

ভূপতি এই ঘরের অবস্থা দেখে মনে মনে যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত কয়েকটি সিদ্ধান্তে আসতে চেষ্টা করে। সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ঘরটাকে দেখে। নতুন চুনের গন্ধ পায়। কোরা কাপড়ের গন্ধ। ইউ—ডি—কোলোন। জানালা দরজায় বার্নিশ।

—ওঃ খুব হাঁটা হয়েছে। অনিমেষ বলে।

—তোর জন্যই তো। সুকুমার গলায় ঝাঁজ নিয়ে অনিমেষের দিকে তাকায়—আমরা একঘণ্টা আগে বেরিয়েছি। তখন ট্রামে বাসে ভিড় ছিল না।

—তোদের কি, সরকারি অফিসে কাজ করলে অফিসে ঢুকবার আগেই বেরোনো যায়।

—প্লিজ, ভূপতি বলে। সুকুমার আবার মুখ ফিরিয়ে জানলার বাইরে তাকায়।

—ক—দিন হল বলতে পারিস? ভূপতি থুতনির দাড়ি চুলকোলো।

—কিসের? সুকুমার মুখ ফেরায়।

—ওদের বিয়ে।
—ওঃ। সুকুমারকে নিরুৎসুক দেখায়।
অনিমেষ মনে মনে হিসেব করে।
—একমাস বোধহয়।
—কী হয়েছে। সুকুমার লাল হয়।
—যাঃ বাবা, তোর সবতাতেই লজ্জা। ভূপতি বলে,—একটু আওয়াজ দে। নইলে কখন বেরোবে ঠিক কি?
ভেতরের দরজায় পরদা সরিয়ে রজত ঢুকল। ঢুকতে ঢুকতেই চেঁচিয়ে বলল,—এই যে, এসে হাজির তোরা, সুকু, গৌরীপ্রসন্ন অ্যান্ড দি ওল্ডম্যান! বাট ইউ আর লেট পলস। চারটের সময় দেওয়া ছিল যে! এখন সাড়ে পাঁচ।
সুকুমার ভূপতির পাশে দাঁড়াল। ভূপতি বলল,—বেশ লোক!
অনিমেষ পকেট থেকে রুমাল বের করে বলল,—লুক হিয়ার, ইয়ংম্যান, নাউ ওয়াচ হোয়াট ইউ সে। আমরা মেহনত করে খাই—
রজত জোরে হাসল। মসৃণভাবে কামানো গাল, ফর্সা পায়জামা আর গেঞ্জিতে ওকে খুব তাজা দেখায়। হাতে নতুন ঘড়ি। বলল—সরি।
রজত দ্রুত হাতে খাটের ওপর থেকে জামাকাপড়গুলো সরিয়ে দিয়ে জায়গা করে দিল। বলল,—বোস।
অনিমেষ খাটের রেলিঙে হেলান দিল। ওর পায়ের কাছে সুকুমার পা ঝুলিয়ে বসল; ও পাশের বেঞ্চিতে ভূপতি হেলান দিয়ে বসল। রজত টেবিল থেকে বই নামালো মেঝেতে। তারপর টেবিলটা খাটের কাছে টেনে নিয়ে তার ওপর হাঁটু তুলে বসল।
—তারপর? রজত বলল।
—দেখতে এলাম। অনিমেষ গম্ভীর থাকবার চেষ্টা করে।
—তোদের খবর আগে বল। রজত বলে।
—নো নো। ভূপতি সিগারেট ঠোঁটে চেপে সাহেবি কায়দায় বলল!
—দেখতে এলাম। অনিমেষ তেমনি গম্ভীরভাবে বলে।
—কী? রজত বলে।
—পাখিটা আর কি ছটফট করে? উড়িবার জন্য আর কি ডানা ঝাপটায়? নড়িতে চড়িতে পায়ের শিকলটা কি ঠুন ঠুন করিয়া বাজে? উইথ ডিউ রেসপেক্ট টু দিন পোয়েট, সেটা কি আদৌ শিকল? অনিমেষ থামে।
—আসল কথা তোমার এক্সপিরিয়েন্সটা বল। ভূপতি ধোঁয়া ছাড়ল মেঝেতে সিগারেটের ছাই ঝেড়ে।
—ইয়ার্কি করিস না, এটা কফি হাউস নয়! সুকুমার খুব ঠান্ডা গলায় বলল।
অনিমেষ সোজা হয়ে রজতের দিকে তাকাল। রজত হাসছিল। অনিমেষ ফাঁপা গলায় বলল,—এসো রজত আমরা অ্যালায়েন্স করি। আমরা ব্যাচেলরদের সঙ্গে কোনো করুণ ব্যবহার করব না। পুওর সোলস দে ডোন্ট ডিজার্ভ ইট।
ভূপতি অবিচলভাবে বলল, সুকুমারের যেখানে হার্ট থাকা উচিত সেখানে একটি ভগবদগীতা আছে। সেই গীতাই ওকে খেলো।
—গীতা? আই সি? অনিমেষ ভ্রূ কোঁচকাল।
সুকুমার নিজের রাগ চাপা দিয়ে হাসতে চাইল। মুখ তুলে তিনজনের দিকে তাকাল। ভূপতি নির্বিকার। অনিমেষ যেন চিন্তিত। রজত হাসছে। সুকুমার লাল হয়ে হাসে।
রজত কোমরের ভাঁজ থেকে ক্যাপস্ট্যানের প্যাকেট বের করে একটা নিয়ে প্যাকেটটা তিনজনের দিকে বাড়িয়ে দেয়। অনিমেষ আর সুকুমার একটা করে সিগারেট নেয়। ভূপতি বলে—'থ্যাঙ্কস'।

রজত সিগারেট ধরিয়ে বলল—আসলে কি জানিস ছাপা—বাঁধাই মন্দ নয়, প্রচ্ছদপটও ভালো, তবে—

—বাজে উপমা। অশ্লীল। সুকুমার বলল খুব আস্তে। ভূপতি উদাস গলায় বলল—বলে ফেল। তবে—

—তবে আগের লাভার—টাভার আছে কিনা জানতে হলে পুরো উপন্যাসটা পড়তে হয়। সেটা সময়সাপেক্ষ। রজত ধোঁয়া ছেড়ে অনিমেষের দিকে তাকায়।

—আগে কহ আর! অনিমেষ বলে।

রজত হাসে,—ওল্ডম্যান, তুমি রোমান্টিক নও সুকুমারের মতো। সুকুমার অভিজ্ঞ নয় তোমার মতো। ও এখনো ছেলেমানুষ—

—হুঁ, আমাদের দায়িত্ব—অনিমেষ বলে।

ভূপতি চুপ করে ধোঁয়া ছাড়ে। সুকুমার বলল—ক্যারি অন।

রজত সুকুমারের দিকে তাকায়,—তোমাকে নষ্ট করতে চাই না।

—তোমরা ওকে অপমান করছ। ভূপতি বলে কোনোদিকে না তাকিয়ে সুকুমার হয়ে থাকাটাই ওর ধর্ম, যেমন জলের ধর্ম তারল্য তেমনি শিশুর ধর্ম সারল্য। বিবাহিত হলে ওর ধর্ম পালটাবে, যেমন জল জমে বরফ হয় শিশু পক্ক হলে অনিমেষ কিংবা ভূপতি হয়।

ওঃ, অনিমেষ ধোঁয়া ছাড়ে,—শিশু এবং বৃদ্ধদের সামনে লজ্জা করতে নেই।

সুকুমার কথা বলল না। সন্তর্পণে সিগারেটের ছাই মেঝেতে ঝেড়ে পা দোলাতে লাগল। অনিমেষ পা ছড়িয়ে শরীরটাকে ছেড়ে দিল যেন এটা ওর নিজের ঘর। রজত টেবিলের থেকে পা নামিয়ে চটিতে পা ঢোকাল। দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল,—বৃদ্ধদের কথায় একটা ঘটনা মনে পড়ল। গোল দীঘিতে বিকেলবেলায় এক বুড়ো আর এক বুড়োকে নিজের দেশি ভাষায় বলছিল—'বয়সকালে আমরাও দুই চাইরটা মাইয়া নষ্ট করছি, কিন্তু রায়মশায়, এখনও যখন দেখি বয়সের মাইয়াগুলা বুকটান কইর‍্যা রাস্তা দিয়া হাঁটে তখনও ইচ্ছা করে যে—'

অনিমেষ সোজা হয়ে বসে দ্রুত প্রশ্ন করে—কী ইচ্ছে করে?

রজত হাসল,—প্লিজ, আর এগোতে পারব না। সুকুকে কনসিডার কর।

সুকুমার হাসি চেপে গম্ভীর থাকতে চাইল। ভূপতি অবহেলায় একটু হাসল। অনিমেষ চিন্তিতভাবে গালে হাত দিল।

সুকুমার খুব আস্তে প্রায় নিশ্বাসের সঙ্গে রজতকে বলে,—তোকে দেখে মনে হচ্ছে না যে তুই সদ্য বিবাহিত!

—আ হা, আমি সদ্য বিবাহিত! রজত প্রথমে অনিমেষ তারপর ভূপতির দিকে তাকায়। হাসে হি হি করে।

সদ্য বিবাহিত! অ্যাঁ?—অনিমেষ, হাত ঘষে সিনেমার কোনো ভিলেনকে নকল করে হাসল।

ভূপতি গম্ভীরভাবে সুকুমারের দিকে তাকায়,—প্রিয় সাহিত্যিক, তোমার মন তোমার লেখনীর অনুধর্ম নয়। তুমি ভাবো এক লেখো অন্য।

—কলমের আব্রু ঘোচাও, কবি। রজত হাসে।

অনিমেষ হাতের ছোট হয়ে আসা সিগারেটের দিকে তাকিয়ে বলে,—সেই কারণেই পৃথিবীর কোনো জিনিসকে আমি ঘেন্না করি। যেমন কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, প্রেমিক, রজনিগন্ধা এবং বিলিতি কুকুর।

—যাঃ ভালো লাগে না। সুকুমার ঠোঁট বেঁকায়।

ভূপতি আর অনিমেষ দুজনে দুজনের দিকে তাকাল।

—তুই কবি। অনিমেষ বলে।

—তুই সাহিত্যিক। ভূপতি বলে।

—তুই শিল্পী।

—তুই প্রেমিক।
—তুই রজনিগন্ধা।
—তুই...
ভূপতি হঠাৎ থাকে। অনিমেষের পা নাচানো বন্ধ হয়। রজত দু'হাত শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে হাই তুলে বলে—টা—য়া—র্ড।
ওঃ। সুকুমার দূরের জানালা দিয়ে আকাশে তাকায়।
—কথাটা হচ্ছে কাওয়ার্ডস ডাই মেনি টাইমস বিফোর—ভূপতি একটু থামে। তারপর উদাস গলায় বলে—দেয়ার ডেথ। অর্থাৎ বিবাহিত হওয়ার আগেই আমরা মনে মনে বহু বিবাহ করে থাকি। মনের হারেম কখনো শূন্য থাকে না, কবি। সেদিক দিয়ে আমরা কুলীন।
রজত খাটের তলা থেকে একটা গ্যাটাপার্চারের কালো অ্যাশট্রে বের করে সিগারেট ফেলে বলে—স্বাধীন ব্যক্তিরা কখনো অ্যাশট্রেতে সিগারেট ফেলে না। এখন অভ্যেস করতে হচ্ছে। তার মানে—
—ওঃ জমেছে। ভূপতি বলে। রজত বলল—তার মানে জমছে। আমি জমে যাচ্ছি। সুকুমার অ্যাশট্রেটার জন্য হাত বাড়ায়।
—কেমন জমছে বল। অনিমেষ কৃত্রিম সুরে বলে।
—সুপার। রজত হাসল,—ও ছেলেবেলা থেকেই উত্তরপ্রদেশে। সে জন্যে কথায় একটু টান আছে, তাতে আবহাওয়াটা আরও মিষ্টি হয়।
—যথা—? ভূপতি সুর টানে।
—যেমন পড়ে গেল—কে বলে গিরে গেল, 'বাসন'—কে বলে 'বর্তন', তুমি দুষ্ট না—বলে বলে 'তুমি দুষ্টু হচ্ছ'।
অনিমেষ বুকে হাত চেপে চাপা চিৎকার করল,—উঃ তোকে চাক্কু মারছে।
রজত হাসে। সুকুমার মাথা ওঠায় না। ভূপতি আর একটা সিগারেট ধরায়।
রজত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল—রেডি হয়ে নে। ডাকছি।
রজত ভেতরের দরজার কাছে গিয়ে পর্দাটা ছুঁয়ে ফিরে তাকাল। হেসে বলল,—অন ইওর মার্ক। রেডি। সুকু, স্মাইল প্লিজ, একটু চোখ তুলে নাকিও, মেয়েদের দিকে না তাকানো মানে ইনসাল্ট। তারপর অনিমেষকে বলল,—ওল্ডম্যান, তুমি সব দেখবে জানি কিন্তু কথা শুনে হেসো না।
—সুকু হইতে সাবধান। ভূপতি বলে।
রজত হাসল,—আমি ওকে বলে রেখেছি যারা আসছে তাদের মধ্যে একজন সাহিত্যিক আছে। সেই শুনে ও ভয় পেয়েছিল। সাহিত্যিকরা নাকি ক্যামেরার চোখের মতন, ফাঁকি দেওয়া যায় না। সে জন্যেই মেয়েরা সাহিত্যিকদের ভয় পায়।
—সুকু, তোমার কেস খারাপ। অনিমেষ মাথা নাড়ল।
—বাঃ, তাতে আমার কী? সুকুমার মাথা তুলে বলে, আমি সাহিত্যিক নই, বিলিতি কুকুরও না। কেউ যদি বানিয়ে বলে—
—তুমি সাহিত্যিক নও? অনিমেষ প্রশ্ন করে।
—আমি মনে করি না। সুকুমার ঝাঁঝালো গলায় বলে।
রজত দরজার কাছ থেকে বলে—তোরা কতক্ষণ চালাবি? আবহাওয়া অনুকূল না হলে আমি সাহস পাচ্ছি না। প্লিজ—
—আমরা একযোগে সুকুমারকে ক্ষমা করছি। অনিমেষ হাসে। ওর মুখে রাগের চিহ্ন নেই।
সুকুমার বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর ঠোঁট দুটো সাদা আর অল্প কাঁপছে।
—তুই রেগেছিস। অনিমেষ বলে। সুকুমার উত্তর দেয় না।

রজত পরদা সরিয়ে ভেতরে যায়। পরদার ওপাশ থেকে ওর গলা শোনা যায়,—অন ইওর মার্ক, ফেলাজ। রেডি।

—বিচিত্র রঙ্গমঞ্চ। ভূপতি উত্তর দিল।

—একটা সিগারেট খা। অনিমেষ পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে সুকুমারের দিকে এগিয়ে দিল। সুকুমার সিগারেট নিয়ে হাসল, বলল,—ধন্যবাদ। কিন্তু খাব না, নট বিফোর লেডিজ।

—বিচিত্র রঙ্গমঞ্চ। ভূপতি আবার বলল।

অনিমেষ সুকুমারের হাত থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা ফেরত নিয়ে বলল—ভূপতি, অস্ত্র সংবরণ কর। ওকে রাগিও না। এই সিচুয়েশনে ওর নার্ভ ফেল করলে কেলেঙ্কারি। ওকে শান্ত থাকতে দাও। শান্ত হয়েও কোনো সুন্দর মেয়েমানুষ কথা ভাবুক।

—আঃ কি হচ্ছে! ভূপতি উঠে সোজা হয়ে পা নামিয়ে বলল। বলল,—ইউ আর আউট টু—ডে। বিনা মদেই মাতাল।

অনিমেষের মুখটা বোকা বোকা হয়ে গেল। ও সোজা হয়ে বসে পা নামালো,—কী করব? উঠে দাঁড়িয়ে বাও করব না হাতজোড় করে—

—ফুঃ—ভূপতি বলে,—তুমি বাও করবে, আমি কুর্নিশ, আর সুকু অর্ধেক উঠে এবং অর্ধেক ব'সে ঘরেও নহে পারেও নহে গোছের মুখ করে মিষ্টি হেসে বলবে ন—ম—স্কা—র।

ভূপতি চুপ করল। অনিমেষ একটু হাসল। সুকুমারের কথা বলল না। পাশাপাশি পা ঝুলিয়ে চুপ করে রইল।

ঘরের কোথাও ঘড়ি ছিল না। কিন্তু সুকুমার মনে হল কানের কাছে অবিশ্রান্তভাবে প্রতিটি সেকেন্ড টিপ টিপ করে কলের জলের মতো বয়ে যাচ্ছে। নিজের হাতঘড়িটা কানের কাছে তুলে খুব ক্ষীণ শব্দ শুনল। ভাবল প্রতিটি সেকেন্ডই প্রয়োজনীয় নয়। কয়েকটি সেকেন্ড মূল্যবান কখনো কিছু ঘটলে। বাদবাকি সময় প্রতীক্ষাশূন্য, ঘটনাবিরল, অর্থহীন। এই ঘরে এমন কিছু নেই যাতে মনোযোগ দেওয়া যায়। তবে এই ঘরের ভিতরই খুব অস্পষ্ট মৃদু লয়ে কি যেন একটা বদলে যাচ্ছে কার যেন একটা রূপান্তর—

রজত ভেতরে যাওয়ার পর পাঁচ মিনিট হয়েছে। ভূপতির মনে হল রজত বহুক্ষণ গত। যেন চেষ্টা করলেও রজতের মুখটা মনে আসবে না। তবু সময় স্থির হয়ে আছে। অনড়, অচল, নিষ্ঠুর। কেউ এলেও কিছু না, কেউ গেলেও কিছু না। আসলে কিছুতেই কিছু না—

সাতটা সতেরোতে একটা ট্রেন তারপর সাড়ে আটটায়। ভাবল অনিমেষ। কবজি উলটে ঘড়ি দেখল। এখন ছ—টা। পদ্মপাতায় পা ফেলে আসবার মতো আস্তে আস্তে রজতের বউ আসবে। আস্তে কথা বলবে অনেকক্ষণ সময় নিয়ে। অনেকক্ষণ সময়ে চায়ের পেয়ালার চামচ নাড়বে আর নিজের হাতের নতুন সোনার চুড়ির শব্দ শুনবে ঠুন ঠুন। ঘড়ি দেখতে ভালো লাগে না। কেমন যেন মন—খারাপ হয়। তবু সাড়ে আটটায় একটা ট্রেন, তারপর কখন কে জানে—

—রজতদা দেরি করছে। অনিমেষ বলে।

—আমাদের শুধু শুধুই আসা। আসলে—ভূপতি থামে।

—আঃ, আস্তে। পায়ের শব্দ—সুকুমার বলল।

পর্দা সরিয়ে রজত ঘরে ঢুকল—এই যে! ওঃ! অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি। তারপর রজত পেছন ফিরে দরজার দিকে তাকিয়ে অন্তরালবর্তী কাউকে বলল—বুলা, এরা আমার বন্ধু, এসো।

একটা মোমের আলোর মতো নরম হলুদ হাত নীল পরদাটাকে সরিয়ে দিল। সোনার চুড়ির শব্দ হল ঠুং করে। চাবির শব্দ। প্রথমে ফুলের গন্ধের মতো একটা কোনো গন্ধ ঘরের বাতাসে ছড়িয়ে গেল। তারপর বুলা এসে দাঁড়াল ঘরের মাঝখানে। পরনে হলুদ শাড়ি হলুদ ব্লাউজ।

রজত বুলার দিকে তাকাল তারপর তিনজনের দিকে। তারপর আবার বুলার দিকে তাকাল। শেষপর্যন্ত তিনজনের দিকে তাকিয়ে বোকার মতো হেসে বলল,—এই হচ্ছে বুলা। আমার—

অনিমেষ উঠে দাঁড়াতে গিয়ে আবার বসল। ওর পায়ের চটির শব্দ হল। হাতজোড় করে বলল—নমস্কার।

ভূপতি দেখল বুলা ওকে দেখছে না। বুলা কোনো দিকেই তাকিয়ে নেই। ভূপতি একটা হাত সেলামের ভঙ্গিতে মাথার কাছে তুলল কী ভেবে সেই হাতটা দিয়েই কপালটা চুলকোলো।

সুকুমার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করল। মুখে কিছু বলল না। বসল।

রজত নাটকীয় ভঙ্গিতে সামনের দিকে ঝুঁকে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল,—ইনি অনিমেষ সেন।

বুলা বলল,—নমস্কার।

—ইনি সুকুমার চট্টোপাধ্যায়।

—নমস্কার। বুলা বলল।

—ইনি ভূপতি রায়চৌধুরী।

বুলা বলল,—নমস্কার।

—আর আমি অধম শ্রী—

বুলা বলল—থাক—চিনি—

বুলা মিষ্টি হাসল। যেন ও সকলের চেয়ে আলাদা। বলল,—ওর কাছে আপনাদের কথা শুনেছি। আপনাদের প্রায় চিনি।

বুলার গলায় এতটুকু জড়তা নেই, কথার টান পরিষ্কার, তবে ও 'র' কে 'ড়' উচ্চারণ করে সুকুমার লক্ষ্য করল। ওর গায়ের রং লালচে আভা মেশানো হলুদ। সম্ভবত ও হলুদ মেখে চান করে। হাতে মেহেদি পাতার অস্পষ্ট রং। আঙুল সুঠাম হাতের আঙুলের মতো সদৃশ—সম্ভবত কথক নাচের যে কোনো মুদ্রা অনায়াসে আঙুলের ঢেউ তুলতে পারে—এমন লীলায়িত,—হাড়, বোঝা যায় না। ওর মুখ গোল, চোখ মানা, চোখের তারা একটু চঞ্চল কালো, সপ্রতিভ। কপাল ছোট, মাথায় চুল টান করে বাঁধা। শাড়ির রং পুজোর সময়ে গ্রামে দেখা কোনো মেয়েকে মনে করিয়ে দেয়।

বুলা রজতের কাছ থেকে আলাদা হয়ে একটু দূরে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। ওকে রজতের চেয়ে লম্বা বলে মনে হল ভূপতির। সম্ভবত আলাদা করে দেখেছে বলেই এমন মনে হল। পাশাপাশি দাঁড়ালে ও রজতের কান ছাড়িয়ে যাবে না। ওর দেহ—কে প্রায় লতার মতো বল যায়—পেলব এবং ভারাক্রান্ত। মেয়েদের দেহের যে যে জায়গাগুলো উঁচু কিংবা নিচু বা সমতল হওয়া ভালো—ওর দেহও ঠিক তেমনভাবেই ভালো। পাতলা শাড়ির আড়াল থেকে ওর পরিমিত স্তন কিংবা কোমর কিংবা বাহুমূলের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। ভূপতি মাথা নামিয়ে একটা অচেনা গন্ধ পেল। কোনো ফুলের।

পদ্মের পাপড়ির মতো পাতলা পায়ের পাতা মেঝের সঙ্গে মিশে আছে, আঙুরের মতো টুসটুসে ছোট আঙুল যেন চুলের মতো সরু কাঠি দিয়ে পায়ের সঙ্গে লাগানো। পাতলা কোমল মাংস বিস্তৃত হয়ে আছে, যেন হাঁটলে শব্দ হবে না—মেঝেতে কান রাখলেও শোনা যাবে না কেউ হেঁটে যাচ্ছে। অনিমেষ ধ্বনি, কয়েকটা কথার অংশ একটু শব্দ তরঙ্গ শুনেছিল। বুলার গলায় কোনো কৃত্রিম সুর নেই,—যেন ও কখনো অভিনয় করেনি। ওর দাঁত সুন্দর।

—আমাদের সময় হয় না। নইলে পরিচয়টা আগেই সেরে নেওয়া যেত। ভূপতি বলল।

—বিয়ের সময়ে আপনাকে দেখেছি। কিন্তু অনিমেষ কথা শেষ করল না!

বুলা হাসল, বলল,—বিয়ের সময়ে ভারী জবরজঙ দেখায়। আমি এমনিতে অত শাড়ি গয়না পরি না। কেমন যেন চেনা যায় না—

সুকুমার একদৃষ্টে দেওয়াল দেখছিল। ওর মুখটা কোনো অহংকারী ছেলের মতো যাকে সম্প্রতি অপমান করা হয়েছে।

—বউ আর কনেতে, অনেক তফাত। কোন ছদ্মবেশটা ভালো কে জানে! রজত জোরে নিশ্বাস ফেলে বলে।

—আঃ হা—বুলা ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে গতি না থামিয়েই বলল।

—তোমরা জাদুকরী। রজত হতাশ হয়ে বসে।

বুলা হাসল। তিনজনের দিকে তাকিয়ে বলল—আপনারা একটু বসুন। আমি চা নিয়ে আসছি এক্ষুনি, দেরি হবে না—

বুলা দরজার কাছে গেল।

—রজত ডাকল, শোনো। বুলা ফিরে তাকায়। রজত আঙুল দিয়ে সুকুমারকে দেখাল—আমার সাহিত্যিক বন্ধু। সুকুমার এবং লাজুক। তোমাকে বলেছিলাম—

—ও! বুলা হাসল যেন এর আগে ও উত্তরপ্রদেশে কোনো সাহিত্যিককে দেখে নি। ভ্রূ কোঁচকালো যেন ও এর আগে সুকুমারের কথা শুনেছে কিনা মনে করতে পারল না।

—তুমি ওর সঙ্গে ভাব জমাও। হয়তো ও কোনোদিন তোমাকে নিয়ে একটু কিছু লিখবে নিদেন চার লাইনের কবিতা কিংবা রবিবারের গল্প—

সুকুমার প্রথমে হাসল, তারপর অন্য সবাই।

বুলা হাসতে হাসতেই পরদার ও পাশে চলে গেল।

সুকুমার বলল—ইডিয়ট।

রজত হাসল—ও অত সিরিয়াস নয় তোর মতো। ঘাবড়াচ্ছিস কেন?

—স্টুপিড। সুকুমার বলল।

—আঃ ননসেন্স। কেমন লাগল বল। রজত হাসল। তারপর গম্ভীর হয়ে কোমরের ভাঁজ থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে তাকাল।

—ইউ আর এ লাকি ডগ। অনিমেষ হাত বাড়াল, কংগ্র্যাচুলেশনস।

—থ্যাঙ্কস। রজত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে।

—কংগ্র্যাচুলেশনস—ভূপতি অন্য কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে বলে।

—তোর—? রজত সুকুমারের দিকে তাকায়।

সুকুমার ঠোঁট চেপে হাসে। বলে,—নির্জন দ্বীপে নির্বাসিতা করুণ কোনো মহিলার মতো। কোনো পুরুষের সাধ্য নেই তাকে স্পর্শ করে।

—অ্যাঁ? মস্ত বড় হাঁ করল অনিমেষ।

—দি বেস্ট কমপ্লিমেন্ট। থ্যাঙ্কস—রজত জোরে শ্বাস টেনে হাসতে হাসতে হাত বাড়াল,—ওকে বলব।

—কবি, আমরা পরাভূত। ভূপতি বলে। তারপর হাসতে থাকে।

—ইউ উইন দি রেস। অশোক বনে সীতার ইমেজ—ভাবা যায় না। অনিমেষ জোরে হাসে। সুকুমার মুখ নামায়।

তিনজনের হাসির শব্দ।

তারপর বুলা মাত্র একবার এই ঘরে এল। চা নিয়ে, সঙ্গে খাবারের প্লেট হাতে বাচ্চা চাকর। কয়েকটি মামুলি কথা, কিছু ওজর—আপত্তি। এবং তারপর একসময়ে ওরা তিনজনে উঠে দাঁড়াল। ভূপতি হাতজোড় করে বলল,—আজ চলি বউদি, আর কোনো সময়ে আবার দেখা হবে।

—আজ গৃহিণীপনা দেখে এলাম। আমরা অতিথিরা তুষ্ট। অনিমেষ কপালে হাত ছোঁয়াল।

সুকুমার হাতজোড় করে বলল,—আমি সত্যিই লিখি না। ওরা বানিয়ে বলে—

—তাতো বলেই। আমি আপনাকে বিশ্বাস করি। বুলা হাসতে হাসতে বলল, যেন কোনো বাচ্চা ছেলেকে ভোলাচ্ছে! ওর গলা চতুর শোনালো।

অনিমেষ রজতের দিকে তাকাল—দেখছো রজত। কপালে কত অপবাদ লেখা আছে।

রজত বেরোবে বলে ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে নিচ্ছিল। প্যান্টের শেষ বোতামটা আটকানো আছে কিনা দেখে নিয়ে বলল,—দেখছি। সুকুর দিন—

ওরা দরজার কাছে এগিয়ে একবার ঘাড় ফেরালো।

—আবার আসবেন।

—আসব নিশ্চয়ই। বাঃ—

—আসব—সময় পেলে—

—মনে থাকে যেন—

—দেখবেন রজত তো দূরের কেউ না—

—আচ্ছা, দেখব কেমন—

—এরপর তাড়াতে চাইবেন কিন্তু—

—ইস। দেখা যাক।

—আজ যাই—

—চলি—

—দেখবেন, সিঁড়িটা যা অন্ধকার—

—যেতে পারব—

—সাবধানে যেও—

—হুঁ—

—চলি—

—আচ্ছা—

—চললাম—

—আ—চ্ছা।

পরদা সরানোর শব্দ। জুতোর শব্দ। সিঁড়িতে।

ওরা চারজন রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

—কোথায় যাওয়া যায়? রজত বলল।

—কফি হাউস। সুকুমার খুব আস্তে বলল।

—ওঃ অনিমেষ ঠোঁট ওলটাল—সেই ছবি আঁকা, সেই কবিতা লেখা, সেই নতুন রীতির গল্প।

—সেই কাফকা—কামু—জয়েস—মান—রিল্কে। ভূপতি বলে—

—সেই বোদলেয়ার—এলুয়ার—লোরকা—পাউন্ড—

—সেই গগ্যাঁ—গয়্যা—গঁগ—সেজাঁ—পিকাসো—

—এবং রবীন্দ্রনাথ—

এবং সিগারেটের ধোঁয়া, কয়েকটি শুকনো ছেলে, কিছু বাসী মেয়ে—

—হরিবল।

—তবে কোথায় যাওয়া যায়? রজত আবার প্রশ্ন করল।

সুকুমার দাঁত দিয়ে নোখ কাটতে কাটতে বলল—কফি হাউসে এখন ভিড় নেই।

—দূর। ভূপতি বলে।

—শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। একটু তাজা হওয়া দরকার। অনিমেষ বলে।

—আমারও গলাটা খুশখুশ—কেমন ব্যথা। ক—দিন রাত জেগে,—রজত গলায় হাত দিয়ে বলল।

—হুঁ, সন্ধেটা মাটি না করে—ভূপতি রজতের দিকে তাকাল তারপর সুকুমারের দিকে।

—তবে যাওয়া যাক। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ না এসপ্ল্যানেড—রজত বলে।

—কিন্তু সুকু—ভূপতি প্রশ্ন করে!

—তোমরা যাও। আমি ওর মধ্যে নেই। সুকুমার এক পা পিছু হটল।

—পাগল, রজত হাত বাড়িয়ে সুকুমারের জামাটা ধরল, ছুকুও সঙ্গে যাবে। ও লাইম জুস খাবে—আমরা খাব জিন উইথ ফ্রেস লাইম—কেমন জুঁইফুলের গন্ধ,—বিয়ার দিয়ে শুরু করলে কেমন হয়?

—নট ব্যাড আইডিয়া—অনিমেষ বলল,—আমার ট্রেন সাড়ে আটটায়। বেশি খাব না, বউ মুখে গন্ধটন্ধ পেলে—

—বউ একটা আমারও আছে, অত ঘাবড়ায় না—ভূপতি বলে।

—সে সব কথা থাক, এখন কোথায় যাওয়া যায়? রজত সুকুমারের জামাটা ধরে থেকেই বলে।

—যেটা কাছে হয়। তাড়াতাড়ি অনিমেষ বলে।

—কিন্তু সুকু? ভূপতি বলে।

—এবং সুকু? অনিমেষ বলে।

সুকু যাবে। রজত হাসল,—ওকে পাকানো দরকার।

—পাকাতে হলে ওর বিয়ে দাও। মদ খেয়ে ছেলেরা পাকে না। ভূপতি বলে গম্ভীরভাবে।

—হুঁ ওর বিয়ে দাও। ওর দরকার—অনিমেষ বলে।

—হুঁ বয়স যাওয়ার আগেই বিয়ে দাও। ভূপতি বলে।

—কেন না,—অনিমেষ বলে,—বৃদ্ধ বয়সে বিবাহে বিবিধ বাধা।

সকলে জোরে হাসল। তারপর চলতে লাগল। সুকুমারের একটা হাত রজতের হাতে, অন্যটা ধরল অনিমেষ। ভূপতি ওদের পেছনে।

ঘরের ভেতর ঘর। ছোট্ট পার্টিশান দেয়া। কাঠের দেওয়াল বার্নিশ না করা, পুরোনো রং! গোপন নির্জন। টেবিল ঘিরে চারটে চেয়ার। ঠিক চারটে চেয়ার যেন কথা ছিল ওরা চারজনেই আসবে। বেশি না, কম না। যেন কথা দেওয়া ছিল যে আমরা আসব, সুকুমার ভাবল—চারজনের জন্য চারটে চেয়ার আর একটা ছোট টেবিল, দাগ ধরা নোংরা সাদা টেবিলক্লথ যার ওপর আমার হাত এবং হাতের ওপর কখন মুখ রাখব—তারা অপেক্ষা করছিল। সব টেবিলকে ঘিরে চারটে চেয়ার থাকে না—চেয়ারের সংখ্যা কখনো বাড়ে কমে। কিন্তু সাধারণত চারটে চেয়ারই থাকে যেন কারো তিনজনের বেশি সঙ্গী থাকা ভালো নয়। যদি আসতে চাও তিনজনকে নিয়ে এসো—যে কোনো তিনজন কিন্তু তিনজন। বেশি না, কম না।

চেয়ারের শব্দ হল। ওরা বসল। পরদা সরিয়ে একজন বেয়ারার মুখ উঁকি দিল। ওর মুখটা কালো, নির্বিকার এবং বৈশিষ্ট্যহীন। একটু যান্ত্রিক হাসি ঠোঁটে।

—জী সাব? বেয়ারা বলল।

—দুটো বিয়ার—বেশ ঠান্ডা দেখে। চারটে গ্লাস রজত বলে।

—আউর? বেয়ারা প্রশ্ন করে। রজত বিয়ারের নাম বলল!

পরে আরও বলছি। রজত বসে। বেয়ারা চলে গেল। পরদাটা আবার নিভাঁজ!

চারদিকে পার্টিশানের ওপাশে বিচিত্র শব্দ হচ্ছে। কখনো হাসির টুকরো, কথার বা কাচের শব্দ। এ ঘরটা নিঃশব্দ। ভূপতি রুমাল বের করে মুখ মুছল। অনিমেষ টেবিলের ওপর আঙুল দিয়ে বাজাল, সুকুমারের হাত ওর কোলে, রজত চুপচাপ মেনুটার দিকে চোখ রাখে।

—আমি কিন্তু খাব না। সুকুমার বলে।

—ওঃ, একটু—প্লীজ, আমার বউ—এর স্বাস্থ্য পান করব—রজত হাসল।

—তোর ভাবনা কি,—অনিমেষ বলল সুকুমারকে,—তুই তো মেস—এ থাকিস। কাউকে কৈফিয়ত দিতে হবে না।
—আর তোর তো নতুন কিংবা পুরোনো কোনো বউ নেই,—ভূপতি বলে,—তোর চিন্তা কি?
—কিন্তু,—সুকুমারকে চিন্তিত দেখায়,—লজ্জা কিংবা ভয় করছে। কেমন অপরাধবোধ—
—কেন? রজত প্রশ্ন করে।
—বেয়ারাটার মুখটা আমার চেনা—চেনা। ঠিক আমার জ্যাঠামশাইয়ের মতো মুখ—কেমন যেন লাগে। অস্বস্তি—
ভূপতি আর অনিমেষ শব্দ করে হাসে। অনিমেষ হাসি চাপতে কুঁকড়ে যায়। রজত স্থির থাক।
—এ রকম হয়, রজত বলে—এটা কোনো পাপ নয়।
—আঃ জ্যাঠামশাই—ভূপতি বলে!
—দ্যাটস এ প্রবলেম—অনিমেষ হাসে।
—আঃ, জ্যাঠামশাই মদ সার্ভ করছে,—এ সুপারফিসিয়াল ইমেজ। ভূপতি চোখ বন্ধ করে বলল।
বেয়ারা ঘরে ঢুকল। চারটে গ্লাস রেখে বিয়ার ভাগ করে দিল। দুটো প্লেটে চাকচাক করে কাটা শসা, পেঁয়াজ আস্ত পাঁপড় ভাজা।
—খুব ফেনা—সুকুমার বলে।
—বেশ ঠান্ডা। খা—রজত বলে।
—আঃ—চুমুক দিয়ে অনিমেষ বলে।
—এই সময়ে সুকুর একটা কবিতা শুনলে বেশ লাগত। ভূপতি সিগারেট ধরিয়ে বলে।
—বেশ, তাই হোক,—রজত হাসে।
—জমবে। হুঁ—অনিমেষ ঠোঁটের কাছে গ্লাস তোলে।
—দুর—সুকুমার বিয়ারের রংটার দিকে চোখ রাখে।
—প্লিজ,...ভূপতি বলে, তোর সেই কবিতাটা—
—কোনটা?
—যেটা রজতের বউকে শোনাবি বলে লিখেছিলি। তোর পকেটে ছিল তুই লজ্জা পাবি বলে আমি চেপে গেছি। ভূপতি আন্তরিকভাবে চাপা সুরে বলে।

—ওঃ! অনিমেষ বলে।
—বোঝা গেল রজত হাসল,—বেশ এবার পড়ো, পড়তেই হবে।
সুকুমার ভূপতি পাশাপাশি! মুখোমুখি রজত অনিমেষ দাঁড়িয়ে উঠে সুকুমারের পকেটের দিকে হাত বাড়িয়ে বলে,—বের করো।
সুকুমার চেয়ারসুদ্ধু পেছনে হেলল,—যা এটা কবিতা পড়ার জায়গা নয়, কে কখন উঁকি মারবে।
—বয়ে গেল—রজত ঠোঁট ওলটায়।
—পড়তেই হবে,—অনিমেষ বলে, আমাদের দাবি—
মানতে হবে,—ভূপতি হাসল। হেসে সুকুমারের কাঁধে হাত রাখল।
পকেট থেকে নিঃশব্দে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করল সুকুমার। ভাঁজ খুলে তিনজনের দিকে তাকাল। হাসল।
—না, বসে বসে চলবে না,—অনিমেষ বলে,—উঠে দাঁড়াও।
—যাঃ এটা নাটক করবার জায়গা নয় সুকুমার বলল।

—আঃ এটা পরেশনাথের মন্দিরও নয়। মদের দোকানের লোকেরা ন্যাংটো মেয়ের নাচও দেখে। অনিমেষ বলে।

—লজ্জা কী? দাঁড়া না—রজত হাই তোলে।

—দাঁড়া। কিছু হবে না—ভূপতি হাসে।

সুকুমার উঠে দাঁড়ায়।

—অ্যাটেনশন প্লিজ। সুকু, জ্যাঠামশাই উঁকি মারলে ঘাবড়ে যেওনা;—অনিমেষ বলল।

সুকুমারের মুখটা সম্পূর্ণ লাল। ও তিনজনের দিকে তাকায়। অল্প আলোয় তিনজনের মুখ ঝাপসা—ঝাপসা ওয়াশ—এর ছবির মতন। সুকুমার একটু কেশে বলল—কবিতার নাম 'বন্ধুরা প্রবীণ হলে'।

তিনজন টেবিলের ওপর ঝুঁকল।

সুকুমার পড়ল,—বন্ধুরা প্রবীণ হল,

বন্ধুপত্নী হ'ল চৌকিদার,
সাতটায় বাড়ি ফিরে চলে,
না হলে ঘরের বন্ধ দ্বার।

অনিমেষ টেবিলে হাত চাপড়ে বলল,—ই—উ—নিক।

—ওকে পড়তে দে—ভূপতি সিগারেটে টান দেয়। রজত চুপ।

সুকুমার পড়ল,—এতদিন কাফে রেস্তারাঁয়।

ভ্রমর করিত গুঞ্জন—
যে স্বর্গ—স্বপ্ন—সুষমায়...

অনিমেষ অস্ফুট করে বলল—যে স্বর্গ—স্বপ্ন—সুষমায়।

রজত চোখ বুজে হেলান দিয়ে হাসল—চমৎকার! যে স্বর্গ—স্বপ্ন—সুষমায়। আবার পড়, কবি।

সুকুমার পড়ল,—যে স্বর্গ—স্বপ্ন—সুষমায়—

সে স্বর্গ এখন গৃহকোণ!

যে স্বর্গ—স্বপ্ন সুষমায়...এখন গৃহকোণ অনিমেষ আবৃত্তি করে হাসতে হাসতে বলল—তুলনা নেই—

—আস্তে। রজত বলে পড়তে দাও।

সুকুমার হাতের কাগজ থেকে চোখ ওঠাল। পরদা সরিয়ে বেয়ারা উঁকি দিল। বলল,—আউর কুছ, সাব?

—ওঃ, রজত সোজা হয়ে বসে বলল, চারটে ড্রাই জিন আর ফ্রেশ লাইম।

বেয়ারা চলে গেল।

—পড়। ভূপতি বলে।

সুকুমার পড়ল—

বালিশের ওয়াড়ে নাম লিখে।
বন্ধুপত্নী অবসর পেলে,
বন্ধুর পুঁজির নিরীখে
অসামান্য প্রেম দেন ঢেলে।

—আঃ, তুমি একজন পেসিমিস্ট কবি। অনিমেষ চোখ বুজে বলে।

—পড়তে দাও। রজত বলে।

সুকুমার পড়ল,—বন্ধু তাতেই খুশি হয়ে

দুই হাতে পেয়ে যান চাঁদ।

—কবি, ইউ আর ক্রুয়েল। দাউ স্ট্রিকেথ এ ড্যাগার ইন মি—

—আঃ ক্লান্ত কোরোনা—ভূপতি বলে।

—তারপর? রজত প্রশ্ন করে।

সুকুমার পড়ল, বন্ধুরা প্রবীণ ঘুঘু সব,

বন্ধুপত্নী ঘুঘুধরা ফাঁদ।

সুকুমার প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে বসল। ওর মুখটা লাল।

—কংগ্র্যাচুলেশনস—অনিমেষ সুকুমারের দিকে হাত বাড়ায়। সুকুমার একহাত দিয়ে ওর হাত ধরল, অন্য হাতে বিয়ারের গ্লাসটা তুলে নিঃশেষ করল।

—হুঁ—রজত তেমনি চোখ বুজে হেলান দিয়ে বলে—তোর আর একটা কবিতার লাইন মনে পড়ছে। 'চরিত্রগুণ মানিব্যাগে থাকে, জীবনটা অতি বাহ্য। মাথার খোঁপাটি খোঁপার মালাটি সবই তো চিতায় দাহ্য।' রজত একট হাসে।

—এ হ্যান্ডসাম পোয়েট। ভূপতি বলে।

—ওঃ—অনিমেষ বলে।

—কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না। ভূপতি রজতের দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল,—তুমি সুকুমারের কবিতার স্টেটমেন্ট বিশ্বাস কর? তোমার মুখ থেকে শোনা যাক—যেটা সত্যি কথা—যা রিয়্যাল—

—ওয়েল—রজত হাসল।

—না, বল। ইউ হ্যাভ টু সে—ভূপতি উত্তেজিতভাবে বলল।

বেয়ারা পরদা সরিয়ে এল। করিডোরের উজ্জ্বল আলোর একটু আভাস ঘরে ঢুকল। চারটে গ্লাস সাজিয়ে রেখে বেয়ারা বেরিয়ে গেল। চারটে গ্লাস, প্লেটের ওপর কাটা লেবুর টুকরো, চামচ। জুঁই ফুলের গন্ধ।

—তুমি আনরিয়্যাল—ভূপতি সুকুমারকে বলল।

একটু আগে দাঁড়িয়ে কবিতা পড়ার জন্য সুকুমার লজ্জিত ছিল। এখন মুখ তুলল—বলল,—রিয়্যালিটি অনেকটা নগ্নতার মতো অশ্লীল। আমি ইমাজিনেশন দিয়ে তাকে এড়িয়ে যাই—

—কত আর পালাবে? ভূপতি প্রশ্ন করে।

—হুঁ, মনের দিক দিয়ে তোমার ন্যাংটো হওয়া দরকার। অনিমেষ বলে!

—কমপ্লিটলি নেকেড। ভূপতি রজতের দিকে তাকায়।

—বেশ,—সুকুমার বলে,—রজতকে বলতে দাও।

রজত জোরে হাসল,—নেভার বিন ইন সাচ এ জ্যাম বিফোর।

—অর্থাৎ? অনিমেষ প্রশ্ন করে।

—আমি অত ভাবি না—রজত সিগারেট ধরিয়ে বলে। ওর কথা অল্প এড়িয়ে যাচ্ছে।

—সুকু কবিতা লিখে আমাদের—অর্থাৎ আমরা যারা বিবাহোত্তর জীবনে প্রেম—বিবর্জিত এবং যারা অসামান্য প্রেমের জন্য উদ্বাহু বামন এবং যারা কোনো মহিলার,—এটুকু বলে অনিমেষ হিহি করে হাসল যেন ওর ইতিমধ্যেই নেশা হয়েছে, তারপর সামনে ঝুঁকে চাপা স্বরে বলল,—যারা কোন মহিলার নগ্নতায় অভিজ্ঞ, তাদের গাল দিয়েছে। নাউ প্লিজ ডিফেন্ড। বস্তুত ও খোঁপা, খোঁপার মালা এবং চিতার সংযোগে কি বোঝাতে চায় জানি না।

—আমি নিজের অভিজ্ঞতাকে জানি,—রজত অস্বাভাবিকভাবে হেসে বলল,—সেটা কিছুটা রিয়্যাল কিছুটা আনরিয়্যাল। যদি শুনতে চাও—

—অফকোর্স, শুনব। বল—ভূপতি গ্লাস তুলে চুমুক দেয়।

—বলব, তোমাদের কাছে বলব—রজত মাতালের মতো হাসল,—ওল্ডম্যান, ছেলেবেলা থেকেই আমার নগ্নতার সাধ। যা অনেকের কাছে বলা যায় না, ভেবেছিলাম তা বুলার কাছে বলা যায় না। যা বলতে চাই তাই সাজিয়ে বলা হয়ে যায়—

—ওটা স্বাভাবিক,—সুকুমার ভীত গলায় বলল গ্লাসের দিকে তাকিয়ে,—কিন্তু আমি আর শুনতে চাই না, আমরা মূল প্রসঙ্গ থেকে দূরে—

—আঃ,—অনিমেষ প্রায় ধমক দিল,—রজতকে বলতে দাও।

—রজতকে বলতে দাও,—ভূপতি মাথা নাড়ল,—আমরা ওল্ড ফসিল। ওর নিউ ব্লাড।

রজত শুরু করল। প্রথমে আড়ষ্ট। আস্তে আস্তে বলল...হুঁ, তারপর মনে হল আমি একজন ভিলেন। তদুপরি অন্ধকার আমাকে সাহস দিচ্ছিল। কিন্তু ওর চোখ দুটো আধ—বোজা চোখ দুটো বাতি জ্বেলে দেখতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু লজ্জা—সেটা প্রথম দিন। তোমরা জানো...কী গভীর ঘন শ্বাস যেন স্পর্শ করা যায়...

আঃ, প্লিজ প্লিজ—সুকুমার হাত বাড়িয়ে রজতকে ছুঁল।

রজত হাসল। তারপর গ্লাসে চুমুক দিয়ে ভাবল আড়ষ্টতা কেটে যাচ্ছে। গ্লাসটা নিঃশেষ করে রজত বুলার দেহের কয়েকটি বিচিত্র কারুকার্যের উপমা দিল।

—রজত? সুকুমার বলল। রজত ওর হাত সরিয়ে দেয়।

—আমাকে ন্যাংটো হতে দাও—রজত হাসল।

ওরা ভেবেছিল রজত থামবে। ভূপতি আর অনিমেষ বোকার মতো হাসল।

রজত বেছে বেছে কয়েকটি অশ্লীল শব্দ জিভে তুলে আনল। রজত বলতে লাগল এমনভাবে যেন বুলা ওর কেউ নয়।

সুকুমারের দুটো কান ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক শুনতে পেল। ওর চোখের সামনে বুলার ছবিটাকে যেন দু—হাতে নাড়া দিল রজত। সুকুমার ভাবল ওর যেন নেশা হয়েছে। রজত থামল না—

সুকুমার উত্তেজিত হয়ে বলল,—প্লিজ—প্লিজ, আমাকে একা হতে দাও, অনি—ভূপতি—প্লিজ—

—ইউ মাস্ট স্টপ। অনিমেষকে কেমন গভীর দেখাল।

—ইউ আর আউট—আউট টু—ডে। ভূপতি চেয়ারের শব্দ করে উঠে দাঁড়িয়ে রজতের কাঁধে হাত রাখে,—বি সিরিয়াস,—আমরা—

রজত হাসল,—আঃ—

—না, আর নয়—অনিমেষ বলল,—আর শুনতে চাই না।

বেয়ারা উঁকি দিল। বলল—সা'ব?

—ড্রিঙ্কস,—রজত হাসল,—চারটে হুইস্কি কিংবা রাম—

বেয়ারা মাথা নাড়ল,—দশটার পর ড্রিঙ্কস বন্ধ—

—ওঃ—রজত মার—খাওয়া বোকা ছেলের মতো অসহায়ভাবে তাকাল।

—কিছু চাই না,—সুকুমার বেয়ারাটাকে—যার মুখ ওর জ্যাঠামশাইয়ের মতো, তাকে বলল।

বেয়ারা পরদা নামালো, চলে গেল।

—আমরা এবার যাবো,—অনিমেষের মুখ চিন্তিত দেখায় যেন কোনো আকস্মিক আঘাতে নেশা কেটে যাওয়ার পর ও এখন ট্রেনের কথা ভাবছে!

—তার মানে—তা'হলে,—রজত সম্পূর্ণ মাতালের মতো হেসে বলল। তারপর উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল।

—তা হলে? ভূপতি প্রশ্ন করে।

রজত উঠে দাঁড়িয়ে এমন বোকার মতো হাসল যে মনে হল তাকে কেউ অন্যায়ভাবে অপমান করেছে। হাসিটা মুখে রেখে বলল,—তাহলে স্বীকার করতে হবে সুকুমারের কবিতাটা মন্দ হয়নি, আর—

সুকুমার আর অনিমেষ উঠে দাঁড়িয়ে কি করতে হবে ভেবে না পেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

রজত আবার বোকার মতো হাসল সোজা হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করে টাল খেতে খেতে বলল,—আর তার মানে, আমাদের কারুর নিষ্পাপ নগ্ন মন নেই। নিষ্পাপ এবং নগ্ন—নেই—নেই—

বলতে বলতে ও দাঁড়াবার জন্য টেবিলের ওপর হাতের ভর দিয়ে ভারসাম্য রাখতে চেষ্টা করে আবার বসে পড়ল। বলল,—তা হলে সুকুমারের কবিতাটা মন্দ হয়নি।—ও ক্লান্তভাবে হেলান দিল। ওরা তিনজন দাঁড়িয়ে ওকে দেখতে থাকে যেন ওরা খুব অবাক হয়েছে।

রজতের মনে হল, কেউ ধরে না নিয়ে গেলে ওর পক্ষে বাড়ি যাওয়া অসম্ভব।

# নীলুর দুঃখ

সক্কালবেলাতেই নীলুর বিশ চাক্কি ঝাঁক হয়ে গেল। মাসের একুশ তারিখ। ধারে কাছে কোনো পেমেন্ট নেই। বাবা তিনদিনের জন্য মেয়ের বাড়িতে গেছে বারুইপুর—মহা টিকরমবাজ লোক—সাউথ শিয়ালদায় গাড়িতে তুলে দিয়ে নীলু যখন প্রণাম করল তখন হাসি—হাসি মুখে বুড়ো নতুন সিগারেটের প্যাকেটের সিলোফেন ছিঁড়ছে। তিনদিন মায়ের আওতার বাইরে থাকবে বলে বুঝি প্রসন্নতা—ভেবেছিল নীলু। গাড়ি ছাড়বার পর হঠাৎ খেয়াল হল, তিনদিনের বাজার খরচ রেখে গেছে তো! সেই সন্দেহ কাল সারা বিকেল খচখচ করেছে। আজ সকালেই মশারির মধ্যে আধখানা ঢুকে তাকে ঠেলে তুলল মা—বাজার যাবি না, ও নীলু?

তখনই বোঝা গেল বুড়ো চাক্কি রেখে যায়নি। কাল নাকি টাকা তুলতে রনোকে পাঠিয়েছিল, কিন্তু দস্তখত মেলেনি বলে উইথড্রয়াল ফর্ম ফেরত দিয়েছে পোস্টাপিস। কিন্তু নীলু জানে পুরোটা টিক্রমবাজী। বুড়ো আগে ছিল রেলের গার্ড, রিটায়ার করার পর একটা মুদির দোকান দিয়েছিল—অনভিজ্ঞ লোক, তার ওপর দোকান ভেঙে খেত—ফলে দোকান গেল উঠে। এখন তিন রোজগেরে ছেলের টাকা নিয়ে পোস্ট—অফিসে রাখে আর প্রতি সপ্তাহে খরচ তোলে। প্রতিদিন বাজারের থলি দশমেসে পেটের মতো ফুলে না থাকলে বুড়োর মন ভজে না। মাসের শেষ দিকে টাকা ফুরোলেই টিকরমবাজী শুরু হয়। প্রতি সপ্তাহে যে লোক টাকা তুলছে তার নাকি দস্তখত মেলে না!

নীলু হাসে। সে কখনো বুড়োর ওপর রাগ করে না। বাবা তার দিকে আড়ে আড়ে চায় মাসের শেষ দিকটায়। ঝাঁক দেওয়ার নানা চেষ্টা করে। নীলুর সঙ্গে বাবার একটা লুকোচুরির খেলা চলতে থাকে।

বাঙালের খাওয়া। তার ওপর পুঁটিয়ারির নাড়ু মামা, মামি, ছেলে, ছেলে বউ—চারটে বাইরের লোক নিমন্ত্রিত, ঘরের লোক বারোজন নীলু নিজে, মা, ছটা ভাই, দুটো ধুমসী বোন, বিধবা মাখনী পিসি, বাবার জ্যাঠাতো ভাই, আইবুড়ো নিবারণ কাকা—বিশ চাক্কির নীচে বাজার নামে?

রবিবার। বাজার নামিয়ে রেখে নীলু একটু পাড়ায় বেরোয়। কদিন ধরেই পোগো ঘুরছে পিছন পিছন। তার কোমরে নানা আকৃতির সাতটা ছুরি। ছুরিগুলো তার মায়ের পুরোনো শাড়ির পাড় ছিঁড়ে তাই দিয়ে জড়িয়ে সযত্নে শার্টের তলায় গুঁজে রাখে পোগো। পাড়ার লোক বলে, পোগো দিনে সাতটা মার্ডার করে। নিতান্ত এলেবেলে লোকও পোগোকে যেতে দেখলে হেঁকে ডাক পাড়ে—কী পোগোবাবু, আজ কটা মার্ডার হল? পোগো হুস হাস করে চলে যায়।

পরশুদিন পোগোর মেজোবউদি জানালা দিয়ে নীলুকে ডেকে বলেছিল—পোগো যে তোমাকে মার্ডার করতে চায়, নীলু, খবর রাখো?

তাই বটে। নীলুর মনে পড়ল, কয়েকদিন যাবৎ সে অফিসে যাওয়ার সময়ে লক্ষ্য করেছে পোগো নিঃশব্দে আসছে পিছন পিছন। বাস স্টপ পর্যন্ত আসে। নীলু কখনো ফিরে তাকালে পোগো ঊর্ধ্বমুখে আকাশ দেখে আর বিড়বিড় করে গাল দেয়।

আজ বিশ চাক্কি ঝাঁক হয়ে যাওয়ায় নীলুর মেজাজ ভালো ছিল না! নবীনের মিষ্টির দোকানের সিঁড়িতে বসে সিগারেট ফুঁকছিল পোগো। নীলুকে দেখেই আকাশে তাকাল। না—দেখার ভান করে কিছুদূর গিয়েই নীলু টের পেল পোগো পিছু নিয়েছে।

নীলু ঘুরে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে পোগো উলটোবাগে ঘুরে হাঁটতে লাগল। এগিয়ে গিয়ে তার পাছায় ডান পায়ের একটা লাথি কষাল নীলু—শালা, বদের হাঁড়ি।

কাঁই শব্দ করে ঘুরে দাঁড়ায় পোগো। জিভ আর প্যালেটের কোনো দোষ আছে পোগোর, এখনো জিভের আড় ভাঙেনি। ছত্রিশ বছরের শরীরে তিন বছর বয়সি মগজ নিয়ে সে ঘুরে বেড়ায়। গরম খেয়ে বলল—খুব ঠাবহান, নীলু, বলে ডিট্টি খুব ঠাবহান!

—ফের! কষাবো আর একটা?

পোগো থতিয়ে যায়। শার্টের ভিতরে লুকানো হাত ছুরি বের করবার প্রাক্কালের ভঙ্গিতে রেখে বলে—একডিন ফটে ডাবি ঠালা।

নীলু আর একবার ডান পা তুলতেই পোগো পিছিয়ে যায়। বিড়বিড় করতে করতে কারখানার পাশের গলিতে ঢুকে পড়ে।

সেই কবে থেকে মার্ডারের স্বপ্ন দেখে পোগো। সাত—আটখানা ছুরি বিছানায় দিয়ে ঘুমোতে যায়। পাছে নিজের ছুরি ফুটে ও নিজে মরে—সেই ভয়ে ও ঘুমোলে ওর মা এসে হাতড়ে হাতড়ে ছুরিগুলো সরিয়ে নেয়। মার্ডারের বড় শখ পোগোর। সারাদিন সে লোককে কত মার্ডারের গল্প করে। কলকতায় হাঙ্গামা লাগলে ছাদে উঠে দুহাত তুলে লাফায়। মার্ডারের গল্প যখন শোনে তখন নিথর হয়ে যায়।

নীলু গতবার গ্রীষ্মে দার্জিলিঙ বেড়াতে গিয়ে একটা ভোজালি কিনেছিল। তার সেই শখের ভোজালিটা দিনসাতেক আগে একদিনের জন্য ধার নিয়েছিল পোগো। ফেরত দেওয়ার সময়ে চাপা গলায় বলেছিল—ভয় নেই, ভালো করে ঢুয়ে ডিয়েছি।

—কী ধুয়েছিস? জিজ্ঞেস করেছিল নীলু।

অর্থপূর্ণ হেসেছিল পোগো, উত্তর দেয়নি। তোমরা বুঝে নাও কী ধুয়েছি। সেদিনও একটা লাথি কষিয়েছিল নীলু—শালার শয়তানি বুদ্ধি দেখ। ধুয়ে দিয়েছি—কী ধুয়েছিস আব্বে পোগোর বাচ্চা?

সেই থেকেই বোধহয় নীলুকে মার্ডার করার জন্য ঘুরছে পোগো। তার লিস্টে নীলু ছাড়া আরও অনেকের নাম আছে যাদের সে মার্ডার করতে চায়।

আজ সকালে ব্রিটিশকে খুঁজছে নীলু। কাল ব্রিটিশ জিতেছে। দুশো সত্তর কি আশি টাকা। সেই নিয়ে খিচাং হয়ে গেল কাল।

গলির মুখ আটকে খুদে প্যান্ডেল বেঁধে বাচ্চাদের ক্লাবের রজত—জয়ন্তী হচ্ছিল কাল সন্ধেবেলায়। পাড়ার মেয়ে—বউ, বাচ্চারা ভিড় করেছিল খুব। সেই ফাংশন যখন জমজমাট, তখন বড় রাস্তায় ট্যাক্সি থামিয়ে ব্রিটিশ নামল। টলতে টলতে ঢুকল গলিতে, দু—বগলে বাংলার বোতল। সঙ্গে ছটকু। পাড়ায় পা দিয়ে ফাংশনের ভিড় দেখে নিজেকে জাহির করার জন্য দু—হাত ওপরে তুলে হাঁকাড় ছেড়েছিল ব্রিটিশ—ঈ—ঈ—ঈ—দ কা চাঁ—আ—আ—দ! বগল থেকে দুটো বোতল পড়ে গিয়ে ফট—ফটাস করে ভাঙল। হুড়দৌড় লেগে গিয়েছিল বাচ্চাদের ফাংশনে। পাঁচ বছরের টুমিরানী তখন ডায়াসে দাঁড়িয়ে 'কাঠবেড়ালী, কাঠবেড়ালী, পেয়ারা তুমি খাও...' বলে দুলতে দুলতে থেমে ভ্যাঁ করার জন্য হাঁ করেছিল মাত্র। সেই সময়ে নীলু, জগু, জাপান এসে দুটোকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল হরতুনের চায়ের দোকানে। নীলু ব্রিটিশের মাথায় জল ঢালে আর জাপান পিছন থেকে হাঁটুর গুঁতো দিয়ে জিজ্ঞেস করে—কত জিতেছিস? প্রথমে ব্রিটিশ চেঁচিয়ে বলেছিল—আব্বে, পঞ্চা—আ—শ হা—জা—আ—র। জাপান আরও দুবার হাঁটু চালাতেই সেটা নেমে দাঁড়াল দু—হাজারে। সেটাও বিশ্বাস হলনা কারো। পাড়ার বুকি বিশুর কাছ থেকে সবাই জেনেছ, ঈদ কা চাঁদ হট ফেবারিট ছিল। আরও কয়েকবার ঝাঁকাড় খেয়ে সত্যি কথা বলল ব্রিটিশ—তিনশো মাইরি বলছি—বিশ্বাস কর। পকেট সার্চ করে শ' দুইয়ের মতো পাওয়া গিয়েছিল।

আজ সকালে তাই ব্রিটিশকে খুঁজছে নীলু। মাসের একুশ তারিখ। ব্রিটিশের কাছে ত্রিশ টাকা পাওনা। গত শীতে দর্জির দোকান থেকে ব্রিটিশের টেরিকটনের প্যান্টটা ছাড়িয়ে নিয়েছিল নীলু। এতদিন চায়নি। গতকাল নিয়ে যেতে পারত, কিন্তু মাতালের কাছ থেকে নেওয়া উচিত নয় বলে নেয়নি। আজ দেখা হলে চেয়ে নেবে।

চায়ের দোকানে ব্রিটিশকে পাওয়া গেল না। ভি. আই. পি. রোডের মাঝখানে যে সবুজ ঘাসের চত্বরে বসে তারা আড্ডা মারে, সেখানেও না। ফুলবাগানের মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দেখল নীলু। কোথাও নেই। কাল রাতে নীলু বেশিক্ষণ ছিল না হরতুনের দোকানে। জাপান, জগু ওরা ব্রিটিশকে ঘিরে বসেছিল। বহুকাল তারা এমন মানুষ দেখেনি যার পকেটে ফালতু দুশো টাকা। জাপান মুখ চোখাচ্ছিল। কে জানে রাতে আবার ওরা ট্যাক্সি ধরে ধর্মতলার দিকে গিয়েছিল কিনা! গিয়ে থাকলে ওরা এখনো বিছানা নিয়ে আছে। দুপুর গড়িয়ে উঠবে। ব্রিটিশের বাড়িতে আজকাল আর খায় না নীলু। ব্রিটিশের মা আর দাদার সন্দেহ ওকে নষ্ট করেছে নীলুই। নইলে নীলু গিয়ে ব্রিটিশকে টেনে তুলতে বিছানা থেকে বলত,—না, হকের পয়সা পেয়েছিস, হিস্যা চাই না, আমার হক্কেরটা দিয়ে দে।

নাঃ। আবার ভেবে দেখল নীলু। দুশো টাকা—মাত্র টাকার আয়ু এ বাজারে কতক্ষণ? কাল যদি ওরা সেকেন্ড টাইম গিয়ে থাকে ধর্মতলায় তবে ব্রিটিশের পকেটে এখন হপ্তার খরচও নেই।

মোড়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরায় নীলু। ভাবে, বিশ চাক্কি যদি ঝাঁক হয়েই গেল তবে কীভাবে বাড়ির লোকজনের ওপর একটা মৃদু প্রতিশোধ নেওয়া যায়!

অমনি শোভন আর তার বউ বল্লরীর কথা মনে পড়ে গেল তার। শোভন কাজ করে কাস্টমসে। তিনবারে তিনটে বিলিতি টেরিলিনের শার্ট তাকে দিয়েছে শোভন, আর দিয়েছে সস্তায় একটা গ্রুয়েন ঘড়ি। তার ভদ্রলোক বন্ধুদের মধ্যে শোভন একজন—যাকে বাড়িতে ডাকা যায়। কতবার ভেবেছে নীলু শোভন, বল্লরী আর ওদের দুটো কচি মেয়েকে এক দুপুরের জন্য বাড়িতে নিয়ে আসবে, খাইয়ে দেবে ভালো করে। খেয়ালই থাকে না এসব কথা।

মাত্র তিন স্টপ দূরে থাকে শোভন। মাত্র সকাল ন'টা বাজে। আজ ছুটির দিন, বল্লরী নিশ্চয়ই রান্না চাপিয়ে ফেলেনি! উনুনে আঁচ দিয়ে চা—ফা, লুচি—ফুচি হচ্ছে এখনো। দুপুরে খাওয়ার কথা বলার পক্ষে খুব বেশি দেরি বোধহয় হয়নি এখনো।

ছত্রিশ নম্বর বাসটা থামতেই উঠে পড়ল নীলু।

উঠেই বুঝতে পারে। বাসটা দখল করে আছে দশ বারো জন ছেলেছোকরা। পরনে শার্ট পায়জামা, কিংবা সুর প্যান্ট। বয়স ষোলোর এদিক ওদিক। তাদের হাসির শব্দ থুথু ফেলার আগের গলাখাঁকারির—খ্যা—অ্যা—অ্যা—র মতো শোনাচ্ছিল। লেডিজ সিটে দু—তিনজন মেয়েছেলে বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে। দু—চারজন ভদ্রলোক ঘাড় সটান করে পাথরের মতো সামনের শূন্যতার দিকে চেয়ে আছে। ছোকরারা নিজেদের মধ্যেই চেঁচিয়ে কথা বলছে। উলটোপালটা কথা, গানের কলি। কন্ডাক্টর দুজন দু—দরজায় সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে। ভাড়া চাইবার সাহস নেই!

তবু ছোকরাদের একজন দলের পরমেশ নামে আর একজনকে ডেকে বলছে—পরমেশ, আমাদের ভাড়াটা দিলি না?

—কত দূরে?

—আমাদের হাফ—টিকিট। পাঁচ পয়সা করে দিয়ে দে।

—এই যে কন্ডাক্টরদাদা, পাঁচ পয়সার টিকিট আছে তো! বারোখানা দিন।

পিছনের কন্ডাক্টর রোগা, লম্বা, ফর্সা। না—কামানো কয়েক দিনের দাড়ি থুতনিতে জমে আছে। এবড়োখেবড়ো গজিয়েছে গোঁফ। তাতে তাকে বিষণ্ণ দেখায়। সে তবু একটু হাসল ছোকরাদের কথায়। অসহায় হাসিটি।

নীলু বসার জায়গা পায়নি। কন্ডাক্টরের পাশে দাঁড়িয়ে সে বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল।

বাইরে কোথাও পরিবার পরিকল্পনার হোর্ডিং দেখে জানালার পাশে বসা একটা ছেলে চেঁচিয়ে বলল—লাল ত্রিভুজটা কী বল তো মাইরি!

—ট্রাফিক সিগন্যাল বে, লাল দেখলে থেমে যাবি।

—আর নিরোধ! নিরোধটা কী যেন!

—রাজার টুপি...রাজার টুপি......

—খ্যা—অ্যা—অ্যা—খ্যা—অ্যা—অ্যা...

—খ্যা...

পরের স্টপে বাস আসতে তারা হেঁকে বলল—বেঁধে... লেডিজ...

নেমে গেল সবাই। বাসটাকে ফাঁকা নিস্তব্ধ মনে হল এবার। সবাই শরীর শ্লথ করে দিল। একজন চশমা—চোখে যুবা কন্ডাক্টরের দিকে চেয়ে বলল—লাথি দিয়ে নামিয়ে নিতে পারেন না এসব এলিমেন্টকে!

কন্ডাক্টর ম্লান মুখে হাসে।

ঝুঁকে নীলু দেখছিল ছেলেগুলো রাস্তা থেকে বাসের উদ্দেশে টিটকিরি ছুঁড়ে দিচ্ছে। কান কেমন গরম হয়ে যায় তার। লাফিয়ে নেমে পড়তে ইচ্ছে করে। লাঠি ছোরা বোমা যা হোক অস্ত্র নিয়ে কয়েকটাকে খুন করে আসতে ইচ্ছে করে।

হঠাৎ পোগোর মুখখানা মনে পড়ে নীলুর। জামার আড়ালে ছোরা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে পোগো। স্বপ্ন দেখছে মার্ডারের। তারা সবাই পোগোর পিছনে লাগে, মাঝেমধ্যে লাথি কষায়। তবু কেন যে পোগোর মতোই এক তীব্র মার্ডারের ইচ্ছে জেগে ওঠে নীলুর মধ্যেও মাঝে মাঝে। এত তীব্র সেই ইচ্ছে যে আবেগ কমে গেলে শরীরে একটা অবসাদ আসে। তেতো হয়ে যায় মন।

শোভন বাথরুমে। বল্লরী এসে দরজা খুলে চোখ কপালে তুলল—ওমা, আপনার কথাই ভাবছিলাম সকালবেলায়। অনেকদিন বাঁচবেন।

শোভনের বৈঠকখানাটি খুব ছিমছাম, সাজানো। বেতের সোফা, কাচের বুককেস, গ্রুন্ডিগের রেডিওগ্রাম, কাঠের টবে মানিপ্ল্যান্ট, দেয়ালে বিদেশি ছবিওলা ক্যালেন্ডার, মেঝেয় কয়ের কার্পেট। মাঝখানে নিচু টেবিলের ওপর মাখনের মতো রঙের ঝকঝকে অ্যাশট্রে—টার সৌন্দর্যও দেখবার মতন। মেঝের ইংরিজি ছড়ার বই খুলে বসে ছিল শোভনের চার আর তিন বছর বয়সের মেয়ে মিলি আর জুলি। একটু ইংরিজি কায়দায় থাকতেই ভালোবাসে শোভন। মিলিকে কিন্ডারগার্টেনের বাস এসে নিয়ে যায় রোজ। সে ইংরিজি ছড়া মুখস্থ বলে।

নীলুকে দেখেই মিলি জুলি টপাটপ উঠে দৌড়ে এল।

মিলি বলে—তুমি বলেছিলে ভাত খেলে হাত এঁটো হয়। এঁটো কী?

দুজনকে দু কোলে তুলে নিয়ে ভারী একরকমের সুখবোধ করে নীলু। ওদের গায়ে শৈশবের আশ্চর্য সুগন্ধ।

মিলি জুলি তার চুল, জামার কলার লন্ডভন্ড করতে থাকে। তাদের শরীরের ফাঁক দিয়ে মুখ বের করে নীলু বল্লরীকে বলে—তোমার হাঁড়ি চলে গেছে নাকি উনুনে!

—এইবার চড়বে। বাজার এলো এইমাত্র।

—হাঁড়ি ক্যানসেল করো আজ। বাপ গেছে বারুইপুর। সকালেই বিশ চাক্কি ঝাঁক হয়ে গেল। সেটা পুষিয়ে নিতে হবে তো! তোমার এ দুটো পুঁটলি নিয়ে দুপুরের আগেই চলে যেও আমার গাড্ডায়, ঘুমে লিও সবাই।

বল্লরী ঝেঁঝে ওঠে—কী যে সব অসভ্য কথা শিখেছেন বাজে লোকদের কাছ থেকে। নেমন্তন্নের ওই ভাষা।

বাথরুম থেকে শোভন চেঁচিয়ে বলে—চলে যাস না নীলু, কথা আছে।

—যেও কিন্তু। নীলু বল্লরীকে বলে—নইলে আমার প্রেস্টিজ থাকবে না।

—বাঃ, আমার যে ডালের জল চড়ানো হয়ে গেছে। এত বেলায় কি নেমন্তন্ন করে মানুষ!

নীলু সেসব কথায় কান দেয় না। মিলি জুলির সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে।

শোভন সকালেই দাড়ি কামিয়েছে। নীল গাল। মেদবহুল শরীরে এঁটে বসেছে ফিনফিনে গেঞ্জি, পরনে পাটভাঙা পায়জামা। গত বছর যৌথ পরিবার থেকে আলাদা হয়ে এল শোভন। বাসা খুঁজে দিয়েছিল নীলুই।

চারদিনের নোটিশে। এখন সুখে আছে শোভন। যৌথ পরিবারে থাকার সময়ে এত নিশ্চিন্ত আর তৃপ্ত আর সুখী দেখাতো না তাকে।

পাছে হিংসা হয় সেই ভয়ে চোখ সরিয়ে নেয় নীলু।

নেমন্তন্নের ব্যাপার শুনে শোভন হাসে—আমিও যাব—যাব করছিলাম তোর কাছে। এর মধ্যেই চলে যেতাম। ভালোই হল।

এক কাপ চা আর প্লেটে বিস্কুট সাজিয়ে ঘরে আসে বল্লরী।

শোভন হতাশ গলায় বলে—বাঃ, মোটে এক কাপ করলে! ছুটির দিনে এ সময়ে আমারো তো এক কাপ পাওনা।

বল্লরী গম্ভীরভাবে বলে—বাথরুমে যাওয়ার আগেই তো এক কাপ খেয়েছো।

মিষ্টি ঝগড়া করে দুজন। মিলি জুলির গায়ের অদ্ভুত সুগন্ধে ডুবে থেকে শোভন আর বল্লরীর আদর—করা গলার স্বর শোনে নীলু। সম্মোহিত হয়ে যেতে থাকে।

তারপরই হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বলে—চলি রে। তোরা ঠিক সময়ে চলে যাস।

—শুনুন শুনুন, আপনার সঙ্গে কথা আছে। বল্লরী তাকে থামায়।

—কী কথা?

—বলছিলুম না আজ সকালেই ভেবেছি আপনার কথা! তার মানে নালিশ আছে একটা। কারা বলুন তো আমাদের বাড়ির দেওয়ালে রাজনীতির কথা লিখে যায়? তারা কারা? আপনাদেরই তো এলাকা এটা, আপনার জানার কথা!

—কী লিখেছে?

—সে অনেক কথা। ঢোকার সময়ে দেখেন নি? বর্ষার পরেই নিজেদের খরচে বাইরেটা রং করালুম। দেখুন গিয়ে, কালো রং দিয়ে ছবি এঁকে লিখে কী করে গেছে শ্রী! তা ছাড়া রাতভর লেখে, গোলমালে আমরা কাল রাতে ঘুমোতে পারিনি।

নীলু উদাসভাবে বলে—বারণ করে দিলেই পারো।

—কে বারণ করবে? আপনার বন্ধু ঘুমোতে না পেরে উঠে সিগারেট ধরালো আর ইংরিজিতে আপনমনে গালাগাল দিতে লাগল—ভ্যাগাবন্ডস, মিসফিটস, প্যারাসাইটস...আরও কত কী! সাহস নেই যে উঠে ছেলেগুলোকে ধমকাবে।

—তা তুমি ধমকালে না কেন? নীলু বলে উদাসভাবটা বজায় রেখেই।

বল্লরী হাসল উজ্জ্বলভাবে। বলল—ধমকাইনি নাকি! শেষমেষ আমিই তো উঠলাম। জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বললাম—ভাই, আমরা কি রাতে একটু ঘুমোবো না? আপনার বন্ধু তো আমার কাণ্ড দেখে অস্থির। পিছন থেকে আঁচল টেনে ফিসফিস করে বলছে—চলে এসো, ওরা ভীষণ ইতর, যা তা বলে দেবে। কিন্তু ছেলেগুলো খারাপ না। বেশ ভদ্রলোকের মতো চেহারা। ঠোঁটে সিগারেট জ্বলছে, হাতে কিছু চটি চটি বই, প্যামফলেট। আমার দিকে হাতজোড় করে বলল—বউদি, আমাদেরও তো ঘুম নেই। এখন তো ঘুমের সময় না এদেশে। বললুম—আমার দেয়ালটা অমন নোংরা হয়ে গেল যে! একটা ছেলে বলল—কে বলল নোংরা! বরং আপনার দেয়ালটা অনেক ইম্পর্ট্যান্ট হল আগের চেয়ে। লোকে এখানে দাঁড়াবে, দেখবে, জ্ঞানলাভ করবে। আমি বুঝলুম খামোখা কথা বলে লাভ নেই। জানালা বন্ধ করতে যাচ্ছি অমনি একটা মিষ্টি চেহারার ছেলে এগিয়ে এসে বলল—বউদি, আমাদের একটু চা খাওয়াবেন? আমরা ছজন আছি!

নীলু চমকে উঠে বলে—খাওয়ালে না কি?

বল্লরী মাথা হেলিয়ে বলল—খাওয়াব না কেন?

—সে কী!

শোভন মাথা নেড়ে বলল—আর বলিস না, ভীষণ ডেয়ারিং এই মহিলাটি। একদিন বিপদে পড়বে।

—আহা, ভয়ের কী! এইটুকু—টুকু সব ছেলে, আমার ভাই বাবলুর বয়সি। মিষ্টি কথাবার্তা। তা ছাড়া এই শরতের হিমে সারা রাত জেগে বাইরে থাকছে—ওদের জন্য না হয় একটু কষ্ট করলাম!

শোভন হাসে, হাত তুলে বল্লরীকে থামিয়ে বলে—তার মানে তুমিও ওদের দলে।

—আহা, আমি কী জানি ওরা কোন দলের? আজকাল হাজারো দল দেওয়ালে লেখে। আমি কী করে বুঝব!

—তুমি ঠিকই বুঝেছো। তোমার ভাই বাবলু কোন দলে তা কি আমি জানি না! সেদিন খবরের কাগজে বাবলুর কলেজের ইলেকশনের রেজাল্ট তোমাকে দেখালুম না? তুমি ভাইয়ের দলের সিমপ্যাথাইজার।

অসহায়ভাবে বল্লরী নীলুর দিকে তাকায়, কাঁদো কাঁদো মুখ করে বলে—না, বিশ্বাস করুন। আমি দেখিওনি ওরা কী লিখেছে।

নীলু হাসে—কিন্তু চা তো খাইয়েছো!

—হ্যাঁ। সে তো পাঁচ মিনিটের ব্যাপার। গ্যাস জ্বেলে ছ—পেয়ালা চা করতে কতক্ষণ লাগে! ওরা কী খুশি হল! বলল—বউদি, দরকার পড়লে আমাদের ডাকবেন। যাওয়ার সময়ে পেয়ালাগুলো জল দিয়ে ধুয়ে দিয়ে গেল। ওরা ভালো না?

নীলু শান্তভাবে একটু মুচকি হাসে—কিন্তু তোমার নালিশ ছিল বলছিলে যে! এ তো নালিশ নয়। প্রশংসা।

—না, নালিশই। কারণ, আজ সকালে হঠাৎ গোটা দুই বড় বড় ছেলে এসে হাজির। বলল—আপনাদের দেয়ালে ওসব লেখা কেন? আপনারা কেন এসব অ্যালাউ করেন? আপনার বন্ধু ঘটনাটা বুঝিয়ে বলতে ওরা থমথমে মুখ করে চলে গেল। আপনি ওই ছজনকে যদি চিনতে পারেন তবে বলবেন—ওরা যেন আর আমাদের দেয়ালে না লেখে। লিখলে আমরা বড় বিপদে পড়ে যাই। দু দলের মাঝখানে থাকতে ভয় করে আমাদের। বলবেন যদি চিনতে পারেন।

শোভন মাথা নেড়ে বলে—তার চেয়ে নীলু, তুই আমার জন্য আর একটা বাসা দেখ। এই দেওয়ালের লেখা নিয়ে ব্যাপার কদ্দুর গড়ায় কে জানে। এর পর বোমা কিংবা পেটো ছুঁড়ে দিয়ে যাবে জানালা দিয়ে, রাস্তায় পেলে আলু টপকাবে। তার ওপর বল্লরী ওদের চা খাইয়েছে—যদি সে ঘটনার সাক্ষীসাবুদ কেউ থেকে থাকে তবে এখানে থাকাটা বেশ রিস্কি এখন।

বল্লরী নীলুর দিকে চেয়ে বলল—বুঝলেন তো! আমাদের কোনো দলের ওপর রাগ নেই। রাতজাগা ছটা ছেলেকে চা খাইয়েছি—সে তো আর দল বুঝে নয়! অন্য দলের হলেও খাওয়াতুম।

বেরিয়ে আসার সময়ে দেওয়ালের লেখাটা নীলু একপলক দেখল। তেমন কিছু দেখার নেই। সারা কলকাতার দেওয়াল জুড়ে ছড়িয়ে আছে বিপ্লবের ডাক। নিঃশব্দে।

কয়েকদিন আগে এক সকালবেলায় হরলালের জ্যাঠামশাইকে নীলু দেখেছিল প্রাতঃভ্রমণ সেরে ফেরার পথে লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছেন দেওয়ালের সামনে। পড়ছেন লেখা। নীলুকে দেখে ডাক দিলেন তিনি। বললেন—এইসব লেখা দেখেছো নীলু? কীরকম স্বার্থপরতার কথা। আমাদের ছেলেবেলায় মানুষকে স্বার্থত্যাগের কথাই শেখানো হত। এখন এরা শেখাচ্ছে স্বার্থসচেতন হতে, হিংস্র হতে—দেখেছো কীরকম উলটো শিক্ষা!

নীলু শুনে হেসেছিল।

উনি গম্ভীর হয়ে বললেন—হেসো না। রামকৃষ্ণদেব যে কামিনীকাঞ্চন সম্বন্ধে সাবধান হতে বলেছিলেন তার মানে বোঝো?

নীলু মাথা নেড়েছিল। না।

উনি বললেন—আমি একদিনে সেটা বুঝেছি। রামকৃষ্ণদেব আমাদের দুটো অশুভ শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হতে বলেছিলেন। একটা হচ্ছে ফ্রয়েডের প্রতীক কামিনী, মার্কসের কাঞ্চন। ও দুই তত্ত্ব পৃথিবীকে ব্যভিচার আর স্বার্থপরতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তোমার কী মনে হয়?

নীলু ভীষণ হেসে ফেলেছিল।

হরলালের জ্যাঠামশাই রেগে গিয়ে দেওয়ালে লাঠি ঠুকে বললেন—তবে এর মানে কী? অ্যাঁ! পড়ে দেখ, এ সব ভীষণ স্বার্থপরতার কথা কি না।

তারপর থেকে যতবার সেই কথা মনে পড়েছে ততবার হেসেছে নীলু। একা একা।

বেলা বেড়ে গেছে। বাসায় খবর দেওয়া নেই যে শোভনরা খাবে। খবরটা দেওয়া দরকার। ফুলবাগানের মোড় থেকে নীলু একটা শর্টকাট ধরল। বড় রাস্তায় যেখানে গলির মুখ এসে মিশেছে সেখানেই দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সাধন—নীলুর চতুর্থ ভাই। কলেজের শেষ ইয়ারে পড়ে। নীলুকে দেখে সিগারেট লুকোলো। পথ—চলতি অচেনা মানুষের মতো দুজনে দুজনকে চেয়ে দেখল একটু। চোখ সরিয়ে নিল। তাদের দেখে কেউ বুঝবে না যে তারা এক মায়ের পেটে জন্মেছে, একই ছাদের নীচে একই বিছানায় শোয়। নীলু শুধু জানে সাধন তার ভাই। সাধনের আর কিছুই জানে না সে। কোন দল করছে সাধন, কোন পথে যাচ্ছে—কেমন তার চরিত্র—কিছুই জানা নেই নীলুর। কেবল মাঝে মাঝে ভোরবেলা উঠে সে দেখে সাধনের আঙুলে হাতে কিংবা জামায় আলকাতরার দাগ। তখন মনে পড়ে, গভীর রাতে ঘুমোতে এসেছিল সাধন।

এখন কেন জানে না, সাধনের সঙ্গে একটু কথা বলতে ইচ্ছে করছিল নীলুর। সাধন, তুই কেমন আছিস? তোর জামাপ্যান্ট নিয়েছিস তো তুই? অনার্স ছাড়িস নি তো! এরকম কত জিজ্ঞাসা করার আছে।

একটু এগিয়ে গিয়েছিল নীলু। ফিরে আসবে ভেবে ইতস্তত করছিল। মুখ ফিরিয়ে দেখল সাধন তার দিকেই চেয়ে আছে। একদৃষ্টে। হয়তো জিজ্ঞেস করতে চায়—দাদা, ভালো আছিস তো? বড্ড রোগা হয়ে গেছিস, তোর ঘাড়ের নলী দেখা যাচ্ছে রে! কুসুমদির সঙ্গে তোর বিয়ে হল না শেষপর্যন্ত, না? ওরা বড়লোক, তাই? তুই আলাদা বাসা করতে রাজি হলি না, তাই? না হোক কুসুমদির সঙ্গে তোর বিয়ে—কিন্তু আমরা—ভাইয়েরা তো জানি তোর মন কত বড়, বাবার পর তুই কেমন আগলে আছিস আমাদের! আহারে দাদা, রোদে ঘুরিস না, বাড়ি যা। আমার জন্য ভাবিস না—আমি রাতচরা—কিন্তু নষ্ট হচ্ছি না রে, ভয় নেই!

কয়েক পলক নির্জন গলিপথে তারা দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে এরকম নিঃশব্দ কথা বলল। তারপর সামান্য লজ্জা পেয়ে নীলু বাড়ির দিকে হেঁটে যেতে লাগল।

দুপুরে বাড়িতে কাণ্ড হয়ে গেল খুব। নাড়ুমামি কলকল করে কথা বলে, সেই সঙ্গে মা আর ছোট বোনটা। শোভনের দুই মেয়ে কাণ্ড করল আরও বেশি। বাইরের ঘরে শোভন আর নীলু শুয়েছিল—ঘুমোতে পারল না। সাধন ছাড়া অন্য ভাইয়েরা যে যার আগে খেয়ে বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে কি আস্তানায় কেটে পড়েছিল, তবু যজ্ঞিবাড়ির ভিড়ের মতো হয়ে রইল রবিবারের দুপুর।

সবার শেষে খেতে এল সাধন। মিষ্টি মুখের ডৌলটুকু আর গায়ের ফর্সা রং রোদে পুড়ে তেতে কেমন টেনে গেছে। মেঝেতে ছক পেতে বাইরের ঘরেই লুডো খেলছিল বল্লরী, মামি, আর নীলুর দুই বোন। বল্লরী চিনতেও পারল না সাধনকে। মুখ তুলে দেখল একটু, তারপর চালুনির ভিতর ছক্কাটাকে খটাখট পেড়ে দান ফেলল। সাধনও চিনল না।

একটু হতাশ হল নীলু। হয়তো রাতের সেই ছেলেটা সত্যিই সাধন ছিল না, নয়তো এখনকার মানুষ পরস্পরের মুখ বড় তাড়াতাড়ি ভুলে যায়।

নীলু গলা উঁচু করে বলল—তোমার মেয়ে দুটো বড় কাণ্ড করছে বল্লরী, ওদের নিয়ে যাও।

—আঃ, একটু রাখুন না বাবা, আমি প্রায় পৌঁছে গেছি।

রাত্রির শোতে শোভন আর বল্লরী জোর করে টেনে নিয়ে গেল নীলুকে। অনেক দামি টিকিটে বাজে একটা বাংলা ছবি দেখল তারা। তারপর ট্যাক্সিতে ফিরল।

জ্যোৎস্না ফুটেছে খুব। ফুলবাগানের মোড়ে ট্যাক্সি ছেড়ে জ্যোৎস্নায় ধীরে ধীরে হেঁটে বাড়ি ফিরছিল নীলু। রাস্তা ফাঁকা। দুধের মতো জ্যোৎস্নায় ধুয়ে যাচ্ছে চরাচর। দেওয়ালে দেওয়ালে বিপ্লবের ডাক। নিরপেক্ষ

মানুষেরা তারই আড়ালে শুয়ে আছে। দূরে দূরে কোথাও পেটো ফাটবার আওয়াজ ওঠে। মাঝে মধ্যে গলির মুখে মুখে যুদ্ধের ব্যূহ তৈরি করে লড়াই শুরু হয়। সাধন আছে ওই দলে। কে জানে একদিন হয়তো তার নামে একটা শহিদ স্তম্ভ উইঢিবির মতো গজিয়ে উঠবে গলির মুখে।

পাড়া আজ নিস্তব্ধ। তার মানে নীলুর ছোটলোক বন্ধুরা কেউ আজ মেজাজে নেই। হয়তো ব্রিটিশ আজ মাল খায়নি, জগু আর জাপান গেছে ঘুমোতে। ভাবতে ভালোই লাগে।

শোভন আর বল্লরীর ভালোবাসার বিয়ে। বড় সংসার ছেড়ে এসে সুখে আছে ওরা। কুসুমের বাবা শেষপর্যন্ত মত করলেন না। এই বিশাল পরিবারে তাঁর আদরের মেয়ে এসে অথৈ জলে পড়বে। বাসা ছেড়ে যেতে পারল না নীলু। যেতে কষ্ট হয়েছিল। কষ্ট হয়েছিল কুসুমের জন্যও। কোনটা ভালো হত তা সে বুঝলই না। একা হলে ঘুরেফিরে কুসুমের কথা বড় মনে পড়ে।

বাবা ফিরবে পরশু। আরও দুদিন তার কিছু চাক্কি ঝাঁক যাবে। হাসি মুখেই মেনে নেবে নীলু। নয়তো রাগই করবে। কিন্তু ঝাঁক হবেই। বাবা ফিরে নীলুর দিকে আড়ে আড়ে অপরাধীর মতো তাকাবে, হাসবে মিটিমিটি। খেলটুকু ভালোই লাগবে নীলুর। সে এই সংসারের জন্য প্রেমিকাকে ত্যাগ করেছে—কুসুমকে—এই চিন্তায় সে কি মাঝে মাঝে নিজেকে মহৎ ভাববে?

একা থাকলে অনেক চিন্তায় টুকরো ঝড়ে—ওড়া কুটোকাটার মতো মাথার ভিতরে চক্কর খায়।

বাড়ির ছায়া থেকে পোগো হঠাৎ নিঃশব্দে পিছু নেয়। মনে মনে হাসে নীলু। তারপর ফিরে বলে—পোগো, কী চাস?

পোগো দূর থেকে বলে—ঠালা, টোকে মার্ডার করব।

ক্লান্ত গলায় নীলু বলে—আয়, করে যা মার্ডার।

পোগো চুপ থাকে একটু, সতর্ক গলায় বলে—মারবি না বল!

বড় কষ্ট হয় নীলুর। ধীরে ধীরে পোগোর দিকে এগিয়ে গিয়ে বলে—মারবে না। আয়, একটা সিগারেট খা।

পোগো খুশি হয়ে এগিয়ে আসে।

নিশুত রাতে এক ঘুমন্ত বাড়ির সিঁড়িতে বসে নীলু, পাশে পাগলা পোগো। সিগারেট ধরিয়ে নেয় দুজনে। তারপর—যা নীলু কখনো কাউকে বলতে পারে না—সেই হৃদয়ের দুঃখের গল্প—কুসুমের গল্প—অনর্গল বলে যায় পোগোর কাছে।

পোগো নিবিষ্ট মনে বুঝবার চেষ্টা করে।

# মৃণালকান্তির আত্মচরিত

## ভূমিকা

মৃণালকান্তি আমাকে অনেক গলিঘুঁজি, চোরাপথ, ভাঁটিখানা, বেশ্যাদের আস্তানা, হিজড়েদের আড্ডা চিনিয়েছিল। এইভাবে চেনা রাস্তা ভুলিয়ে অচেনা রাস্তায় সে বহুবার আমাকে নিয়ে গেছে। মনে আছে অনেকদিন মৃণালকান্তির সঙ্গে শিয়ালদা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের রিফিউজিদের বিবাহ, সঙ্গম, জন্ম এবং মৃত্যু দেখব বলে দাঁড়িয়ে থেকেছি। উপকরণের খোঁজে এইভাবে সে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াত। যতদূর জানা যায় মৃণালকান্তি তখন তার আত্মজীবনী রচনায় ব্যস্ত ছিল। তার সেই আত্মজীবনীর কিছু কিছু পৃষ্ঠা আমি পড়ে দেখেছি। সদ্যলব্ধ অভিজ্ঞতা, স্মৃতি ও স্বপ্ন—এই ছিল তার আত্মজীবনীর উপকরণ এবং এই সব নিয়ে সে এত বেশি উত্তেজিত থাকত যে, কখনো রাস্তায় ঘাটে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে সে তার মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে কপাল টিপে রেখে এমন ভাবে তাকাত যেন চিনতে পারছে না। তার রুক্ষ চোয়াল, গাল—ভাঙা মুখের ওপর নীল শিরাগুলি দেখা যেত। কখনো আমি তাকে বলতাম, 'তোমাকে মাঝে মাঝে ভীষণ অচেনা মনে হয় হে মৃণালকান্তি, বাস্তবিক!' পকেট থেকে জাদুকরের মতো নিমেষে একটা রুমাল বের করে মৃণালকান্তি তার মুখের বিষণ্নতা ও ক্লান্তি চাপা দিয়ে বলত, 'কোথায় যাচ্ছ!' কিংবা 'খুব ব্যস্ত কি?' আমি 'না' জানালে সে বলত 'তবে এসো, একটু চা খাওয়া যাক।' নির্জন অচেনা নিঃশব্দ কোনো রেস্তরাঁয় আমরা মুখোমুখী বসতাম আর তখন মৃণালকান্তি কাঁধের ঝোলা ব্যাগ থেকে সদ্যলেখা তার আত্মজীবনীর পৃষ্ঠাগুলি বের করে আমাকে পড়তে দিত।

আমার মনে হয় আত্মজীবনী বলতে যা বোঝায় মৃণালকান্তি ঠিক তা লেখেনি। এইরকম জনশ্রুতি আছে যে, মৃণালকান্তি প্রায়ই স্মৃতি ও স্বপ্নের দ্বারা আক্রান্ত হত। এই সম্বন্ধে সে নিজে লিখে গেছে, 'আমার মনে হয় স্মৃতি এবং স্বপ্ন—এই দুইটি শব্দ আমাদের সচেতন করিবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। পাপ—পুণ্যময় এ জগতে স্মৃতি এবং স্বপ্ন সকলেরই স্বাভাবিক অবলম্বন। বাস্তবিক ঠিকমতো অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, আমাদের অধিকাংশ প্রেমের কবিতা, দার্শনিক প্রবন্ধ, ইস্পাতের কারখানা এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্র স্মৃতি ও স্বপ্নের দ্বারা রচিত।' মনে হয় এইখানে মৃণালকান্তি স্মৃতি অর্থে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান এবং স্বপ্ন অর্থে কল্পনা বোঝাতে চেয়েছে। কিন্তু আমার অনুমান এইমাত্র যে, মৃণালকান্তির স্মৃতি ও স্বপ্ন খুব স্বাভাবিক স্তরে ছিল না, কেননা সে নিজেই অন্যত্র লিখেছে : '...কিন্তু আমার আত্মজীবনী বাস্তবিক ইস্পাতের কারখানা, প্রেমের কবিতা কিংবা দার্শনিক প্রবন্ধ নয়। ইহার ভিতরে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের দু—একটা লক্ষণ বর্তমান থাকিলেও বাস্তবিক ইহাকে ষোলো আনা দূরবীক্ষণ যন্ত্রও বলিতে পারা যায় না। যাহাদের স্মৃতি এবং স্বপ্ন স্বাভাবিক স্তরে আছে তাহারা প্রেমের কবিতা এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করে বটে, কিন্তু আত্মজীবনী রচনার চেষ্টা কদাচ করে না। আমার মতো মানুষের আত্মজীবনীর মূল্য কি তা—যাহাদের স্মৃতি এবং স্বপ্ন স্বাভাবিক স্তরে আছে —তাহাদের কাছে বোধগম্য নয়। কেননা যে স্মৃতি এবং স্বপ্ন অতীতে একদা আমাদের ইস্পাতের কারখানা ও দার্শনিক প্রবন্ধ রচনা করিতে সাহায্য করিয়াছে তাহা আমার ভিতরে উপস্থিত থাকিলে আমার যাবতীয় পণ্ডশ্রম একটিমাত্র আত্মজীবনী রচনাতেই কেন্দ্রীভূত হইল কেন! তাও স্থির প্রত্যয়জাত অঙ্কের মতো নির্ভুল কোনোকিছু এই রচনাতে নাই—বরং এর সর্বত্র রচয়িতার তীব্র সন্দেহ মাত্র উপস্থিত আছে। কোনো ঘটনায় মাথার ভিতরে চকিতে বিস্ফোরণ ঘটিলে তাহার আলোতে যতদূর দেখা যায় ততদূর হইতে আমার স্মৃতি ও

স্বপ্নগুলি আহরণ করিতেছি। মাঝে মাঝে ভ্রম হয় আমি কতদূর অর্থহীন তাহা জানিবার আগ্রহেই আমি এই আত্মজীবনী রচনা করিতেছি।'

**আখ্যান**

ছায়া ছিল খুব হিসেবি মেয়ে। যাদবপুরের কোনো রিফিউজি কলোনী থেকে ছায়া কলকাতায় মাস্টারি করতে আসত। মৃণালকান্তি পরিচয় করিয়ে দিলে আমি ছায়াকে প্রথম দেখে বড় হতাশ হই। টলটলে চোখ ছিল না ছায়ার—শীতকালে শুকনো ঠোঁটের ওপর মামড়ি দেখা যেত। শরীরে মেয়েদের যে সব আকর্ষণ থাকে তার কোনোটাই ছিল না। খুব ঘন ঘন সিনেমা দেখত ছায়া—সব বাংলা ছবিই তার মোটামুটি ভালো লাগত। কখনো কোনো কবিতার লাইন ছায়া বলেছিল কি! আমার মনে পড়ে না। প্রথমবার পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় মৃণালকান্তি, 'এই ছায়া। আমার—' বলে কথা শেষ করবার আগেই মনে পড়ে ছায়া বলল, 'থাক আর বলতে হবে না, উনি বুঝতে পারছেন।' মৃণালকান্তির সামনে প্রথমদিনই ছায়া আমার ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করেছিল। বলেছিল, 'আমি খুব বেশি খাই না,' বলেছিল, 'আমার ছোট বোন গান জানে, আপনার সঙ্গে বেশ মানায়।' প্রতি বৃহস্পতিবার আর শনিবার সন্ধে পাঁচটা থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত সে মৃণালকান্তির সঙ্গে থাকত। ওই দুদিন তার টিউশনি ছিল না। সাতটা পঁয়তাল্লিশের ট্রেন ধরে ছায়া বাড়ি ফিরত—যদিও ছায়ার হাতে কখনো ঘড়ি দেখিনি। যেমন টনটনে ছিল তার সময়জ্ঞান তেমনি বুদ্ধিশুদ্ধি ছিল ছায়ার। মৃণালকান্তি ডায়েরি লিখছে জেনে সে মধ্যে মধ্যে তার ডায়েরি পড়তে চাইত। মৃণালকান্তির আত্মজীবনীর সবটুকু আমি পড়িনি। ছায়াকে কোথা থেকে কেন জোগাড় করেছিল—সে আমি জানি না। মনে পড়ে তার আত্মজীবনীর কোথাও ছায়ার সঙ্গে তার পরিচয় হওয়ার আগে সে লিখেছিল, '...কোনোদিন কোনো যুবতী মহিলার সঙ্গে রাস্তায় হাঁটিয়া যাই নাই—যাহাতে মনে হয় চতুষ্পার্শ্বস্থ সবকিছু আমাদের কেন্দ্র করিয়াই আবর্তিত হইতেছে। আমি কখনো মায়ের সঙ্গে, আত্মীয় মহিলার সঙ্গে রাস্তায় হাঁটিয়াছিলাম। সমান বুদ্ধিমতী সমান বয়স্কা কোনো মহিলার সঙ্গে হাঁটিয়া গেলে এমন মনে হইবে কি যে, এই মুহূর্তগুলি আমার সব চেয়ে প্রিয়; যেন আমরা সবকিছুর কেন্দ্রস্থলে আছি! মনে হইবে কি যে, আমি কখনো মৃত্যুশোক অনুভব করি নাই! নিজেকে ক্ষুদ্রজীবী শিশুর মতো মনে হইবে কি যে, তাহার প্রিয়জনের দেহে ক্ষুদ্র হস্ত পদের দ্বারা প্রবল আঘাত করিয়া জানাইতে চাহে—আমি আছি!...'

মনে হয় ছায়া ক্রমশ মৃণালকান্তি সম্পর্কে হতাশ হচ্ছিল। মৃণালকান্তি ছিল প্রায় বেকার। কোনো এক ছোট্ট প্রকাশকের দোকানে সে কিছুদিন কাজ করেছিল। মাঝে মাঝে বইয়ের প্যাকেট বয়ে নিয়ে তাকে এখানে ওখানে পৌঁছে দিতে হত। কিন্তু খুব গরিব সে ছিল না। তার বাবার জমানো কিছু টাকা সে পেয়েছিল, ভাই—বোন না থাকাতে পাকিস্তানের জমিজমা বিক্রি করে কিছু টাকার নিরঙ্কুশ মালিকানা সে পেয়েছিল। এইসব বন্দোবস্ত তার মা মৃত্যুর আগেই তার জন্য করে যান। নইলে ষাট টাকা মাইনে পেয়ে বেনেটোলা লেন—এর যে ঘরটা ভাড়া করে সে থাকত তার ত্রিশ টাকা ভাড়া দিয়ে দিলে পাইস হোটেল, সিগারেট এবং প্রতিদিনের পয়সা তার থাকত না। মৃণালকান্তি বেহিসেবি ছিল না, কিন্তু সম্ভবত ছায়া চাইত—বিয়ের পর মৃণালকান্তি তাকে চাকরি ছেড়ে দিতে বলুক, এবং দোকানের শো—কেসে সাজানো কিছু কিছু জিনিসপত্র মৃণালকান্তির ঘরে থাক। বিয়ে করার কথা ছায়া এত বেশি ভেবেছিল যে, একদিন শ্রদ্ধানন্দ পার্কে অন্ধকারে মুখ রেখে বলে, 'আমি চাই তুমি এমন কোনো কাজ করো যাতে আমাকে ছেড়ে তোমাকে অনেকদিনের জন্যে দূরে চলে যেতে হয়। আমি বেশ তোমার অপেক্ষায় থাকব।' অন্যদিন শিয়ালদায় ট্রেন লেট আছে জেনে প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসে বলেছিল, 'অফিস থেকে ফিরে এলে পিছু পিছু অফিসের পিয়ন ফাইল নিয়ে আসে—দেখতে আমার বেশ লাগে।'

মৃণালকান্তি ছায়াকে কখনো খুব দূরে নিয়ে যেতে চেয়েছে, ছায়া রাজি হয়নি। মনে হয় নানা পরিবেশে সে ছায়াকে দেখতে চাইত। কী দেখতে চাইত মৃণালকান্তি! ঠিক কি চাইত তা আমি জানি না, তবে তার আত্মজীবনীর কোনো এক জায়গায় আমি পড়েছিলাম, একদিন লিন্ডসে স্ট্রিটের এক দোকানের পাশ দিয়ে

যেতে যেতে কাচের শো—কেসে একটা মেয়ের 'ডামি' দেখে মুখটা খুব পরিচিত মনে হওয়ায় সে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। সে লিখেছে 'ইহাকে আমি কোথায় দেখিয়াছি! এইরূপ প্রাণহীন প্রস্তরবৎ মূর্তি নয়, আমি অবশ্যই ইহার কণ্ঠস্বর শুনিয়াছি, ইহাকে হাসিতে ও কথা বলিতে দেখিয়াছি। ইহাকে আমি বিষাদগ্রস্ত ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় দেখিয়াছি। কিন্তু কিছুতেই মনে পড়ে না। এমন মাঝে মাঝে হয়। গতকালের কথা কতবার ভুলিয়া গিয়াছি। স্টেট বাসে কে আমার পাশে বসিয়াছিল—তাহার মুখ দেখি নাই, কন্ডাক্টরের হাতে পয়সা গুনিয়া দিয়া টিকিট লইয়াছি—কৈ কোনো কন্ডাক্টরের মুখ তো মনে পড়ে না! মনে হয় কতকাল মানুষের সহিত আমি কিছুই বিনিময় করি নাই।' তারপর মৃণালকান্তি লিখছে, 'মনে হয় এই মুখে কোথাও বিষণ্ণতা ছিল। দীর্ঘকাল কাঁচের আবরণে ঢাকা থাকিতে থাকিতে সেই আবরণ ভাঙিয়া বাহিরে আসিবার ইচ্ছা জন্মায় নাই বলিয়া কি এই বিষাদ! মনে পড়ে যাহাদের মুখে বিষণ্ণতা ছিল না তাহাদের সহিত কখনো আমার বন্ধুত্ব হয় নাই। বোধকরি সেইজন্যই সুবলের মুখ আমি ভুলিয়া যাই নাই।' এরপর মৃণালকান্তি সুবলের কথা অনেকটা লিখেছে। সুবল চমৎকার গল্প বলতে পারত। স্কুলে অনেকে সুবলকে ঘিরে বসে গল্প শুনত। বলতে বলতে সে ইচ্ছেমতো গল্পটাকে বড় কিংবা ছোট করতে পারত, বদলে দিতে পারত, গল্পটা যেদিকে যাচ্ছিল ঠিক তার উলটোদিকে নিয়ে যেতে পারত। তার গল্প শুনে সবচেয়ে যে বেশি মুগ্ধ হয়ে যেত সে ছিল মৃণালকান্তি। সুবলের গায়ে নানা জায়গায় কতগুলি দীর্ঘস্থায়ী ঘা ছিল—যা কখনো শুকোত না; মাঝে মাঝে ঘা বেয়ে রক্ত পড়ত, প্রায়ই খোস পাঁচড়ায় ভুগত সুবল, এবং কাছ থেকে কথা বললে সুবলের মুখ থেকে বিশ্রী পচা গন্ধ পাওয়া যেত। মৃণালকান্তি তাকে ঘেন্না করত। সেই সুবল একবার তার ঠোঁটে চুমু খেয়েছিল। মৃণালকান্তি লিখছে, 'সহসা আমার ভিতরে সে কী সঞ্চার করিয়াছিল! চকিত বিস্ফোরণের আলোয় আমি কী দেখিতে পাইয়াছিলাম। মনে পড়ে না। সুবলকে দেখিতাম—স্কুলের সিঁড়িতে সে একা বসিয়া আছে, গ্রাম্য মেঠো পথ দিয়া একা একা ফিরিতেছে। আমি আর তাহার কাছে যাই নাই।' দীর্ঘদিন—প্রায় আঠারো—উনিশ বছর পর সুবলকে সে আবার দেখেছিল, কলকাতায় সিনেমা হলের কর্মীরা মিছিল বের করলে সেই মিছিলে সুবলের মুখ চকিতে ভেসে যাচ্ছিল। সুবল কোন সিনেমা হলে 'গেট—কিপার' হয়েছিল। সে লিখছে, 'একদা ছেলেবেলায় মুখোমুখী হইয়া সহসা শূন্য বোধ করিলে যাহা আমরা করিয়াছিলাম তাহার স্মৃতি আমাকে গভীর আহত করিল। আজ আবার দেখা হইলে আমরা পরস্পর কি বিনিময় করিব! কিন্তু এতদিন পর সুবলকে আমি পুনরায় হাজার লোকের মিছিল হইতে চিনিয়া বাহির করিয়াছি। আমি কী দেখিয়াছিলাম! মনে হয় সুবলের মুখের সেই বিষাদ কখনো পাল্টায় নাই, মনে হয় একাকী, কিংবা বহুজনের সঙ্গে মিলিয়া বরাবরই সুবলের কি একটা কথা বলিবার ছিল—ছেলেবেলায় তাহার গল্পের ভিতর দিয়া, চুম্বনের ভিতর দিয়া, শেষ যৌবনে আর্ত স্লোগান ও উৎক্ষিপ্ত বাহুর ভিতর দিয়া সে সেই কথাই বলিয়া চলিয়াছে। আমি তাহাকে ঠিক চিনিয়াছিলাম। দেখা হইলে আজ আমরা পুনরায় চুম্বন না বিষণ্ণতা বিনিময় করিব! ভিড়ের ভিতরে আত্মগোপন করিতে করিতে আমার মনে হইল আজ আমি পুনরায় সুবলকে ভালবাসিতে পারিতেছি।'

তেমন করে মৃণালকান্তিকে ছায়ার কিছু বলবার ছিল কি? যতদূর জানি বিষণ্ণতা ছায়ার ভিতর কোথাও ছিল না। বিভিন্ন চুম্বনের আলাদা আস্বাদ মৃণালকান্তি টের পেত কিনা আমি জানি না। সুবলের কথা শেষ করে মৃণালকান্তি লিখছে, 'কিন্তু বাস্তবিক ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম—এই ডামির মুখে আনন্দ বা বিষাদ কিছুই নাই। প্রাণহীনতা আছে মাত্র। এই প্রতিমার মতো মুখের সহিত অলৌকিক চিত্ত—বিনিময় সম্ভব নহে। দুর্গা প্রতিমার বিসর্জনের বাজনায় কেবল ইহার তাৎক্ষণিক বিষণ্ণতা ধ্বনিত হয়।'

মনে হয় ছায়ার ভিতর তবু কিছু খুঁজে পেয়েছিল মৃণালকান্তি যা তার ডামির মুখের বিষণ্ণতার মতো তাৎক্ষণিক। মৃণালকান্তির আত্মজীবনী থেকে জানতে পারি কোনো শনিবার ময়দান থেকে বেরিয়ে ফিরবার পথে বৃষ্টি নামলে ছায়া ওর আগে দ্রুত হাঁটছিল। ছায়া কোনো 'শেড' খুঁজছিল—মৃণালকান্তি ওকে দাঁড়াতে দিল না। ওরা সাবধানে হাঁটছিল। ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে ভিজছিল। ছায়ার শাড়ির কলপ ভিজে গিয়ে শাড়িটা ওর রোগা শরীরের সঙ্গে লেপটে যাচ্ছিল। পিছন থেকে ওকে দেখাচ্ছিল হঠাৎ চোপসানো, ভেজা একটা চড়াই

পাখির মতো। ময়ূর তার পেখম গুটিয়ে নিলে হঠাৎ তার পিছনে যে শূন্যতা দেখা দেয়—মৃণালকান্তি লিখছে, 'ছায়ার সম্মুখে সেইরূপ শূন্যতার ভিতর দিয়া দেখা গেল একজন ট্রাফিক পুলিস একটা কানা ভিখিরির ছেলেকে হাত ধরিয়া রাস্তা পার করিয়া দিতেছে। ছায়া এইসব কিছুই দেখিল না। দেখিল না তাহার সম্মুখে ক্ষণস্থায়ী সেই কম্পমান দৃশ্যের পশ্চাদভূমিতে তাহার ঘাড়ের তিনটা হাড় উঁচু হইয়া আছে, চূর্ণ চুলের উপর জলের ফোঁটায় সহসা প্রলয় প্রতিভাত হইতেছে। আমি মনে মনে তাহার নিকট প্রার্থনা করিতেছিলাম—এখন তোমার চতুর চোখ আমার দিকে ফিরাইও না, সোজা হাঁটিয়া যাও—আমি তোমার পিছনে এইরূপে শাশ্বতকাল হাঁটিতে থাকিব। কিন্তু কোথায় যেন বিসর্জনের বাজনা বাজিতেছিল। ছায়া মুখ ফিরাইয়া আমাকে কি বলিতেছিল—আমি শুনি নাই। শুধু চূর্ণ দৃশ্যের উপর, জলে প্রতিভাত বিম্বের উপর হইতে ডামির মুখের ক্ষণস্থায়ী বিষণ্ণতা ভাঁটার টানে নামিয়া যাইতেছিল।'

সেই রাতে ফিরে এসে মৃণালকান্তি লিখেছিল, 'আমার বাবা সুধাকর হালদার ছিলেন দারোগা। তাঁহার মফস্বল ভ্রমণের জন্য একটা প্রকাণ্ড কালো ঘোড়া ছিল। আমি একটু বড় হইলে আমার রোগা রোগা হাত পায়ের দিকে চাহিয়া তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল খুব শক্ত সমর্থ হইয়া গড়িয়া না উঠিলে তাঁহার পুত্র মৃণালকান্তি জীবনে এমন কি দারোগাও হইতে পারিবে না। তাই আমার ভিতরে প্রাণসঞ্চার করিবার জন্য আমাকে একদিন সেই ঘোড়ায় সওয়ার করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। মনে পড়ে আমি ভয়ে অনেক চীৎকার ও কান্নাকাটি করিয়াছিলাম। অবশেষে ঘোড়াটা আমাকে এক মাঠের ভিতরে আনিয়া পিঠ হইতে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছিল। অনেক বড় হওয়ার পরও সেই দুঃস্বপ্নকে আমি ভুলিয়া যাই নাই। অনেকবার ঘোড়ার পিঠ হইতে পড়িয়া যাওয়ার স্বপ্ন দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়া আমার ঘুম ভাঙিয়াছে। মনে হয় জাগরণেও সেই পতনের অনুভূতি আমাকে কখনো ঝাঁকি দিয়া যায়। সংশয় হয় আমি শাশ্বতকাল একটিমাত্র ঘোড়ার পৃষ্ঠে সওয়ার হইয়া থাকিবার চেষ্টা করিতেছি না তো!' তারপর সুধাকর হালদারের কথা লিখতে গিয়ে মৃণালকান্তি দীর্ঘ বর্ণনা করেছিল। শেষে সে লিখেছে '...তখনো আমি ছোটো, মফস্বল হইতে ঘোড়ার পিঠে একা ফিরিবার পথে কাহার মাছের জাল ছুঁড়িয়া তাঁহাকে ঘোড়া হইতে ফেলিয়া দিয়াছিল এবং সেইখানেই লাঠিপেটা করিয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলে। বনতলীর নির্জন মাঠের ভিতর সেই গ্রাম্য দারোগা—হত্যার ঘটনাতেই সম্ভবত সুধাকর হালদার তাঁহার পুত্র মৃণালকান্তির অনুভূতিগুলি প্রথম ও শেষবারের মতো প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃতদেহ লইয়া বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। মনে পড়ে মায়ের মৃত্যুতে তেমন ঘনঘটা কিছুই ছিল না। কলিকাতার এক ভাড়াটে বাড়িতে তাঁহার চেষ্টাহীন নিঃশব্দ মৃত্যু ঘটিয়াছিল। বাড়িওয়ালাই কিছু লোকজন ডাকিয়া আনিয়াছিল। শোক না, বৈরাগ্যও না—বিরাট এক মিশ্র জনতার ভিতর দিয়া খোলা রাস্তায় উজ্জ্বল রৌদ্রে আমার রোগা ছোট্ট মায়ের মৃতদেহের অনুগমন করিয়া যাইতে আমার লজ্জা করিতেছিল। আমি কাহার জন্য শোক করিব, কাহাকে ভালবাসিব! পৃথিবীর যে প্রকাণ্ড মিশ্র জনতার ভিতর আমি রহিয়াছি তাহাদের কয়জন জানে যে, একজন মৃণালকান্তির একজন মা ছিল এবং মৃণালকান্তির সেই রোগা, ছোট্ট, দুর্বল মা আর নাই!' মৃণালকান্তি লিখেছিল 'নিজেকে এমন উদ্বাস্তু মনে হয় কেন! কখনো নিশ্চিতভাবে বলিতে পারি না—আমি ভালবাসি! ভালবাসি না—এ কথাও সংশয়ে কতবার বলা হয় নাই!'

গড়িয়াহাটার দিকে কোথায় যেন মৃণালকান্তির সোনাকাকা গেঞ্জি ফিরি করে বেড়াত। তার এইরকম কিছু কিছু আত্মীয়স্বজন নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিল। বিধবা 'রাঙামাসী', বাবার খুড়তুতো ভাই সোনাকাকা, বড়পিসি, গ্রাম সম্পর্কে জ্যাঠামশাই ইত্যাদি এবং যাদবপুর, টালিগঞ্জ, কসবা, মধ্যমগ্রাম কিংবা আরও দূরে তার আরও আত্মীয়রা ছিল। কখনো কারো সঙ্গে দেখা আর কাউকে মনে পড়ত—তখন খেয়াল করে খোঁজ নিত, একদিন গিয়ে সকলের সঙ্গে দেখা করে আসবে বলে কথা দিত। প্রায়ই যাওয়া হয়নি। কখনো কারা অভাব শুনলে দু—পাঁচ টাকা সাহায্য পাঠিয়েছে, কখনো পাঠানো হয় নি। কলেজ স্ট্রিটে ছায়ার সঙ্গে একদিন রাস্তা পার হতে গেলে কাঁধে গেঞ্জির বোঝা নিয়ে সোনাকাকা পথ আটকাল—দুজনকে একসঙ্গে দেখেও। আর্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল সোনাকাকা, 'বিয়া করস নাই!' মৃণালকান্তি লিখছে, 'সোনাকাকাকে কষ্টে চিনিতে

পারিয়া আমি সিগারেট ফেলিয়া দিলাম। তবে কি আমি আস্তে আস্তে প্রিয়জনদের মুখগুলি ভুলিয়া যাইতেছি! মনে পড়ে হাওড়া স্টেশনে একজন তাহার বিড়ি ধরাইতে আমার সিগারেটটা চাহিয়া লইয়াছিল। কেমন সন্দেহ হওয়ায় আমি আর সিগারেটটা ফেরত না লইয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিলাম। মনে হইল, ইহাকে আমি কখনো জ্যাঠা বলিয়া ডাকিতাম কি! আত্মীয়দের মুখ ক্রমশ ভুলিতেছি। রাঙামাসীর মুখ মনে পড়ে না। কবে যেন বড়পিসি আমাকে বলিয়াছিল 'মনু, বাইরে চলাফিরা কর, একখান পঞ্জিকা রাখছ তো!' ছায়া কি ভাবিল জানি না। সে আমাকে কিছু বলে নাই। আমি পকেটে হাত দিতে গেলে সোনাকাকা আমার হাত আটকাইল 'মনু, তরেই তো আমার দ্যাওনের কথা।' তাহার পর ছায়ার সঙ্গে নিঃশব্দে হাঁটিয়া গেলাম। মনে পড়ে না কোনোদিন আমার মানুষকে ভালবাসিবার সর্বব্যাপী সাধ হইয়াছিল কিনা।'

অন্য একদিনের কথা মৃণালকান্তি লিখেছিল। দুপুরবেলায় এসপ্ল্যানেড একটা ফাঁকা রেস্তরাঁয় সে বসেছিল। সেটা একটা মাদ্রাজী রেস্তরাঁ। কিছুক্ষণ আগে সে দ্বিতীয়বার স্টেনলেস স্টিলের কাপ থেকে গরম চা খেয়েছে। তার ঠোঁট জ্বলছিল। বাইরে সবকিছুই খুব আলোকিত, উত্তপ্ত এবং ছায়াহীন। রেস্তরাঁর ভিতরটা অনেক ঠান্ডা এবং নির্জন। সে লিখছে, 'যেখানে বসিয়া আমি আমার নোট লিখিতেছি সেখান হইতে রাস্তা, ময়দান, মনুমেন্ট সবই দেখা যায়। স্টেটবাসগুলি রাস্তা গিলিতে গিলিতে যাইতেছে। আমি রাস্তায় পায়ের শব্দ এবং কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইতেছি। জুন মাসের দুপুর বলিয়া রাস্তায় লোকজন কম। হঠাৎ তাকাইলে—আমি সবকিছুর কেন্দ্রস্থলে আছি—এমন মনে হয়। এমন মুহূর্তগুলি আমার এত প্রিয়—যেন সবকিছুই আমাকে স্পর্শ করিয়া আছে। এমন সব মুহূর্ত হইতেই আমরা নূতন করিয়া যাত্রা আরম্ভ করি। পাশের টেবিল হইতে দুজন ব্যবসায়ী উঠিয়া গেলে চর্বির পাহাড় গলায় থাক—থাক গলকম্বলওয়ালা এক পাঞ্জাবী আসিয়া বসিল। আধ খোলা ঘুমচোখে সে আমাকে লিখিতে দেখিতেছে। কি লিখিতেছি আমি! এই মুহূর্তেই যেন মনে হইতেছে কাহারা আমার হাত ছাড়িয়া দিয়া চিরতরে চলিয়া গিয়াছে।'

'একশত বৎসর একটানা ঘুমাইবার পর সহসা জাগিয়া উঠিয়া আমি পরিচিত লোকজন কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না। কি বলিয়া আত্মপরিচয় দিব! আমি কাহার সন্তান! আমি বিশেষ কাহারও কি! ঐ পর্বতাকার পাঞ্জাবীটার সন্তান আমি হইলাম না কেন? আমি গাছ হই নাই কেন; আমি মাছ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেই বা কাহার কি ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল! পরিচিত বৃত্তের বাহিরে নিজেকে আত্মপরিচয়হীন, নামগোত্রহীন বোধ হইলে ভাবিয়া দেখি আমার মুখ কাহারও মনে আছে কি! একশত বৎসর পূর্বে কবে দেখিয়াছিলাম সোনাকাকা গড়িয়াহাটার মোড় হইতে গেঞ্জি হাঁকিতে হাঁকিতে ভিড়ের ভিতর পথ চিনিয়া চলিয়াছে। ছায়াকে মনে পড়ে না! সহসা সুবলের মুখ একশত বৎসর পার হইতে হইতে বিস্ফোরিত হয়। মনে হয় অনেক মৃত মানুষ আমাদের জীবিত মানুষদের মধ্যে গা—ঢাকা দিয়া বে—আইনিভাবে বসবাস করিতেছে।'

মৃণালকান্তি একদিন ছায়াকে ট্রেনে তুলে দিলে ট্রেন প্ল্যাটফর্মের আলো থেকে বাইরের অন্ধকারের দিকে সরে যাচ্ছিল। জানলায় মুখ রেখে হাত বাড়িয়ে ছায়া রুমাল নাড়তে—সেই ছোট্ট সাদা দোমড়ানো রুমাল অন্ধকার থেকে ফুলের মতো ছিটকে ছিটকে আসছিল। মৃণালকান্তি লিখছে, 'মনে হয় আমাকে দেখানোর উদ্দেশ্যে ছায়া তাহার শাড়ি, তাহার মুখ, তাহার অবয়ব ট্রেনের জানলায় একটি ব্রাকেটে টাঙাইয়া রাখিয়া নিজে কামরার ভিতরে কোথাও সরিয়া গিয়া বসিয়াছে। ট্রেন তাহার আলো ও ছায়া পর্যায়ক্রমে আমার শরীরের উপর হইতে তুলিয়া লইলে, সহসা শূন্য দিগন্তপ্রসারী রেলদ্বয়ের দিকে চাহিয়া সন্দেহ হয় আমাকে কি কোনোদিনই কিছু স্পর্শ করে নাই! খুব তীব্র ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কিংবা কোনো বোধ আমি অনুভব করি নাই! আমি কখনো খুব আনন্দিত বা ক্রুদ্ধ হই নাই কেন! আমি আমার হস্তপদগুলি বিপথগামী করিয়া সহসা নৃত্যে উদ্বাহু হই নাই।'

মৃণালকান্তি আত্মজীবনী আমি যতটুকু পড়েছি তা লক্ষ্য করলে দেখা যায় সে খুব স্বাভাবিক মানুষ ছিল না। মনে আছে সে একদিন গড়ের মাঠে ঘাসের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে চোখে হাত চাপা দিয়ে বলেছিল, 'জানো, রোগা লোকেরা নিজেকে বড্ড বেশি টের পায়! দেখো, খুব শিগগিরই আমার অসুখ হবে।' তার বেনেটোলা

লেন—এর ঘরে আমি মাঝে মাঝে যেতাম। কখনো দেখেছি মৃণালকান্তি ইঁদুর আরশোলা কিংবা পিঁপড়েদের চলাফেরা লক্ষ্য করছে। কখনো তাকে আমার খুব অচেনা মনে হত, কখনো মনে হত সে নিজেকে বড় বেশি টের পাচ্ছে। তার আত্মজীবনীর সর্বশেষ যে—ঘটনাটি আমি পড়েছিলাম তাতে মৃণালকান্তি লিখেছে... 'কত তুচ্ছ মনে হয় যখন ভাবি ঘটনাটা ঘটিয়াছিল একটি আরশোলাকে লইয়া। সিঁড়ির উপর চিৎ হইয়া শুইয়া থাকিয়া আরশোলাটা মরিতেছিল। তাহার প্রবীণ দেহের চারিপাশে তুলনায় বিশাল বিস্তৃত সেই সিঁড়ির উপর তাহার দেহলগ্ন ছায়া ছাড়া আর কিছুই ছিল না।' আরশোলার কথা মৃণালকান্তি অনেকটা লিখেছিল। লিখেছিল, 'মৃত্যু মাত্রই আত্মীয়হীন, স্বজনহীন। মৃত্যুতে কোনো সহগামী নাই। তাহার সেই অর্বাচীন শরীরকে ঘিরিয়া মুহূর্তের জন্য আমার চোখের সামনে ছায়াপথ ও নীহারিকাপুঞ্জের আর্চ—এর মতো অর্ধবৃত্তাকার ছড়ানো তারাগুলি দুলিয়া গেল কি! মনে হয় তাহার তুচ্ছ মৃত্যুর নিকট আমাদের সম্মিলিত বাঁচিয়া থাকা নগণ্য মাত্র। ভালবাসার, ইচ্ছার, লোভের মাধ্যাকর্ষণ ছাড়িয়া অকস্মাৎ বৈজ্ঞানিক মহৎ শূন্যতার ভিতরে সে অগ্রসর হইতেছিল।' মৃণালকান্তির পাশে রেস্তরাঁর সেই সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ছায়া কথা বলছিল। মৃণালকান্তি লিখছে যে, ছায়া তখনো বলছিল, 'কাল ছাত্রীর মা আমাকে একটা খাম দিল। বাড়িতে গিয়ে খুলে দেখি পঞ্চাশ। আমার কিন্তু চল্লিশ পাওয়ার কথা। ভাবছিলাম...' মৃণালকান্তি লিখছে, 'দেখিতেছিলাম ছায়ার স্যান্ডেল—পরা পা গোড়ালির উপর ভর করিয়া দুলিতেছে। ছায়া কথা বলিতেছে—আমি কি তাহাকে চুপ করিতে বলিব! আমি কি সকলকেই চুপ করিতে বলিব! জানি কথা শেষ করিয়া হাসির বেগে যখন সে ঝুঁকিবে তখন ছায়ার পা আরশোলাটার উপর নামিয়া আসিবে। বলিব কী পা সরাইয়া লও। ভাবিতেছি—আমার কী হইয়াছিল! এত তুচ্ছ কথা বলার অর্থ নাই। বলিলেও ছায়া আমাকে পাগল ভাবিবে। কিন্তু আরশোলাটা অপেক্ষা করিতেছে। কোটি—কোটি আলোকবর্ষ দূর হইতে কোনো কোনো নক্ষত্রের আলো পৃথিবীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছিল—এখনো আসিয়া পৌঁছে নাই—সে সেই দিকে চাহিয়া আছে।' তারপর ছায়া বলছিল, 'বুঝলাম ছাত্রী থার্ড হয়েছে বলে এটি আমার ইনক্রিমেন্ট...' ছায়া হাসতে যাচ্ছিল—সেই হাসির আভাস হাসি আসবার আগেই তার মুখে চোখে খেলে যেতে চকিতে—মৃণালকান্তি লিখছে... 'আমি আমার সর্বস্ব দিয়া বলিতে চাহিলাম—না। সরিয়া দাঁড়াও। আমি দুই হাত বাড়াইয়া সহসা শূন্য বোধ করিয়াছিলাম। সহসা আয়নায় চিড় ধরিবার শব্দ হইল। আমার প্রসারিত হাতে কেন্দ্রবিচ্যুত ছায়া বৃষ্টিতে ভেজা সিঁড়ির ফুটপাথে গড়াইয়া গেল। আমি কি ছায়াকে ধাক্কা দিয়াছিলাম! জানি না।' ভিড় জমে যাওয়ার আগেই আস্তে আস্তে ছায়া উঠে দাঁড়িয়েছিল। কোনো কথাই বলেনি ছায়া, আঙুল তুলে মৃণালকান্তির দিকে স্থাপনও করেনি। সে চলে গিয়েছিল। আর আসেনি। মৃণালকান্তি লিখছে, 'সে আর আসিবে না জানিয়া তাহাকে আমার সেই মুহূর্তে বড় প্রিয় বোধ হইল। আমি তাহাকে চলিয়া যাইতে দেখিলাম।'

# আশ্চর্য প্রদীপ

অনিকেত চাকরি করে একটা আধা—বিদেশি ফার্মে, কেটেকুটে নিয়ে মাসে বেতন পায় সাতশো ছাব্বিশ টাকা। তার মধ্যে বাড়ি ভাড়াতে যায় একশো আশি, দুধ পঞ্চান্ন, ঝি পনেরো। খবরের কাগজ, ইলেকট্রিসিটি, ছেলের ইস্কুলের মাইনে এসব বাদ—সাদ গিয়ে হাতে যা থাকে তা দিয়ে বেঁচে থাকা যায়। তার বউ ঝুমুর আবার একটু বড়লোকের মেয়ে। খুব বড়লোক নয়, তবে কলকাতায় বাড়ি আছে, ওর এক দাদা গাড়িও কিনেছে। ঝুমুর তাই একটু নাক—উঁচু। প্রায়ই বলে—গ্যাসের উনুন কেনো। কিস্তিবন্দিতে একটা ফ্রিজ কেনা যায় না? বাইরের ঘরটায় ভাড়ার টেবিল ফ্যান রেখে মাসে মাসে টাকা গচ্চা যাচ্ছে, একটা পাখা কিনলেই তো হয়।

ঝুমুর এসব বলে ব'লে অনিকেত রাগ করে না। বরঞ্চ তার মনের মধ্যেও ওসব ইচ্ছে হয়। নিজস্ব পাখা, গ্যাসের উনুন, ফ্রিজ এসব আজকাল মধ্যবিত্ত ঘরেও দেখা যায়। তার বন্ধুদেরও অনেকের আছে। একটা তিনশো টাকার ইনক্রিমেন্ট যদি দৈবক্রমে পেয়ে যেত তাহলে বেশ হত। কিন্তু সে আশা নেই। বরং এ বছর নাকি বোনাসও কমে যাবে। মনটা নিশপিশ করে। বড্ড গরিবিয়ানামতে তারা থাকে। অনেকদিন ধরে ভালো জামা—প্যান্টও করায় না সে। কত নতুন ধরনের প্যান্ট—জামার কাপড় বেরিয়েছে গত এক বছর ধরে।

পুরোনো বাড়ি ছেড়ে মাস চারেক হল অনিকেত নতুন বাড়িতে এসেছে বণ্ডেল গেটে। নতুন বাড়ি বলতে কিন্তু বাড়িটা নতুন নয়। বরং বেশ পুরোনো বাড়ি। দেড়খানা একতলার ঘরের জন্য একশো আশি টাকা গুনতে হয়। এর আগে শেয়ালদার কাছে ছিল, দুখানা ঘরের ভাড়া একশো দশ। কিন্তু ছেলেটাকে সাউথের ভালো স্কুলে ভরতি করার পর থেকেই ঝুমুর সাউথে আসার জন্য অস্থির। তাই আরও সত্তর টাকা মাসিক গুনোগার দিয়ে চলে আসতে হয়েছে দক্ষিণে। ছেলের ইস্কুলটাই এখন বড় কথা।

বাড়িটা ভালো লাগে না অনিকেতের। বড্ড অন্ধকার। একটা ঘর নীচের তলায়, আর আধখানা ঘর পেয়েছে গ্যারাজের ওপর। গ্যারাজের ওপরকার ঘরটা বড়ই ছিল, বাড়িওলা দেয়াল তন্মলে সেটাকে দুটুকরো করে বাকি আধখানা ঘরে তার অনেক পুরোনো জিনিসপত্তর ডাঁই করে রেখেছে। তবু এই ঘরটায় কিছু আলোবাতাস আসে। অনিকেত এটাকেই তার বসার ঘর করেছে, যদিও তার বাসায় লোকজন বড় আসে না। অনিকেতও কাউকে ডাকে না। লোকজন এলে ভদ্রতা—টদ্রতা করতে ঝুমুর বড় খুশি হয় না। বউয়ের খুশিটাই তো এখন বড় কথা।

অনিকেত খুব ভাবতে ভালোবাসে। বলতে কি ভাবাটাই হচ্ছে তার সবচেয়ে প্রিয় নেশা। একটা সিনেমা দেখল, কি একটা বই পড়ল, অমনি সিনেমা বা বইয়ের গল্পের সুতো ধরে কত কি চিন্তা তার মাথায় মায়াজাল ছড়িয়ে দেয়। আর সে—সব চিন্তার মধ্যে প্রধান হয়ে দাঁড়ায় একটা চিন্তা—আমার যদি অনেক টাকা থাকত!

অফিস থেকে ফিরে এসে প্রায় সময়েই সে একটু রাতের দিকে এই আধখানা ঘরটায় এসে বসে সিগারেট খায় আর ভাবে। ছুটির দুপুরে এখানেই এসে মেঝেয় পড়ে ঘুমোয়।

গ্রীষ্মকাল পড়ে গেছে। রবিবার। বেলা করে খেয়ে অনিকেত চুপচাপ চলে এল দেড়তলার ঘরখানায়। একবোকা শুয়ে থাকল মেঝেয় শতরঞ্জি পেতে। একটা সিগারেট শেষ হয়েছে, আর একটা ধরাবে কিনা ভাবতে ভাবতে ঘুমের আমেজ চলে এল। ঘুম আসার এই সময়টা বড় ভালো লাগে অনিকেতের। বাস্তবের সঙ্গে স্বপ্ন কেমন গুলিয়ে যায়। এসব ব্যাপারগুলো আছে বলেই মানুষের বেঁচে থাকাটা একরকম সওয়া যায়।

ঘুমঘোরে অনিকেত আবোল—তাবোল আধোচেতনায় অনেক হিজিবিজি দেখছিল। এ সময়ে একটা ঠুনঠুন শব্দে চটকা ভাঙল তার। পাশ ফিরে দেখল, একটা ধেড়ে ইঁদুর একটা বেশ বড়সড় প্রদীপের মতো কী একটা জিনিস টেনে এনেছে মেঝেয়। প্রদীপটা তাদের নয়, অনিকেত জানে। বোধহয়, বাড়িওয়ালার গুদামঘরটা থেকেই এনেছে। 'যাঃ, যাঃ' বলে তাড়া দিতেই ইঁদুরটা প্রদীপ ফেলে পালিয়ে গেল।

অনিকেতের কাছ থেকে খুব দূরেও নয় প্রদীপটা। সে হাত বাড়িয়েই নাগাল পেল। হাতে তুলে নিয়ে দেখল, বেশ ভারী। 'সলিড মেটাল! সোনা—টোনা নয়তো!' বলে হাতলওলা মস্ত প্রদীপটা একটু নাড়াচাড়া করল সে। প্রদীপটায় গায়ে ময়লা পড়েছে বহুদিনের! এটা যে দীর্ঘকাল ব্যবহার হয়নি তা দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু জিনিসটা সুন্দর। এখনো বেচে দিলে পাঁচ—দশ টাকা পাওয়া যাবে। অবশ্য বেচবার কথা এমনিই ভাবল সে। বেচবার প্রশ্নও ওঠে না। অন্যের জিনিস। কিছুক্ষণ প্রদীপটা হাতে নিয়ে শুয়ে রইল সে। হঠাৎ মাথায় ভাবনা এল—আচ্ছা, এটা যদি সেই আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ হত। যদি এটাতে হাত ঘষলেই এখন একটা দৈত্য এসে দাঁড়ায় আর বলে—কি চাও বল, এক্ষুনি এনে দিচ্ছি!

ভাবনা—চিন্তারও একটা শক্তি আছে! অনিকেত উঠে বসল। যদি সত্যিই এ রকম কিছু হয়! যদিও বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এসে এসব বিশ্বাস কোনো কাজের নয়, তবু যদি হত! অ্যাঁ! যদি হত?

প্রদীপটা হাতে নিয়ে আঙুলে একটু ঘষা দেয় সে। একা ঘরেও তার হাসি পাচ্ছিল, আর বোকা—বোকা লাগছিল নিজেকে। জানে তো এসব সত্য নয়। এরকম হয় না তবু সে কয়েকবার প্রদীপটার ভিতর দিকে ডান হাতের বুড়ো আঙুল জোরে বারকয়েক ঘষা দিল।

না, কিছুই ঘটল না। কিন্তু হঠাৎ ভেজানো দরজাটার কড়া খুটখুট করে আস্তে নড়ে উঠল।

ঝুমুর এল নাকি চা নিয়ে? চট করে হাতের ঘড়িটা দেখে নিল অনিকেত। না, ঝুমুর এত তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠে না। মোটে দুটো পঁচিশ।

—কে?

উত্তর নেই।

অনিকেত প্রদীপটা রেখে গিয়ে দরজা খুলে অবাক। খুব লম্বাচওড়া আর খুব দামি পোশাকপরা একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। অন্তত ছ—ফুট তিন—চার ইঞ্চি লম্বা তো হবেই। বিশাল কাঁধ, প্রকাণ্ড বুক, ইয়া চওড়া হাতের কবজি। বিদেশি সিনথেটিক কাপড়ের সাদা স্যুটপরা গলায় টাই, মৃদু একটা ইনটিমেট সেন্টের গন্ধ ছড়াচ্ছে লোকটার গা থেকে। বোধহয় বকসিং বা কুস্তি করে। কিন্তু খুব ফর্সা আর সুপুরুষ, মুখে মৃদু বিনীত একটু হাসি।

অনিকেতকে দেখেই দু—হাত জড়ো করে বলল—আমাকে চিনবেন না। আমি প্রদীপের দৈত্য।

অনিকেত বলল—প্রদীপ দত্ত? প্রদীপ দত্ত! আপনার সঙ্গে কোথাও কি পরিচয়—?

লোকটা মাথা নেড়ে বলল—প্রদীপ দত্ত নয়। প্রদীপের দৈত্য! আপনি এক্ষুনি ওই প্রদীপটা ঘষেছিলেন, তাই না?

স্তম্ভিত অনিকেত মাথা নাড়ল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

লোকটা বলল—তাই আসতে হল। বলুন, এখন আপনার জন্য কী করতে পারি?

যদিও অনিকেত বিশ্বাস করতে পারছিল না লোকটাকে, তবু বলল—ভিতরে আসুন।

প্রকাণ্ড এবং সুপুরুষ লোকটা মাথা নিচু করে ঘরে এল। চারিদিকে চেয়ে বলল—ঘরটা—ভীষণ ছোট আর স্টাফি, এই ঘরে থাকেন কী করে?

—অভ্যেস। তা ছাড়া পাচ্ছিই বা কোথায়?

লোকটা অনিকেতের সোফা সেটে পা ছড়িয়ে বসল, কিন্তু মুখে সেই অতি বিনীত হাসি আর হাবভাবে নম্রতা ছড়িয়ে আছে।

অনিকেত মুখোমুখি বসল, তার সস্তা সিগারেটের প্যাকেটটা লোকটার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল—আমরা গল্পে পড়েছি, আশ্চর্য প্রদীপ ঘষলে তার ভিতর থেকে ধোঁয়ার মতো বিশাল চেহারার দৈত্য বেরিয়ে আসত। এই বড় বড় দাঁত, তালগাছের মতো উঁচু চেহারা!

লোকটা সিগারেট দেখে হাতজোড় করে বলল—ওটা পারব না মিস্টার বোস। এখন থেকে আপনি আমার বস। বসের সামনে ধূমপান করাটা বেয়াদবি।

অনিকেত খুশিই হল। প্যাকেটে গোনাগুনতি ছ—টা সিগারেট আছে, আজ আর কিনবার কথা নয়। একটা ফালতু খরচ হয়ে গেলে অসুবিধে হত। সকালে চায়ের পরের সিগারেটটায় টান পড়ত।

লোকটা বলল হ্যাঁ, যে কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। চেহারার কথা তো! সেই ধোঁয়ার মতো ধড় নিয়ে দেখা দিলে আপনিও খুশি হতেন না, পাঁচজনে চেঁচামেচিও করত। তা ছাড়া ইভোলিউশন বা বিবর্তন বলেও তো একটা কথা আছে। তাই যে—যুগের যেমন দরকার, তেমনি হয়েই আমাকে আসতে হয়। ক্লায়েন্টরা ঘাবড়ে গেলে বা হার্টফেল করলে ফায়দা কি? বলে লোকটা হাঁ করে দাঁতগুলো দেখিয়ে বললেন—এই দু পাশে দুটো মস্ত দাঁত ছিল, সব ছোটো করে ফেলেছি স্ক্রেপ করিয়ে। এ—যুগে ওসব প্রি—হিস্টোরিক দাঁত কি চলে?

অনিকেতের নিজের এখন সিগারেট খাওয়ার কথা নয়। একটু আগেই খেয়েছে। হিসেব করে না চললে —!

লোকটা হেসে বলল—তাই আপনি প্রদীপ ঘষামাত্র আমি প্রদীপ থেকে বেরিয়ে আসিনি, বরং আপনাকে ঘাবড়ে যেতে না দিয়ে খুব ভদ্রভাবে দরজায় নক করেছি।

অনিকেতের বুকটা কাঁপছিল। উত্তেজনায় সিগারেটটা ধরিয়েই বুঝল বেহিসেবি খরচ হয়ে যাচ্ছে। আবার তৎক্ষণাৎ মনে হল—এ লোকটা যদি প্রদীপের দৈত্যই হয়ে থাকে তবে এর কাছে অনায়াসেই তো এক প্যাকেট সিগারেট চাওয়া যায়! একটু ভেবে অনিকেত খুব লাজুক স্বরে বলল—এক প্যাকেট সিগারেট যে এখন কাকে দিয়ে আনাই।

—জাস্ট এ মিনিট। লোকটা টপ করে উঠে দাঁড়িয়ে প্যান্টের পকেট থেকে এক প্যাকেট পাঁচ শো পঞ্চান্নর কিং সাইজ কুড়িটার প্যাকেট আর একটা খুদে গ্যাসলাইটার বের করে সেন্টার টেবিলে রেখে বলল—আমি এটা আগেই আন্দাজ করেছিলাম। ইউ মে নীড এ লট অব সিগারেটস। বলুন, এখন আর কি করতে পারি!

খুবই অবিশ্বাসভরে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটারটা দেখল অনিকেত। তার বুক কাঁপছে, অসম্ভব নার্ভাস লাগছে, ভয় করছে। তবু লোকটার বিনয় আর ভদ্রতা দেখে তার একটু সাহসও হচ্ছিল আস্তে আস্তে। সে বলল—আমি যা চাই সব দিতে পারবেন?

লোকটা অল্প মাথা নেড়ে বলল—নিশ্চয়ই। যে—কোনো বস্তুগত জিনিসই আমি আপনাকে দিতে পারি। কিন্তু যদি আপনার মন খারাপ লাগে কখনো, বা যদি গানের গলা না থাকা সত্ত্বেও কখনো আপনার সঠিক সুরে গান গাইতে ইচ্ছে করে তাহলে সেসব ক্ষেত্রে আমার কিছু করার নেই। কিন্তু মন ভালো রাখার জন্য আমি আপনাকে সিনেমার টিকিট, সুন্দরী মেয়ে বা ভালো মদ সাপ্লাই দিতে পারি, গানের জন্য তানপুরা, হারমোনিয়াম বা ভালো ওস্তাদ এনে দিতে পারি।

—যদি অসুখ হয়?

—তার জন্য ডাক্তার বা ওষুধ এনে দেওয়ার ভার আমার, কিন্তু অসুখ সারানোর দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব নয়। বস্তুগত সব জিনিসই আপনি আমার কাছ থেকে পাবেন, বাট নাথিং অ্যাবস্ট্রাক্ট অর ম্যাজিক্যাল।

অনিকেত মাথা নেড়ে বলে—বুঝেছি।

লোকটা মিষ্টি হেসে বলল—এ যুগের সঙ্গে আমার ক্ষমতাকেও সীমাবদ্ধ রাখতে হয়েছে।

অনিকেত শ্বাস ফেলে বলল—তাতেই হবে।

লোকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বলল—ধন্যবাদ। এবার বলুন—

অনিকেতের চাইতে লজ্জা করছিল। একটা লোক তাকে মাগনা মাগনা জিনিসপত্র দেবে ভাবতে কেমন লাগে। তাই সে সরাসরি কিছু চাইতে পারল না। গলা খাঁকারি দিয়ে বলল—আমার নাম অনিকেত। এ নামের মানে আপনি কি জানেন?

লোকটা হেসে বলল—আলবাৎ! অনিকেত মানে যার নিকেত বা নিকেতন অর্থাৎ বাড়ি নেই। মানে গৃহহীন।

অনিকেত মৃদু লাজুক হেসে বলে—আমি সার্থকনামা। আমার বাড়ি নেই।

—ইট উইল বি অ্যারেঞ্জড। বলে লোকটা মাথা নেড়ে পকেট থেকে একটা চমৎকার নোটবই আর ডটপেন বের করে বলল—বলুন, কী রকম বাড়ি আপনার দরকার? রিকোয়ারমেন্টসগুলো একটু ডিটেলে বলবেন।

অনিকেত ভীষণ সংকোচের সঙ্গে বলে—ছোটখাটো একটা বাড়ি হলেই হবে। যেমন হোক।

—সংকোচ করবেন না মিস্টার বোস। আমি আপনার যে কোনো হুকুম তামিল করতে বাধ্য। ডোন্ট বি শাই।

অনিকেত একটু ভেবে বলল—দোতলা। পাঁচ—ছ'খানা ঘর। ভালো বাথরুম টাথরুম। দক্ষিণে বারান্দা। যদি একটু বাগান—? বলে থামল।

—হুঁ হুঁ বলুন। ঘরগুলো কত বাই কত?

—মাঝারি। খুব বড় বা ছোট নয়।

—বুঝেছি। ফার্নিচারের কথা কিছু বলবেন?

—ফার্নিচার? হ্যাঁ, ফার্নিচার। ধরুন, ডানলোপিলোর সব চেয়ার, সোফা, বার্মা টিক—এর খাট। মানে, সব মডার্ন জিনিস আর কি! আপনি যেমন ভালো বুঝবেন তেমন! আর আমার স্ত্রী একটা ফ্রিজের কথা প্রায়ই বলেন, আর গ্যাস উনুন।

লোকটা নোটবই বন্ধ করে বলল—বাড়িটা কোন এরিয়ায় হলে আপনার পছন্দ?

—ধরুন, নিউ আলিপুর! না, না, সেখানে বড় নির্জন জায়গা, চাকরেরা দুপুরে বাড়ির গিন্নিকে খুন করে পালানোর কেস কাগজে পড়েছি। তার চেয়ে যোধপুর পার্ক ভালো।

লোকটা মাথা নাড়ল, বলল—ইট উইল বি অ্যারেঞ্জড। ভাববেন না। কাল বেলা এগারোটায় আমি আপনার অফিসে ফোন করব। ততক্ষণে একটা কিছু ব্যবস্থা হবে। আমি আসি তাহলে। বলে লোকটা উঠল।

অনিকেত তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে দিতে বলল—আচ্ছা, আমি আপনাকে কী বলে ডাকব বলুন তো?

লোকটা একটুও না ভেবে হেসে বলল—ইজি। আপনি যে নামে আমাকে প্রথম ডেকেছিলেন সেই নামে ডাকবেন। প্রদীপ দত্ত।

লোকটা চলে গেল। হঠাৎ অনিকেতের মনে হল—কি বোকা আমি! টেলিভিশনের কথাটা বলে দিলাম না! ভেবে পরমুহূর্তেই সে হাসল। ভাবল, দূর! লোকটাকে তো আবার এক্ষুনি ডাকতে পারি। কিন্তু এক্ষুনি আবার ডাকতে লজ্জা করল বলে ডাকল না। কাল তো দেখা হবেই।

প্রদীপটা খুব সাবধানে কাগজে মুড়ে ঘরের বুক শেলফে একটা ডিকসনারিকে সরিয়ে গুঁজে রাখল। তার কেবলই মনে হচ্ছিল, একটা স্বপ্ন। কিন্তু পাঁচশো পঞ্চান্ন নম্বরের প্যাকেট আর লাইটার এখনো পড়ে আছে টেবিলে। সে খুব মেজাজে একটা সিগারেট ধরাল। তারপর ভাবল—এ রকম হা—ভাতের মতো আমি এতকাল বেঁচে ছিলাম কি করে?

না আঁচালে বিশ্বাস নেই। সে ঝুমুরকে কিছু বলল না। কাঁপা বুক আর উত্তেজনা নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। খেতে পারল না, ঘুমও হল না ভালো করে। আজ তার বারবার মনে হচ্ছিল, ঝুমুর দেখতে নিতান্তই সাদামাটা। এত সাধারণ মেয়ে নিয়ে ঘর করায় কোনো মজা নেই।

পরদিন ঠিক বেলা এগারোটায় ফোন এল। প্রদীপ দত্ত বলল—মিস্টার বোস একটা ট্যাক্সি নিয়ে এক্ষুনি চলে আসুন। আমি আপনার জন্য গড়িয়াহাটের পুব দিকের ফুটপাথে বাসস্টপে অপেক্ষা করছি। অফিস থেকে হাফ ছুটি নিন, আর ট্যাক্সি ফেয়ার আমিই দেব।

তাই হল। যথাস্থানে প্রদীপ দত্ত অপেক্ষা করছিল, ট্যাক্সিতে অনিকেতের পাশে মৃদুতে উঠে বসে অতি সুগন্ধী রুমালে ঘাড় মুখ মুছতে বলল—খুব ভালো বাড়ি পেয়েছি, আপনার যদি পছন্দ হয় তো এ সপ্তাহেই নেগোশিয়েশন হয়ে যাবে।

অনিকেত ভ্রূ তুলে বলল—বাড়িটা কি রাতারাতি তৈরি করলেন?

প্রদীপ দত্ত হেসে ফেলে বলল—আরে না, না। মিস্টার বোস, আগের দিনে যেমন হত তেমন কি আজকালও হবে? ফাঁকা জায়গারও তো ওনার আছে। তা ছাড়া রাতারাতি বাড়ি উঠলে সবাই এসে চেপে ধরবে আপনাকে। কর্পোরেশন, ট্যাক্স, সি ই এস সি, কে নয়? এখন যা হবে সব থ্রু প্রপার নেগোশিয়েশনস। আপনাকে আমি তো বিপদে ফেলতে পারি না।

ট্যাক্সি যেখানে এসে থামল সেটা যোধপুর পার্কের চমৎকার একটা চওড়া রাস্তা। বাড়ি দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। সামনে অনেকখানি লন, ফুলের বেড়। অকল্পনীয় সুন্দর নকশার টালি বসানো মেঝে। নীচের তলায় ছ—খানা ঘর, দোতলায় চারখানা। তিনতলায় দুই ঘরের স্টাডি, রুফ গার্ডেন।

প্রদীপ দত্ত বলল—সদ্য তৈরি হয়েছে বাড়িটা। এখনো কেউ থাকে নি। বাড়ির মালিক শেয়ার মার্কেটে জোর মার খেয়ে বাড়ি বিক্রি করতে চাইছে।

একটু লজ্জার সঙ্গে অনিকেত বলে—কত?

—ছ লাখ। ও নিয়ে আপনি ভাববেন না। দ্যাটস মাই হেডেক।

তবু সংকোচ বোধ করে অনিকেত। টিভি সেটটার কথা বলতে লজ্জা করে।

কিন্তু প্রদীপ দত্ত যেন তার মনের কথা টের পেয়েই বলল—টিভি সেট বা মোটরগাড়ির কথা আপনার রিকোয়ারমেন্টসে ছিল না, কিন্তু সেসব অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে। এখন আপনার একটা প্রেজেন্টেবল সোর্স অব ইনকাম আর ট্যাক্স রিটার্নগুলো দেখাতে হবে। সে—সমস্ত নিয়ে অবশ্য আপনাকে ভাবতে হবে না। লীভ এভরিথিং অন মি। আপনি বরং মিসেসকে নিয়ে এসে বাড়িটা দেখিয়ে দিন।

ঝুমুর! ঝুমুরের কথা অনিকেত ভুলেই গিয়েছিল। এখন অবশ্য ঝুমুরের কথা ভাবতেও তার ভালো লাগছিল না। ইদানীং ঝুমুর বড্ড মোটা হয়ে গেছে। ভীষণ রাগীও। তা ছাড়া ঝুমুরের মধ্যে রহস্যও নেই আর।

অনিচ্ছার সঙ্গে অনিকেত বলল—আচ্ছা।

প্রদীপ দত্ত তার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ হাসল, বলল—আর যদি আপনি ইন্টারেস্টেড হন তবে ডিভোর্সের মামলা লড়ার জন্য ভাল উকিলের অ্যারেঞ্জমেন্ট করা যেতে পারে। হাই অ্যালিমনি দিলে মিসেসও খুব ঝামেলা করবেন না। যদি রাজি থাকেন তো সেসব আমিই নেগোশিয়েট করতে পারি।

একটু লাল হল অনিকেত। বুকটা নানা আশা—আকাঙ্ক্ষায় গুরগুর করে পাখির ডাক ডাকছে। মাথা নিচু করে সে বলল—ত নয়। ঝুমুরও থাক। ছেলেটাকে ছেড়ে থাকতে পারি না। তবে অন্য মেয়ে—

প্রদীপ দত্ত হঠাৎ গলা নিচু করে বলল—কীরকম মেয়েছেলে চান?

অনিকেত রুমালে মুখ ঢেকে, লাল হয়ে অনেক কষ্টে তার গোপন ইচ্ছের কথা অস্ফুটে বলল—টিনএজার। সুন্দর লাইভলি।

—ও, কে।

সাতদিনের মধ্যেই জীবন পালটে গেল অনিকেতের।

ঝুমুর বাড়ি দেখে এত অবাক যে ভালো করে কথা পর্যন্ত বলতে পারছে না। টুইন গ্যারাজে দু—দুটো দামি গাড়ি, ঘরে ঘরে ভাবা যায় না এমন সব জিনিস চাকর, ঝি, মালি, সফারে বাড়ি গিজগিজ। পাঁচ—

সাতটা ঘর এয়ারকন্ডিশন করা। এসব কি আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের কাণ্ড নাকি?

কয়েকবারই জিজ্ঞেস করেছে অনিকেতকে—এসব কী গো? কী করে হল?

—হয়েছে থ্রু প্রপার নেগোশিয়েশনস। অনিকেত বলে—সব ট্যাক্স পেইড। চিন্তার কিছু নেই।

এর বেশি কিছু বলে না অনিকেত।

একদিন প্রদীপ দত্ত ফোন করল—মিস্টার বোস, একটু দেরি হয়ে গেল কিছু মনে করবেন না। আপনার রিকোয়ারমেন্টস অনুযায়ী একটি টিনএজার গার্ল পাওয়া গেছে। না, না, চিন্তার কিছু নেই, এসব ব্যাপারের জন্য ক্যামাক স্ট্রিটে একটা ফার্নিশড অ্যাপার্টমেন্ট আপনার নামে কেনা হয়েছে। আজ সন্ধেবেলা চলে আসুন। দিস অ্যাপার্টমেন্ট উইল বি ইওর প্লেজার স্পট। আপনার সফার ঠিকানা জানে।

শুনে অবধি অসম্ভব নার্ভাস লাগছিল অনিকেতের। হৃৎপিণ্ড এত জোরে ধাক্কা দিচ্ছে পাঁজরে যে সেই শব্দ নিজের কানে শুনতে পাচ্ছিল সে!

তবু গেল। তীব্র উত্তেজনা। এতদিনে সে জীবনকে উপভোগ করতে পারছে। এই তো জীবন।

সফার এক আটতলা বাড়ির সামনে নিয়ে এল অনিকেতকে। লিফটে সাততলায় উঠে কলিং বেল টিপতেই দরজা খুলে বিনীত হাসিমুখে প্রদীপ দত্ত বলল—এভিরিথিং সেট। আসুন স্যার।

অ্যাপার্টমেন্টটা তার নিজের বাড়ির তুলনায় তেমন কিছু নয়। তবু এটাও চূড়ান্ত শৌখিন জায়গা। ঘরজোড়া কার্পেট, সোফা সেট, দুর্দান্ত সব আসবাব। ফ্রিজ, টি ভি সবই আছে। আর আছে ছোট্ট একটা বার, তাতে অন্তত পঞ্চাশ ষাট রকমের বিলিতি মদ।

অসামান্য সুন্দরী মেয়েটি বসেছিল একদম ভিতরের দিকে একটা ঘরে। দরজার গা—তালায় চাবি ঢুকিয়ে প্রদীপ দত্ত দরজা খুলতে বলল—মেয়েটা অ্যাগ্রেসিভ, ওয়াচ ইয়োর স্টেপস।

শুনে একটু চমকে যায় অনিকেত।

ঘরে ঢুকে সে আর একবার চমকায়। ঘরে একটা ডিভান, একটা ড্রেসিং টেবিল, দুটো ছোট টুল আর একটা হোয়াট নট ছাড়া বেশি কিছু নেই। এক গোছা রজনিগন্ধা ভাঙা ফুলদানি সহ মেঝেয় ছিটিয়ে পড়ে আছে, জলে ভিজে শপশপ করছে কার্পেট—মোড়া মেঝে। ড্রেসিং টেবিলের আয়না চুরমার, টুলগুলোর পায়া ভাঙা; ডিভানে কালোপাতলা একটা হাউস কোট পরে মেয়েটি বসে আছে। এত সুন্দর মেয়ে অনিকেত জীবনে দেখে নি। যেমন ক্ষীণকটি, তেমনি উন্নত বুক। মুখ কে যেন ছেনি দিয়ে লক্ষ বছর ধরে কেটে তৈরি করেছে। গায়ের রং গোলাপি আলোয় ভরে দিয়েছে ঘর। তার চুল এলোমেলো, দুটো চোখ বাঘিনীর মতো জ্বলছে। অনিকেতের দিকে একবার রক্তজল করা চোখে তাকাল।

তারপর উঠে চকিত পায়ে দৌড়ে এল দরজার দিকে। অনিকেত যেখানে দাঁড়িয়ে ঠিক সেই দিকে। অনিকেত কিছু বুঝবারও সময় পেল না, মেয়েটা প্রচণ্ড নখে হঠাৎ চিরে ফেলতে লাগল তার মুখ। অনিকেত চিৎকার করে উঠল—প্রদীপ দত্ত! প্রদীপ দত্ত!

বন্ধ দরজা খুলে প্রদীপ দত্ত শান্ত পায়ে ঘরে আসে। একটা হাতে মেয়েটাকে তুলে নেয় অনায়াসে। ডিভানে প্রায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অনিকেতকে বলে—আমি ঠিক রিকোয়ারমেন্টস মতো বাছাই করে মেয়েটিকে তুলে এনেছি। কিন্তু আপনার প্রতি ওকে অ্যাট্রাকটেড করে তোলার কোনো উপায় আমার নেই। দ্যাট ইজ ইওর বিজনেস মিস্টার বোস। ট্রাই এগেন।

বলে চলে যায় প্রদীপ দত্ত।

অনিকেতের গাল ছিঁড়ে রক্ত পড়ছে, আগুনের মতো জ্বালা করছে মুখ। মেয়েটা উপুড় হয়ে ডিভানে পড়ে কাঁদছে।

অনিকেতের মাথায় আগুন জ্বলে গেল। হঠাৎ চিতাবাঘের মতো গিয়ে লাফিয়ে পড়ল ডিভানে।

প্রায় আধঘণ্টা গেল ধস্তাধস্তিতে। অনিকেত মেয়েটাকে কিছুতেই বাগে আনতে পারে না। মেয়েটার দুখানা লম্বা হাত, হাতে নখ, দুখানা পায়ে হরিণের গতি, অসম্ভব দম—এসবই বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বার দুই ধরতে

পেরেছিল সে মেয়েটিকে, কিন্তু কিছু করার আগেই ছিটকে বেরিয়ে গেল মেয়েটি। অনিকেত তীব্র পিপাসায় ছটফট করে। এমন তীব্র নারীদেহের তৃষ্ণা সে আগে কখনো টের পায়নি। কিন্তু তার বয়স প্রায় চল্লিশ, শরীর আগের মতো সতেজ নেই, দম কমে এসেছে। সে তাই হাঁফায় জিভ বের করা কুকুরের মতো।

তারপর প্রদীপ দত্ত আসে।

—সরি মিস্টার বোস।

অনিকেত মুখ তুলে তাকায়। তার একটু লজ্জা করে। সে একটু মাথা নেড়ে জানাল, সে পারেনি।

প্রদীপ দত্ত একবার 'হুঁ' বলে একটু ভাবে। তারপর হঠাৎ কোথা থেকে একটা ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জে ওষুধ জাতীয় কিছু নিয়ে আসে। মেয়েটিকে সে অনায়াসে ধরে ফেলে এক হাতে, তারপর ঝাঁকুনি দিয়ে ডিভানে শুইয়ে হাঁটু দিয়ে চেপে ধরে তার পিঠ, তারপর ইঞ্জেকশনের নির্দয় ছুঁচে তার হাতে ওষুধ ঢুকিয়ে দিয়ে অনিকেতকে বলে—এবার যা খুশি করুন।

মেয়েটি আর বাধা দেয় না। নিষ্ক্রিয় পুতুলের মতো শুয়ে থাকে এক ঘোর আচ্ছন্নতায়। অনিকেত তার এতকালের অতৃপ্ত সমস্ত কামনা—বাসনা নিয়ে মেয়েটিকে গ্রহণ করার সময়ে টের পায়, মেয়েটি সম্পূর্ণ কুমারী ছিল।

অনিকেত নির্জীব হয়ে যখন উঠে এল তখন প্রদীপ দত্ত ঘরে আসে। একটু হেসে বলে—ও, কে?

অনিকেত অনেক রাত পর্যন্ত মদ খেল বসে। বারংবার মেয়েটির শরীর আক্রমর করল গিয়ে। কোনোবারই তৃপ্ত হল না। আরও আগুন জ্বলে ওঠে শরীরে। ভোর রাতে সে প্রদীপ দত্তকে ডেকে বলল—আরও মেয়ে। প্রতিদিন নতুন।

প্রদীপ দত্ত মাতা বাঁকিয়ে বলে—ব্যবস্থা হবে মিস্টার বোস।

অনেক কাল থেকে চেপে রাখা বহু ইচ্ছে অনিকেতের চিন্তায় নানা রঙের বর্ণালি সৃষ্টি করত। প্রতিদিন চাকরিতে যাওয়ার সময়ে মনে হত—হায় রে, যদি ছুটি পেতাম অনন্ত! বড়লোকদের পাড়ায় চমৎকার সব বাড়ি দেখলে মনে হত—এরকম বাড়ি যদি আমার হত! সুন্দরী মেয়ে দেখলে ভাবত—এ যদি হত আমার প্রেমিকা! এরকম ইচ্ছে আর ইচ্ছে।

প্রায় সব ইচ্ছেই পূর্ণ হল অনিকেতের। ছুটি, বাড়ি, আর সুন্দরী মেয়েরা। অবশ্য মেয়েরা যে সবাই তার প্রেমিকা হয়েছে তা নয়। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বশীভূত হয়েছে। কলকাতায় অন্তত দশ—বারোখানা অ্যাপার্টমেন্ট কেনা হয়েছে অনিকেতের নামে। সেরা সুন্দরীরা সেখানে থাকে। যোধপুর পার্কের বাড়িতে বড় একটা যাওয়া হয় না অনিকেতের। এইসব অ্যাপার্টমেন্টই তার দিন কাটে। প্রদীপ দত্ত ছায়ার মতো তার সঙ্গে আছে, কোনো গোলমাল হলেই এসে হাজির হয়।

অনিকেত এখন কয়েকটা মস্ত মস্ত প্ল্যান্টের মালিক, বিরাট ব্যবসা তার। অবশ্য সেসব তাকে দেখতে হয় না, প্রদীপ দত্তই সব দেখাশোনা করে। এখন সে দেশের একজন অগ্রগণ্য লোক। অনেকগুলো সংস্থার সভাপতি, চেয়ারম্যান। বিপুল প্রতিপত্তি তার। খবরের কাগজে তার নাম ওঠে। অনিকেত কয়েকবারই ঘুরে এল লন্ডন, নিউইয়র্ক, প্যারিস, টোকিও। গেল হাওয়াই দ্বীপে ফুর্তি করতে, মোনাকোতে গিয়ে জুয়া খেলল, প্যারিসে মহিলা প্রেমে রইল ডুবে। জীবনটা কানায় কানায় ভরে উঠেছে তার, কোনো অভাব নেই। কেবল মনে হয়, তাকে যদি ঈশ্বর আরও একটু কামের ক্ষমতা দিতেন, আরও ক্ষুধা—তৃষ্ণা দিতেন তাহলে বড় ভালো হত। পৃথিবী ভরতি সুন্দরী মেয়ে, কত মহার্ঘ সুস্বাদু খাবার, কত চমৎকার পানীয়। কিন্তু একটামাত্র শরীরে আর কত ভোগ করা যাবে?

খুব ভোরবেলায় অনিকেতকে উঠতে হয়। খাটো প্যান্ট আর গেঞ্জি, শীতকাল হলে পুলওভার পরে গাড়ি করে ময়দানে যায়। ময়দানে অনেকক্ষণ দৌড়োয় সে। ঠিক দৌড় নয়, প্রদীপ দত্ত বলে, জগিং। দৌড়োতে হয় আস্তে আস্তে, অনেকক্ষণ ধরে। সঙ্গে সব সময়ে প্রদীপ দত্ত থাকে। দৌড়ে ফিরে এলে ব্যায়াম শিক্ষক আসে, তারপর যোগব্যায়ামের শিক্ষক। ব্রেকফাস্ট। প্রদীপ দত্ত এই সময়ে অনেক কাগজপত্রে সই করায়। দশটা

বাজতে না বাজতেই লোকজন আসে, কনফারেন্স থাকে, আসে খোশামুদেরা। প্ল্যান্টে যেতে হয় মাঝে মাঝে। টেলিফোনে কথা বলতে হয়। বিকেলে ক্লাব রেস্টুরেন্ট কখনো বা মিটিং থাকে। সন্ধের পর থাকে মেয়েরা, ড্রিংকস, কখনো বা বন্ধুবান্ধব জাতীয় কিছু লোকের সঙ্গে থাকে পার্টি। অবশ্য এসব ফেলে রেখে অনিকেত যে—কোনো সময়ে দেশভ্রমণেও বেরিয়ে পড়তে পারে। ভারতের সব বড় শহর, স্বাস্থ্যনিবাস বা সুন্দর জায়গায় তার বাড়ি আছে। বাড়ি আছে লণ্ডন, নিউইয়র্ক বা টোকিওতেও। কোথাও কোনো অভাব রাখে নি প্রদীপের দৈত্য ওরফে প্রদীপ দত্ত। নিরাপদ এবং নিশ্চিদ্র তার আরাম। যেদিন তার কথা বলতে ইচ্ছে করে না বা কাজ করতে ইচ্ছে করে না সেদিন প্রদীপ দত্তই সব সামলায়, কোথাও আটকায় না।

মাসে চারবার তার শরীরের চেক আপ হয়। ডাক্তাররা রক্তচাপ মাপে, চোখ—দাঁত দেখে, কান—নাক পরীক্ষা করে, রক্তে চিনির পরিমাণ মাপে, ই সি জি হয়, এক্স—রে হয়। কোথাও একটু খুঁত পেলেই সঙ্গে সঙ্গে মেরামত করা হচ্ছে, অনিকেতের জীবন বড় নিশ্চিন্ত।

খুব ভোরে অনিকেত দৌড়াচ্ছে মাঠে। শীতকাল। একটা ভারী কুয়াশা চারদিককে ভূতুড়ে করে রেখেছে। সূর্য উঠতে অনেক দেরি। চারদিক আবছায়ার ঘোর। গায়ে যথেষ্ট মোটা একটা পুলওভার, কান মুখ মাফলারে ঢাকা, পায়ে দৌড়ের জুতো। বেশ লাগছিল অনিকেতের। একটু হাঁফ ধরে আসছিল বটে, কিন্তু সে গতরাতের হ্যাংওভারও হতে পারে।

দু'কদম পিছনে নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করছে প্রদীপ দত্ত। অনিকেত একবার মুখ ঘুরিয়ে তাকে দেখল। হঠাৎ বলল—প্রদীপ দত্ত, আমার বয়স কত হল?

প্রদীপ দত্ত দৌড় বজায় রেখেই বলল—একচল্লিশ বছর তিন মাস তেরো দিন। আজকের দিনটা নিয়ে।

অনিকেত একটু থমকে গিয়ে বলে—চল্লিশ হয়ে গেল এর মধ্যে! কত বললে? একচল্লিশ? এই তো সেদিন আটত্রিশ ছিলাম।

প্রদীপ দত্ত হেসে বলে—ইয়েস স্যার, ম্যাট্রিক সার্টিফিকেট এখনো আপনার চল্লিশ হয়নি। কিন্তু আসল বয়স—

দৌড় থামিয়ে অনিকেত কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বলে—একচল্লিশ ইজ টু মাচ।

—কিছু করার নেই মিস্টার বোস। প্রদীপ দত্ত হতাশভাবে বলে।

আজকাল অনিকেতের মাঝে মাঝে রাগ হয় প্রদীপ দত্তর ওপর। এখন ওকে সে 'তুমি' করে বলে, ধমকায়। ওর কাছে আজকাল কিছু চাইতে আর লজ্জা বোধ করে না অনিকেত। মাঝে মাঝে এমনও ভাবে সে—লোকটা কোনো কাজের নয়। সব দিচ্ছে তবু কোথায় ফাঁকি রাখছে যেন!

অনিকেত বলল—প্রদীপ দত্ত, তোমার বয়স কত?

প্রশ্ন শুনে প্রদীপ দত্ত একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে বলে—আমার বয়স? সে অনেক। আমি ভারচুয়ালি এজলেস।

—তবু বলো।

প্রদীপ দত্ত একটু হেসে বলে—আমি এই পৃথিবীর সমান বয়সি।

—মিথ্যে কথা প্রদীপ দত্ত।

—মাপ করবেন স্যার, আমার জন্ম কবে হয়েছিল আমার তা জানা নেই।

—তোমার কখনো অসুখ করে না? বুড়ো হওয়ার ভয় ধরে না তোমাকে? মৃত্যুচিন্তা হয় না?

প্রদীপ দত্ত বলল—না।

অনিকেত একটা শ্বাস ছাড়ে। তারপর শ্লথ গতিতে আবার দৌড়োয় সে। পিছনে নিঃশব্দ ছায়ার মতো প্রদীপ দত্ত। দৌড়োতে দৌড়োতে অনিকেত হঠাৎ বলে—প্রদীপ দত্ত, আমি হাঁফিয়ে পড়ছি কেন? খুব বেশি দৌড়োইনি আজ, তবু কেন আমার হাঁফ ধরছে?

—একটু বিশ্রাম করুন, ঠিক হয়ে যাবে।
—তুমি হাঁফাওনি?
প্রদীপ দত্ত ম্লান একটু হেসে বলে—না। হাঁফিয়ে পড়লে আমার চলে না।
নিজের মার্সিডিজ বেনজ গাড়িতে ময়দান থেকে ফিরবার সময়েও অনিকেত বার বার জিজ্ঞেস করল—আমি আজ হাঁফিয়ে পড়লাম কেন বলো তো?
প্রদীপ দত্ত গম্ভীর বিনয়ের সঙ্গে বলল—কিছু না। ঠিক হয়ে যাবে।
—কল দি ডকটরস।
ডাক্তাররা এল। আগাপাশতলা পরীক্ষা করল তাকে। না, কিছু হয়নি, হার্ট ঠিক আছে, প্রেসার স্বাভাবিক, রক্তে চিনি নেই, লাংস ভালো।
—তবে? প্রশ্ন করে অনিকেত।
প্রদীপ দত্ত তার কানে কানে আস্তে করে বলে—বয়স! চল্লিশের পর একটু ডিজিনেস আসে। কিছু না। এ বয়সের যে কোনো লোকের চেয়ে আপনার হেলথ অনেক ভালো।
অবহেলার সঙ্গে একবার প্রদীপ দত্তকে দেখে নিয়ে অনিকেত বলে—দেখো, হেলথ যেন আর গড়বড় না করে।
—চেষ্টা করব স্যার। সব রকম ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা হবে।
অনিকেত একটু গম্ভীর হয়ে গেল। আজ কোনো কাজ করল না অনিকেত। কেবল ছাদের বাগানে ঘুরে ঘুরে অজস্র বিরল ফুলের সৌন্দর্য দেখল। তারপর এক সময়ে উত্তেজিত হয়ে ডাকল—প্রদীপ দত্ত! প্রদীপ দত্ত!
প্রদীপ দত্ত দৌড়ে উঠে আসে ছাদে।
অনিকেত একটা বসরাই গোলাপ গাছে শুকনো ফুল দেখিয়ে বলে—এটা কী? এটা এখানে কেন? জানো না আমি মরা ফুল দেখতে পারি না!
—দুঃখিত মিস্টার বোস। এক্ষুনি তুলে ফেলে দিচ্ছি।
প্রদীপ দত্ত ফুলটা তুলতে যাচ্ছিল অনিকেত বাধা দিয়ে বলল—থাক, থাক। তুলো না।
কি কারণে যেন প্রদীপ দত্ত একটু হাসল।
অনিকেত ঘরে ফিরে আয়নায় নিজেকে দেখতে দেখতে আপন মনে বলল—একচল্লিশ! একচল্লিশ!
আয়নায় ছায়া ফেলে প্রদীপ দত্ত কাছে এসে বলল—এমন কিছু নয় স্যার, চল্লিশে যৌবন শুরু।
অনিকেত একটু হেসে বলে—ইফ ফর্টি কামস, ক্যান ফিফটি বি ফার বিহাইন্ড?
কি কারণে যেন প্রদীপ দত্ত আবার একটু হাসল।
কে আমাকে ভালোবাসে?—হঠাৎ এই প্রশ্ন মাঝরাতে চাবুকের মতো তার সমস্ত শরীরের চমকে দিল। ঘুম ভেঙে উঠে বসে অনিকেত। প্রশ্নটাকে অসম্ভব জরুরি বলে মনে হয়। যে মেয়েটি তার বিছানায় শুয়ে আছে সে—ই প্রথম দিন খিমচে দিয়েছিল তার গালে। এখন ভীষণ বাধ্য হয়ে গেছে।
অনিকেত ডাকল—মিলি, মিলি!
সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসল মিলি। গায়ের আবরণে সরাতে সরাতে কটাক্ষ করে হাসল একটু।
অনিকেত মেয়েটির দিকে চেয়ে থাকে। ও কি ভালোবাসে আমাকে?
অনিকেত বলল—মিলি, তুমি একটু গান গাইবে?
—নিশ্চয়ই। কী গান গাইতে হবে?
—যা খুশি। আনন্দের গান গাও, প্রেমের গান।
—মিলি গাইতে লাগল।
অনিকেত মাথা নেড়ে বলে—না, গান নয়। এসো, দুজনে নাচি।

দুজনে নাচল। নাচতে নাচতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল।

—হচ্ছে না। অনিকেত বলে।

—কি?

—কিছু নয়। মিলি, আমাকে একটু জড়িয়ে ধরে থাকো, তোমার শ্বাসে আমার শ্বাস মিশে যাক, আমি তোমাকে কিছুক্ষণ অনুভব করি।

মিলি আশ্লেষে জড়িয়ে ধরল তাকে। নিঝুম হয়ে খানিকক্ষণ অনুভব করে অনিকেত। মিলিকে সে যা করতে বলে তাই করে সে। নইলে প্রদীপ দত্ত আসবে, ভয়ংকর শাস্তি দেবে মিলিকে। অনিকেত মিলির বুকের হৃৎস্পন্দন শুনল। জোরে চলছে হৃৎপিণ্ড। এর হৃৎপিণ্ডে ভয়ের বাস, লোভের আস্তানা।

ঘোর রাতে গাড়ি বের করতে হুকুম দিলেন অনিকেত। প্রদীপ দত্তকে ডাকতে হয় না, সে আপনিই নিঃশব্দে সঙ্গ নেয়। বিভিন্ন পোষা মেয়েমানুষের কাছে ঘুরে বেড়ায় অনিকেত, নিজের বউ আর ছেলের কাছেও যায়। কিন্তু কোথাও যেন কোনো নিশ্চয়তা পায় না। সবাই বাধ্য, বিনীত, ভদ্র, হুকুমমাত্র যাকে দিয়ে যা খুশি করাতে পারে অনিকেত। তবু কেমন এক অনিশ্চয়তা। এই গভীর রাতে সে সকলের কাছে গিয়ে গিয়ে ঘুম ভাঙাল। কেউ বিরক্ত হল না, বরং তটস্থ হল, আপ্যায়ন করল, ভালোবাসা প্রকাশ করল। এমন কি ঝুমুরও।

—আশ্চর্য? অনিকেত গাড়িতে ফিরে আসবার সময়ে বলল।

একটু যেন লজ্জিত হয়ে প্রদীপ দত্ত বলে—আপনি যেমন চেয়েছিলেন ঠিক তেমনিই সব অ্যারেঞ্জমেন্ট করা আছে মিস্টার বোস। আপনি কোনো ত্রুটি পাচ্ছেন না তো?

—পাচ্ছি প্রদীপ দত্ত। আমি একটা মানুষকেও অর্জন করতে পারিনি।

—কেউ বেয়াদবি করেনি তো স্যার? প্রদীপ দত্ত উদ্বিগ্ন হয়ে বলে।

—না। আর সেইটেই তো বেয়াদবি। এরা কেউ বেয়াদবি করছে না, রাগ করছে না আমার ওপর, অভিমান করছে না, অবাধ্য হচ্ছে না। যে আমাকে ভালোবাসবে সে তো কখনো কখনো একটু অবাধ্য হবে, অভিমানটান করবে প্রদীপ দত্ত? তাই না?

প্রদীপ দত্ত গম্ভীর হয়ে বলে—ওসব অ্যাবস্ট্র্যাক্ট জিনিস মিস্টার বোস। আমার এক্তিয়ারের বাইরে।

তুমি কোনো কাজের নও। অনিকেত রেগে গিয়ে বলে।

প্রদীপ দত্ত একটু গুম হয়ে থেকে বলে—ঠিক আছে স্যার, আপনি যেমন চাইছেন ওরা এবার থেকে ঠিক সে—রকমই বিহেভ করবে। আপনার রিকোয়্যারমেন্টসগুলো বলুন, আমি টুকে রাখছি—বলে প্রদীপ দত্ত তার নোটবই বের করে গাড়ির ড্যাশ বোর্ডের আলোয় লিখতে লিখতে আপন মনে বলে—রাগ, অভিমান, মাঝে মাঝে একটু—আধটু নন—অ্যাগ্রেসিভ অবাধ্যতা—আর কী বললেন স্যার?

অনিকেত হাত বাড়িয়ে নোটবইটা কেড়ে নিয়ে বলে—চুপ করো। আমি কিছু চাইছি না। আমি এখন একটু একা থাকতে চাই। আমার যদি কোনো ফাঁকা অ্যাপার্টমেন্ট থাকে তো সেখানে আমাকে নিয়ে চলো।

—আছে স্যার। একটা দশতলা অ্যাপার্টমেন্ট হাউস আপনার অর্ডার মতো কেনা হয়েছিল, তাতে কোনো ভাড়াটে নেই। আপনার আদেশ মতো বাড়িটার চল্লিশটা ফার্নিশড ফ্ল্যাট ফাঁকা পড়ে আছে।

দশতলার ফাঁকা কিন্তু চমৎকার সাজানো অ্যাপার্টমেন্টে স্বয়ংক্রিয় লিফটে উঠে এল অনিকেত। ক্লান্তভাবে একটা কৌচে বসে রইল নিঝুম হয়ে।

কেউ কোথাও নেই, শুধু কপাটের আড়ালে উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করছে প্রদীপ দত্ত।

—প্রদীপ দত্ত! অনিকেত ডাকে।

—বলুন স্যার। নিঃশব্দে সুপুরুষ দৈত্য ঘরে এসে দাঁড়ায়।

—ভগবান বলে কে একজন আছে না? আমি তার সঙ্গে আধ ঘণ্টার ইন্টারভিউ চাই। অ্যারেঞ্জ করো।

প্রদীপ দৈত্য ভ্রূ কুঁচকে চিন্তা করে বলে—অ্যাবস্ট্র্যাকশন। আমার এরিয়া নয় মিস্টার বোস। তবে—এই বলে প্রদীপ দত্ত পকেট থেকে একটা ট্যাবলেটের স্ট্রিপ বের করে বলে—একটা ট্যাবলেট খেয়ে নিন, নিজেকেই ভগবান বলে মনে হবে। সত্যি কথা বলতে কি আপনার ক্ষমতা ঈশ্বরের চেয়ে খুব কম নয়।

ট্যাবলেটটা হাতে নিয়ে চেয়ে থাকে অনিকেত, বলে—আর যখন এর নেশা কেটে যাবে, তখন?

—দেয়ার উইল বি মোর ট্যাবলেটস।

ট্যাবলেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অনিকেত বলে—প্রদীপ দত্ত, তুমি অপদার্থ। তুমি আমার বয়স হওয়া ঠেকাতে পারোনি, তুমি এমন একটাও মানুষ বা মেয়েমানুষ যোগাড় করতে পারোনি যে আমাকে সত্যিকারের ভালোবাসে, তুমি ভগবানের সঙ্গে মাত্র আধ ঘণ্টার একটা অ্যায়েন্টেমেন্ট অ্যারেঞ্জ করতে পারোনি। নিজের কান ধরে দাঁড়াও প্রদীপ দত্ত।

প্রদীপ দত্ত দু—হাতে নিজের কান ধরে বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

অনিকেত বলল—মানুষের সব চাহিদাই কেন তুমি পূরণ করতে পারো না? তোমার জানা উচিত এত ভোগ্য সামগ্রী উপভোগ করতে হলে মানুষের অনেক আয়ু চাই, অনেক ভালোবাসা চাই, ফর সিকিউরিটি তার একজন ভগবানও দরকার। তুমি সে সব দিকে পারোনি। কান ধরে ওঠবোস কর প্রদীপ দত্ত।

প্রদীপ দত্ত ওঠবোস করতে লাগল। করতেই লাগল। হাঁফিয়ে গেল না, ঘামল না, কোনো কষ্টের শব্দ করল না। ওর অনন্ত ওঠবোস দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে অনিকেত বলল—তোমার ক্লান্তি নেই? বিশ্রাম নেই?

—না।

—মৃত্যু?

—তাও নেই।

হা—হা করে হাসল, অনিকেত, বলল—মিথ্যেবাদী। ঠিক আছে, ওই জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়ো প্রদীপ দত্ত। আমি তোমার শেষ দেখতে চাই।

প্রদীপ দত্ত স্মার্ট পদক্ষেপে গিয়ে জানলার পাল্লা খুলে বিনা ভূমিকায় লাফ দিল নীচে। জানলার কাছে গিয়ে অনিকেত উঁকি মেরে দেখল ফুটপাথে পড়ে আছে প্রদীপ দত্ত।

হা—হা করে হাসল অনিকেত। ঘরের মধ্যে ফিরে এসে হুইস্কি নিয়ে বসল। সামান্য নেশা হল তার। একটু ভুলভাল হচ্ছিল। সেই বিভ্রমেই হঠাৎ ডাকল—প্রদীপ দত্ত! তারপর নিজের মনেই বলল—না, না, ও তো মরে গেছে।

কিন্তু নিঃশব্দে, প্রদীপ দত্ত ঘরে এসে বিনীত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বলল—ইয়েস মিস্টার বোস।

তুমি মরোনি? অনিকেত অবাক।

প্রদীপ দত্ত মৃদু হেসে বলে—আই অ্যাম আনপেরিশেবল স্যার। ডেথলেস।

ক্লান্ত অনিকেত বলল—আজ আমার বয়স কত হল বলো তো?

প্রদীপ দত্ত বলল—একচল্লিশ বছর চার মাস দুদিন। আজকের দিনটা নিয়ে।

চমকে উঠে অনিকেত বলে—এই তো সেদিন বললে তিন মাস তেরো দিন। এর মধ্যে আরও উনিশ দিন বেড়ে গেল?

—উনিশটা দিন এর মধ্যে কেটে গেছে মিস্টার বোস।

—তোমার কাটেনি? তোমার বাড়েনি উনিশ দিনের বয়স?

—না। আমার কেন বাড়বে প্রদীপ দত্ত?

—প্রকৃতির নিয়ম স্যার।

আচমকা হুইস্কির গ্লাসটা ছুঁড়ে মারে অনিকেত। প্রদীপ দত্তর মুখে গিয়ে সেটা ফটাস করে ভাঙে। কাচ ছড়িয়ে পড়ে চারধারে। একটুও কাটে না বা লাগে না ওর, রক্তপাত হয় না। প্রদীপ দত্ত নিচু হয়ে কাঁচের

টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিতে থাকে।

বিপজ্জনক নিচু স্বরে অনিকেত বলে—স্কাউন্ড্রেল! ইউ স্কাউন্ড্রেল! বলে তড়িতে উঠে গিয়ে টেবিল থেকে কাগজকাটা একটা ছুরি তুলে নেয়। তারপর চকিতে এগিয়ে গিয়ে বারংবার প্রদীপ দত্তর পিঠে, বুকে পেটে ছুরিটা বসিয়ে দিতে থাকে।

বিনীতভাবে প্রদীপ দত্ত অপেক্ষা করে। অনিকেত ক্লান্ত হয়ে গেলে প্রদীপ দত্ত ছুরিটা নিয়ে টেবিলে রেখে দেয় ফের। নরম স্বরে বলে—একটু ঘুমিয়ে থাকুন। টেক এভরিথিং ইজি।

ক্লান্ত অনিকেত বলে—চলে যাও প্রদীপ দত্ত, চিরদিনের মতো চলে যাও। আমি আর তোমাকে চাই না।

প্রদীপ দত্ত কেমন যেন একটু হাসে। অত্যন্ত ভদ্র গলায় বলে—গুড নাইট স্যার, টিল ইউ কল মি এগেন।

—আই ওনট কল ইউ বাস্টার্ড। গো অ্যাওয়ে। ডাই।

কিন্তু পরদিনই ঘুম ভেঙে অনিকেত ডাকে—প্রদীপ দত্ত! প্রদীপ দত্ত!

প্রদীপ দত্ত সামনে আসে। খুব যত্নে তাকে বিছানা থেকে তোলে। বাথুরমে পৌঁছে দেয়। বলে সব ঠিক আছে স্যার।

বাথরুমের শার্সি দিয়ে অনিকেত দেখতে পায় নীচে একটা রেইন ট্রি থেকে হলুদ পাতা ঝরে যাচ্ছে। দৃশ্যটা সহ্য হয় না তার। একটা নতুন টুথপেস্টের টিউব আয়নার সামনে থেকে তুলে নেয় অনিকেত। নতুন টিউব, পেস্টে ভরা। অনিকেত কিছু না ভেবেই টিউবটা টিপে ধরে। সাপের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে পেস্ট বেরোতে থাকে। সারা বাথরুমের মেঝে জুড়ে অনিকেত পেস্ট ছড়ায়। পেস্ট দিয়েই সে মেঝেয় লেখে—আমি চাই অনন্ত আয়ু, আমি চাই অনন্ত ভালোবাসা, হায়—পেস্ট ফুরিয়ে যায় এখানে। টিউবটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় অনিকেত। চিৎকার করে ডাকে প্রদীপ দত্ত, কেন টিউবের পেস্ট ফুরোবে? আমি এমন টিউব চাই যার পেস্ট কখনো ফুরোবে না। যাও, নিয়ে এসো।

প্রদীপ দত্ত অনেকগুলো জায়ান্ট সাইজ টিউব এনে দেয়, কিন্তু সেগুলো আর ফিরেও দেখে না অনিকেত। সে বলে—প্রদীপ দত্ত তুমি কবে আমাকে ছেড়ে যাবে?

—আমি ছেড়ে যেতে পারি না মিস্টার বোস। আমাকে আপনার মৃত্যু পর্যন্ত থাকতে হবে।

—আমার মৃত্যু কবে হবে প্রদীপ দত্ত?

—যথাসময়ে। অপেক্ষা করুন।

—কিন্তু আমি তোমাকে সহ্য করতে পারছি না। কোন নশ্বর মানুষ সহ্য করতে পারে এক মৃত্যুহীন মানুষকে? বলো প্রদীপ দত্ত, পারে কেউ?

—দুঃখিত মিস্টার বোস। কিন্তু আমি তো আপনাকে খুশি করার প্রাণপণ চেষ্টা করছি।

অনিকেত খুব ক্লান্তস্বরে বলল—আমার আর কিছু চাওয়ার নেই। তুমি আমাকে আর খুশি করতে পারো না। আমাকে অনন্ত আয়ু দাও প্রদীপ দত্ত, অনন্ত কাম দাও, অনন্ত ক্ষুধা আর তৃষ্ণা দাও! একটা নশ্বর শরীর আর এক জীবনের আয়ু নিয়ে কী করে পৃথিবীতে ভোগ করা যাবে প্রদীপ দত্ত! দয়া করো।

চিন্তিত প্রদীপ দত্ত মৃদুস্বরে বলে—অ্যাবস্ট্রাক্ট মিস্টার বোস, আমি দুঃখিত।

—তবে এই মুহূর্তে আমাকে মৃত্যু দাও প্রদীপ দত্ত। আমি মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে পারব না। যাও, আমার জন্য যন্ত্রণাহীন মৃত্যুর ব্যবস্থা করো।

প্রদীপ দত্ত কেমন একরকম হাসে। বলে—মৃত্যু? মৃত্যুও অ্যাবস্ট্রাক্ট মিস্টার বোস। আমি তা দিতে পারি না। যথাসময়ে তা ঘটবে। আপনাকে অপেক্ষা করতেই হবে।

হতাশায় ভরে যায় অনিকেত। বলে—তবে যা দিয়েছো তা সব ফিরিয়ে নাও প্রদীপ দত্ত।

—লাভ কী? আপনি ইচ্ছে করলেই আবার সব ফিরে পাবেন।

—প্রদীপটা যদি নষ্ট করে ফেলি প্রদীপ দত্ত?

—ওটা নষ্ট হওয়ার নয়। প্রদীপটা আনপেরিশেবল, শক রেজিস্ট্যান্ট, করোশন প্রুভড, ফায়ার রেজিস্ট্যান্ট, অ্যান্ড গ্যারান্টিড ফর ইটারনিটি।

—যদি কাউকে দিয়ে দিই?

প্রদীপ দত্ত একটু হেসে বলে—লাভ নেই মিস্টার বোস। তখন প্রদীপটার জন্য শোকে আপনি পাগল হয়ে যাবেন। যতক্ষণ এটা আপনার কাছে আছে ততক্ষণ আপনি বুঝতে পারছেন না প্রদীপকে আপনার কী ভীষণ দরকার!

ঠিক। খুবই ঠিক কথা। অনিকেত বুঝল। বুঝে একটু শিউরে উঠল ভয়ে, অনিশ্চয়তায়। বলল—না, না, কাউকে দেব না।

—সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

বলে কেমন একটু হাসল প্রদীপ দত্ত।

হাসিটা চেয়ে দেখল অনিকেত। তারপর হঠাৎ সেও ঠিক ওই রকম একটু হাসল। খুব বুঝদারের হাসি। হাসতে হাসতে কখন হঠাৎ চোখে জল এসে গেল তার।

প্রদীপের দৈত্য বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে রইল সামনে। পরবর্তী আদেশের অপেক্ষায়।

# মনসা মঙ্গল

তা তোর বউ কলকাতায় কাজ করে, কিন্তু তোর ট্যাঁকে পয়সা নেই কেন? তুমিও যেমন গোরাংদাদা, বউয়ের পয়সায় খেয়ে কি নরকে পচব নাকি? কোন শাস্তরে ও কথা পেলি? বউয়ের পয়সায় খেলে পাপ হয়, তা জন্মে শুনিনি বাবা।

আহা, পুরুষ মানুষ বলে একটা ব্যাপারও তো আছে, নাকি?

মাগ—ভাতারের সম্পর্ক তো আর উলটে যায়নি।

মদনার দোকানের বাইরে কাঠের পায়ার ওপর বাঁশের কঞ্চি দিয়ে বসবার একটা বেঞ্চি মতো হয়েছে। দিনমানে লোকজন বসে। রাতে মদনার চাকর নেপাল বস্তা পেতে শোয়। সেই বেঞ্চিখানায় এখন এই বেলা দশটায় গৌরাঙ্গ পাল বসে বিড়ি ধরিয়েছে। সামনেই নদীর ঘাট। হাটবারের ব্যাপারিরা নৌকো থেকে কাদায় নেমে গুটি গুটি উঠে আসছে মালপত্তর নিয়ে। শরৎকাল হলেও রোদের তেজ আছে মন্দ নয়। তবে নদীর ওপর দিয়ে জল—ছোঁওয়া বাতাসও আসছে তেড়ে। রোদ উড়িয়ে নিচ্ছে।

গৌরাঙ্গ পাল বিজ্ঞের মতো বলে, আজকাল তো শুনি মেয়েছেলেদেরই বাড়বাড়ন্ত। ব্যাটাছেলেদের লেজ এখন দু—পায়ের ফাঁকে সেঁদিয়ে আছে।

শ্রীপতি বলল, না না, অতটা নয়। তবে মেয়েছেলেদের গাড়ু গামছার মতো ব্যবহার করাটাও ঠিক নয় কিনা। দিনকাল পালটাচ্ছে কিনা বলো! ছ টাকা আট টাকা কিলো বেগুন জন্মে দেখেছ? তা বেগুনও যদি জাতে উঠতে পারে তাহলে মেয়েছেলের আর কী দোষ?

মদনার দোকানে আজ বেশ ভিড়। এই একটা হাটবারেই সে সারা সপ্তাহেরটা কামিয়ে নেয়। তমিজ মিয়া খেয়া নৌকোর মাঝি। আধবুড়ো রোগাটে পাকানো চেহারা। পায়ের কাদা ঝেড়ে এসে বেঞ্চের একধারে বসে পা থেকে তিনটে জোঁক ছাড়িয়ে বলল, নাওটা বড় লজঝড়ে হয়ে গেছে হে। জল ছেঁচতে দিয়ে এলুম। গাবের আঠা দিয়ে তাপ্পি দেওয়া চলবে না, তক্তা পালটাতে হবে।

গৌরাঙ্গ বলে, তা পালটাও না কেন? ডুবিয়ে মারবে নাকি মানুষকে? কাঠের দাম কোথায় উঠেছে জানো? জামাল মিস্তিরি চারশো টাকা হাঁকছে। এদিকে দু টাকা ভাড়া আড়াই টাকায় তুললেই লোকে বাপ চোদ্দো পুরুষ উদ্ধার করে, শাপশাপান্ত দেয়।

তমিজ মিয়ার পায়ে সাদা হাজা। নখের রং নীলচে। চুল—দাড়ি কটাসে রং ধরেছে, এবার পাকবে। গা থেকে আঁশটে গন্ধ ছড়াচ্ছে খুব। মদনার দোকান থেকে এক বান্ডিল লাল সুতোর বিড়ি আর একটা দেশলাই নিয়ে এসে ফের বসল। মদনার লাল সুতোর বিড়িটা বড্ড সরেস। যেমন মিঠে, তেমনি কড়া। বিড়ির ধোঁয়ায় বাতাসটা ম' ম' করে উঠল।

গৌরাঙ্গ বলল, তা হ্যাঁ রে শ্রীপতি, মনসা তাহলে বেশ সুখেই আছে! কী বলিস!

শ্রীপতি ভারী আহ্লাদের গলায় বলে, মনসা কাকে বলছ? সে কি আর মনসা আছে নাকি? তার নতুন নাম হয়েছে, পিয়ালি। বলিস কী! বাপ দাদার দেওয়া নাম, ও কি পালটায়!

তা কী করবে বলো! যেখানকার যা দস্তুর। গিন্নিমা সাফ বলে দিয়েছেন, ওসব মনসা ফনসা চলবে না। নামের মধ্যে নাকি ফোঁসফোঁসানি আছে।

তা পিয়ালি আবার কেমনধারা নাম? ঠাকুরদেবতার গন্ধই নেই। শহুরে নাম ওরকমই হয়। ও তুমি বুঝবে না। তবে আছে ভালো। হাতে পায়ে হাজা, ফাটা কিচ্ছু নেই। তেল গড়াচ্ছে শরীরে। বটে!

সব সময়ে পায়ে হাওয়াই চটি। বছরে চার পাঁচখানা শাড়ি। গত মাসেই গিয়ে দেখা করে এলাম তো। দিব্যি আছে।

তা খাতির টাতির করল তোকে?

তা আর করবে না? খুব করল। দুঃখু করছিল, কত হাড়গিলের মতো চেহারা হয়েছে তোমার। পেট পুরে খাও না নাকি? বাড়িঘর কেমন দেখলি?

উরে বাবা! পেল্লায় দোতলা বাড়ি। বাগান আছে, গাড়ি আছে, রান্নার ঠাকুর, ঠিকে ঝি সব আছে।

খাওয়াল টাওয়াল?

তা আর খাওয়াবে না! গরম রুটি, আলুর ছেঁচকি।

দূর বোকা! ও কি একটা খাওয়া হল? ভাত খাওয়াল না?

নাঃ! আমিই বললুম, এসবের দরকার নেই।

চেয়ারটেয়ারে বসলি নাকি?

না গো! ওপরে ওঠা নাকি বারণ। নীচে সিঁড়িঘরে বসেই কথা হল দু—চারটে। তবে তার তো দম ফেলার সময় নেই। মেশিনে নাকি কাপড় কাচছিল, এসে কোনোরকমে দেখা করে গেল আর কি! গিন্নিমার সঙ্গে আলাপ করে এলি না! কেমন বাড়িতে বউটাকে কাজে লাগিয়ে এলি দেখতে হয় তো!

শ্রীপতি দুঃখের সঙ্গে মাথা নেড়ে বলে, সেখানে একটু বাধা আছে গো, গোরাংদা। গিন্নিমা বিয়ে—করা মেয়ে কাজে নেবে না। বলে নাকি, বিয়ে করা ছুঁড়িদের বরের ওপর টান থাকে, কেবল দেশে যেতে চায়। আর বরের হাত দিয়ে মাল পাচার করতে সুবিধে পায়।

বলিস কী রে পাগল! তোর বউ কি সিঁথের সিঁদুর মুছে ফেলে কাজে লেগেছে নাকি?

উপায় কী? আজকাল নাকি সিঁদুরের রেওয়াজও নেই তেমন। গৌরাঙ্গ পাল ভারী গম্ভীর হয়ে বলে, কাজটা কি ভালো হল রে শ্রীপতি? সধবা সিঁদুর মুছে ফেলল, এ তো ভারী খারাপ লক্ষণ। আচ্ছা, সিঁদুর মুছে ফেলেছে বলে তো আমি আর মরে যাইনি! গেছি বলো! ওসব আজকাল কেউ মানেটানে না। চার বছর তো হল।

মনসার এখন বয়স কত?

পনেরো বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল। তা এখন উনিশ কুড়ি তো হিসেবে দাঁড়ায়।

কাঁচা বয়স। ঘরও তো করলি না। বিয়ের পর বছর ঘুরতে না ঘুরতেই কাজে লাগিয়ে দিলি। তোকে এখন দেখে কে?

ইচ্ছে আমারও তেমন ছিল না, বুঝলে! বিশ্বেসদা এনে এমন ধরে পড়ল, সাত শো টাকা মাইনে শুনে বউটাও নাচতে লাগল যে; আর আমিও কাত হয়ে পড়লাম।

তাতে তোর সুবিধেটা হল কী, বল। বউ টাকা পায়, ভালো খায় দায়, গায়ে গত্তি লাগছে। আর তুই যে ভাঙা ঘরে চ্যাটাইয়ে শুয়ে ঠ্যাং নাচাচ্ছিস! তোকে দেখে কে? ভাইয়েরা তো পাঁচ কাঠা বাস্তুজমি ঠেকিয়ে আলাদা করে দিয়েছে, চাষের জমি কতটা আছে তোর?

বিঘে দশেক হবে বোধহয়। কী হবে বলো দাদা, একাবোকা লোক আমি, চলে যায়।

চারটে ভ্যান রিকশা ছিল তোর। সেগুলো কী করলি?

বেচে দিয়েছি। মা বাপ নেই, বউ চাকরি করতে গেছে, কার জন্য আর খাটব পিটব, বলো। দু—বেলা দু—মুঠো জুটে তো যাচ্ছে। সেই ঢের।

তুই বরাবরই একটু বৈরাগী গোছের বটে, কিন্তু সংসারেরও একটা ধর্ম আছে তো। বউ যদি আসতে চায় তখন কী করবি?

সে কি আর কলকাতা ছেড়ে এই অখদ্দে জায়গায় আসতে চাইবে? তুমিও যেমন।

তবে কি চিরটা কাল পরের বাড়ির খেদমত খাটাবি নাকি? হ্যাঁ রে, তোর বউয়ের ওপর টান আছে তো! নাকি অন্য কোনো মেয়েছেলের দিকে ঝুঁকে পড়েছিস?

জিব কেটে শ্রীপতি বলে, কী যে বলো দাদা! বউয়ের ওপর বড্ড টান বলেই না কেমন বাউন্ডুলে হয়ে গেলুম।

তোর ওপর বউটার টান বুঝতে পারিস?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শ্রীপতি বলে, একটু আধটু কি নেই? নতুন নতুন তো চোখে হারাত। মাঝেমাঝে বলত, তুমি এত ভালো কেন গো? সেই কথাটা এখনও কানে বাজে।

গৌরাঙ্গ পাল নদীর বাতাস আড়াল করে ফের একটা বিড়ি ধরিয়ে বলল, সে কথা তো আমরাও বলি। কিন্তু ভালো হয়ে ম্যান্দামারা থাকা কি ভালো? যাই রে, আজ সুপুরি কটা এই হাটেই বেচে দিতে হবে।

বেঞ্চির ওপর কাত হয়ে শুয়ে তমিজ মিয়া ঘুমিয়ে পড়েছে। খাটিয়ে পিটিয়ে লোক, শুলেই ঘুমোয়, ঘাট থেকে উঠে এসে তমিজের ছোট ছেলে আকবর হাঁক দিচ্ছে, আব্বাজানও, নাও ছাড়ব?

শ্রীপতিই ঠেলে তুলল তমিজ মিয়াকে, ও বড় ভাই, উঠে পড়ো। তমিজ উঠল। বলল, শালা ফুটো নাওয়ের জন্য হাটবারের একটা ক্ষেপ নষ্ট। হ্যাঁ রে শ্রীপতি, তোর একটা নাও ছিল না! বড়সড় একখানা।

আছে। সনাতন মাল চালান দেয় তাতে।

পয়সা দেয়?

উদাস গলায় শ্রীপতি বলে, মাঝে মধ্যে দেয়। আবার দেয়ও না।

এই বয়সে তোর যে কী হল, বাপ!

শ্রীপতি একা বসে হাটুরে লোকজন দেখতে লাগল। সে নিজেও বুঝতে পারে, সংসার থেকে সে বড় আলগা হয়ে গেছে। চার বছরের মধ্যে সে বার পাঁচেক মনসার সঙ্গে দেখা করতে গেছে। যাওয়ার হ্যাপা বড় কম নয়। দুটো নদী পেরিয়ে দুবার বাস বদলে সেই সল্ট লেক। পাক্কা চার পাঁচ ঘণ্টা। তার ওপর গিয়েও তো স্বস্তি নেই। বড়লোকের বাড়ি, মনসা সেখানে পাঁচটা কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। খবর পাঠালে নেমে আসে বটে, কিন্তু ভারী ব্যস্ত সমস্ত ভাব। দু—চারটে কথা হতে না হতেই বলে, তুমি একটু বোসো, আমি কাজ সেরে আসছি। দিনে দিনে মনসার চেহারা খুলেছে, পোশাকে আশাকে পালিশ। কিন্তু কেমন যেন তাদের গাঁ ঘরের মেয়ে বলে আর মনে হয় না। মনসা যে আর ফেরত আসবে না, এ কথা ভাবতে তার বড় কষ্ট হয়।

উঠে গুটি গুটি গিয়ে সে নদীর ধারটায় দাঁড়ায়। বড় উদাস বাতাস বইছে। সে আনমনে দূরের দিকে চেয়ে রইল। মনসাবালার সঙ্গে বছরটাক ঘর করেছিল সে। তারই নানা কথা মনে পড়ে। আর ফাঁকাও লাগে খুব। কিছুতেই মন বসতে চায় না।

কোরাকাঠির শচীমাসিমা মঙ্গলচণ্ডীর পুজোয় ডেকে পাঠিয়েছিল তাকে। তাদের অবস্থা ভালো। মেসো তেজেন হালদারের ক্যানিংয়ে মস্ত দোকান। লোহার বালতি, ড্রাম, শেকল, কাঁটা, কোদাল, শাবল, লাঙলের ফাল, দড়িদড়া, কী নেই দোকানে! টাকায় ভাসাভাসি।

মায়ের সঙ্গে চেহারার মিল থাকলে কী হবে, শচীমাসি খুব দাপটের লোক। এক সময়ে তারা সব ভাইবোন মাসির দাবড়ানিতে চলত। মনসাবালার সঙ্গে শ্রীপতির বিয়েটাও ঠিক করেছিল মাসি। সেদিন জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁ রে, মনসা তোকে টাকা—পয়সা পাঠায় না? শ্রীপতি মাথা নেড়ে বলল, না, মাসি। আমাকে পাঠাবে কেন, তার কষ্টের রোজগার। আর আমারও তো দরকার নেই।

সে কথা হচ্ছে না। এখানে মনসার মা—বাপও তো কষ্টে আছে।

শুনলুম তাদের সঙ্গেও সম্পর্ক নেই। টাকা দূরে থাক, একটা চিঠিও দেয় না। তাহলে টাকাগুলো নিয়ে করে কী?

জমাচ্ছে বোধহয়। তার টাকা সে যা খুশি করুক। তা নিয়ে কথা ওঠে কেন? ওমা! ছেলের কথা শোনো। মাস গেলে সাতশো টাকা রোজগার, ক—বছরে তো কয়েক হাজার টাকা দাঁড়ায়। বউয়ের হয়ে ফোড়ন কাটছিস কেন? বিয়ে আমি দিয়েছি, আমার তো একটা দায় আছে। তুই গেলে কী বলে, কয়?

ওই কথা—টথা হয় আর কী। সে যেন ভালোই আছে।

বড়লোকের ঝি, ভালোই তো থাকার কথা। তা বলে তার নিজের জনদের দেখবে না একটু? ও আবার কেমনধারা? ওখানে গিয়ে কেমন বুঝে এলি? আসতে চায়?

তা চায় বোধহয়। তবে বড্ড জড়িয়ে পড়েছে তো। গিন্নিমা নাকি বেজায় ভালোবাসেন।

অমন ভালোবাসার মুখে আগুন! এক কুড়ি বয়স হতে চলল, সংসার ধর্ম আর কবে করবে? তুই আবার বিয়ে কর তো! শিহরিত হয়ে শ্রীপতি বলে, বলো কী?

ঠিকই বলছি। এই বাদায় তো আর আইন কানুন নেই। একটা চিঠি দিয়ে জানিয়ে দে, এক মাসের মধ্যে না ফেরত এলে তুই আবার বিয়ে করবি। মেয়ে আমি দেখে রেখেছি। গোবিন্দ রায়ের মেয়ে মেনকা। খাটিয়ে পিটিয়ে আছে, মুখ নেই মোটে, লেখাপড়াও খানিক জানে।

আহা, দুদিন দ্যাখোই না, সে তো আর কাটান ছেড়ান করতে চায়নি। গাঁয়ের থেকে কলকাতায় গিয়ে মনটা একটু অন্যরকম হয়েছে আর কি। বিবেচনা হলে দেখবে, ফিরে আসবে। আর এসেছে। যদি আসেই বা, ততদিনে তুই যে ছন্নছাড়া হয়ে যাবি। লোকের মুখে শুনি ভ্যানগাড়ি চালাস না, নৌকোটা কাকে দান খয়রাত করলি, চাষবাসে মন নেই। এসব কি ভালো? তবে আক্কেল থাকলে বুঝত, মনিবানির মন জুগিয়ে চললেই জীবন কাটবে না। সোয়ামি কি ফ্যালনা? আজই ফিরে গিয়ে তুই একটা পোস্টকার্ড ছাড়বি তার নামে।

এসব কথা শ্রীপতির গায়ে ছ্যাঁকা দেয়। মনসার নিন্দে এখনও তার সহ্য হয় না। কিন্তু মাসির মুখের ওপর কথা বলবে তেমন বুকের পাটা তার নেই। মিনমিন করে বলল, হপ্তাখানেকের মধ্যে আমারই কলকাতায় যাওয়ার কথা। তখন বলব'খন।

বেশ হাঁকডাক করে বলবি, যেন কথাটা মনিবানির কানে যায়, তাহলেই মনিবানির টনক নড়বে।

বলব'খন।

তুই যে কী বলবি তা ভগাই জানে। গিয়ে নিশ্চয়ই মেনিমুখোর মতো মিনমিন করে আসিস। নরম মাটিতে বেড়ালে হাগে, জানিস তো! দাপের খাপের লোক হতি, বউ লটকে এসে পায়ে পড়ত। চিঠিটাই বরং লিখে দে, তাতে কাজ হবে। মুখোমুখি হলে তোর মর্দানি উবে যাবে সে আমি জানি।

২

সন্ধে সাতটার সময় নন্দিনী লাহিড়ী টিভি দেখতে বসেন। খুব গুছিয়েই বসেন। হাতের কাছে পানের বাটা, বোতল, পিকদানি, সামনে পা রাখার জন্য একটা নরম গদিওয়ালা মোড়া সব গুছিয়ে রাখে পিয়ালি। সন্ধে সাতটার বাংলা খবর থেকে শুরু করে রাত এগারোটা পর্যন্ত তিনি টানা পরপর দু'তিনটে চ্যানেলে বাছাই করা সিরিয়াল দেখে যান। সিনেমা থাকলে সিনেমা। এই সময়ে কোনোরকমে ডিস্টার্বেন্স তাঁর সহ্য হয় না। ডালে ফোড়ন দেওয়ার শব্দ হলেও বিরক্ত হন। তাই বাড়ির লোক এ সময়ে সাবধানে থাকে। আজকাল টিভি সিরিয়ালের কল্যাণে সন্ধেবেলা অতিথি অভ্যাগত আসা কমে গেছে। তাই বাঁচোয়া। নন্দিনীর সংসার অতিশয় সুখের। স্বামী মস্ত সরকারি অফিসার ছিলেন। প্রচুর রোজগার করেছেন তিনি। নন্দিনী নিজে কলেজে পড়াতেন। এখন দুজনেরই অবসর জীবন। তাঁদের একমাত্র ছেলে কৃতী ডাক্তার। বিদেশে পড়তে গিয়েছিল, বড় ডিগ্রি নিয়ে বিদেশে থেকে যায়নি। দেশে ফিরেছে। আর মা—বাবার পছন্দ করা পাত্রীকে বিয়ে করে এ বাড়িতেই আছে, মা—বাবার সঙ্গেই। নন্দিনীর তিন বছর বয়সি একটি ন্যাওটা নাতনি আছে। পুত্রবধূটি উত্তরবঙ্গের এক বাগচী পরিবারের। মুখরা নয়, জেদি নয়, বেশ সরল সহজ খোলামেলা স্বভাবের। একটু আবেগপ্রবণ, আর কোনো দোষ নেই। শাশুড়ির সঙ্গে তার বেশ ভাবসাব। নন্দিনীর বাড়িতে রান্না এবং

কাজের জন্য আলাদা আলাদা লোক আছে, সুতরাং পুত্রবধূ প্রমিতাকে কাজকর্ম বিশেষ করতে হয় না। সন্ধেবেলাটায় সেও শাশুড়ির পাশে বসে টিভি দেখে।

বাড়ির কর্তা চন্দ্রজিৎ লাহিড়ী সকালে খবরের কাগজ পড়েন, বাজার করেন, বাগানের পরিচর্যা, করেন, দুপুরে বই পড়েন, বিকেলে ক্লাবে গিয়ে টেনিস খেলেন এবং তারপর সামান্য একটু মদ্যপান ও আনুষঙ্গিকের সঙ্গে রাত দশটা পর্যন্ত ব্রিজ খেলে বাড়িতে ফেরেন। রাত্রে প্রায়ই তিনি বাড়িতে কিছু খান না। রাত এগারোটায় ঘড়ি ধরে শুতে চলে যান। খবর শোনা বা খেলা দেখা ছাড়া তিনি টিভির বিশেষ ভক্ত নন। চন্দ্রজিৎ ঘড়ি ধরে চলতে পছন্দ করেন। নন্দিনীর ঠিক উলটো। তিনি রাত এগারোটার পর ছেলে চেম্বার সেরে ফিরলে খেতে বসেন। টেবিলের মাথায় তিনি, ছেলে সত্রাজিৎ এবং পুত্রবধূ প্রমিতা দু—ধারে। নাতনি পিউ ততক্ষণে ঘুমিয়ে কাদা। খেতে বসে তাঁদের মধ্যে নানারকম গল্প হয়। নন্দিনী বেশি কথা বলেন না, তবে মন দিয়ে শোনেন। নন্দিনীর ঘুমের সমস্যা আছে। ষাট পেরোনোর পর তাঁর ঘুম কমে গেছে। প্রথম রাতে ঘুম আসতেই চায় না। চেষ্টা করতে করতে রাত তিনটে চারটে নাগাদ একটু তন্দ্রামতো আসে। বেশিক্ষণ নয়, ঘণ্টা তিনেক বাদেই উঠে পড়তে হয়। অথচ চাকরি—জীবনে এসব সমস্যা ছিল না, শুলেই ঘুমিয়ে পড়তেন। চন্দ্রজিৎ পরামর্শ দেন, একটু—আধটু ড্রিংক করে দেখতে পারো, ভালো ঘুম হবে। নন্দিনী রাজি হন না। তাঁর সংস্কারে বাঁধে।

স্বামী চন্দ্রজিতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা মিশ্র ধরনের। উষ্ণও নয়, শীতলও নয়। চন্দ্রজিতের অনেক কিছুই তিনি পছন্দ করেন না, এবং অনেক কিছু করেন। চন্দ্রজিতের বয়স এখন ছেষট্টি। বয়স ধরলে বুড়ো। তবে চন্দ্রজিৎ টেনিস খেলে এবং কম খেয়ে চেহারাটা বুড়িয়ে যেতে দেননি। চুলে কলপ দেন নিয়মিত। নিজের হাতে বাজার করতে যান পায়ে হেঁটে এবং বোঝা নিয়ে হেঁটেই ফেরেন। বেশ ফিট, তুলনায় নন্দিনী ততটা ফিট নন। তাঁর হাঁটুতে ব্যথা এবং স্পন্ডেলাইটিসজনিত ঘাড় আর কোমরের সমস্যা আছে। সাঙ্ঘাতিক কিছু নয়, তবে একটু আধটু কষ্ট তো আছেই। চোখে ছানিও আসছে। এবার শীতেই কাটিয়ে নেবেন বাঁ চোখটা। সত্রাজিৎ ডাক্তার ঠিক করে রেখেছে।

রাত আটটা বাজে। শীতের রাত এবং আজ বেশ ঠান্ডাও পড়েছে। সল্ট লেকে এমনিতেই ঠান্ডা একটু বেশি। আজ নন্দিনী পায়ে একটা কম্বল ঢাকা দিয়ে বসেছেন, গায়ে ফুল হাতা কার্ডিগান এবং গরম চাদর। প্রমিতার পরনে একটা গরম কাপড়ের হাউসকোট। একটা জমজমাট বাংলা সিরিয়াল এখনই শুরু হবে। তার আগে একটা বিজ্ঞাপনের বিরতি চলছে। নন্দিনীর সোফার পাশেই পিয়ালি একটা মোড়ায় বসা। সে সুন্দরবন অঞ্চলের মেয়ে। বাড়ি বেশ দুর্গম জায়গায়। কোরাকাঠি গ্রাম। চার বছর ধরে এ বাড়িতে আছে। তার প্রধান কাজ হল নন্দিনীর দেখাশুনো করা। নন্দিনী কিছু অশক্ত মহিলা নন। তবু পিয়ালি তাঁকে বেশ তোলা—তোলা করে রাখে। আর নন্দিনী পিয়ালির মধ্যে তাঁর না হওয়া মেয়ের একটা অনুষঙ্গ পান।

পিয়ালি বলল, এবার চা করে আনি, মা?

একটু আদার রস দিস তো।

ঠিক এই সময়ে ডোর বেল বাজল।

দ্যাখ তো, কর্তা ফিরল নাকি?

প্রমিতা দেয়াল ঘড়িটা দেখে বলল, এত তাড়াতাড়ি!

তাই তো! এ সময়ে কে এল আবার! হুট করে দরজা খুলিস না, আই হোল দিয়ে দেখে নিস।

পিয়ালি নীচে গিয়ে দেখে এসে বলল, অচেনা লোক মা। তবে ভদ্রলোকের মতো চেহারা।

শেকলটা আটকে দরজা ফাঁক করে জিজ্ঞেস কর, কী চায়।

কুরিয়ারের পিয়ন নয় তো?

না, সেরকম চেহারা নয়। অল্পবয়সি, পরনে জিনস আর ফুলহাতা সোয়েটার, ফর্সা। জিজ্ঞেস করে নে আগে। পিয়ালি নীচে গেল ফের। একটু বাদে ফিরে এসে বলল, ও মা! ইংরিজি বলছে যে!

বিরক্ত নন্দিনী বলেন, ইংরিজি বলছে! সেলসম্যান নয় তো! প্রমিতা, একটু দ্যাখো তো!

প্রমিতা উঠে গিয়ে কিছুক্ষণ বাদে এসে বলল, শ্বশুরমশাইয়ের খোঁজ করছে। নেই বলাতে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে এখন। দরকার কীসের?

তা তো বলছে না। আপনাকে বলবে বলছে।

কাল সকালে আসতে বলে দাও।

বলেছি, কিন্তু বলছে কাল সকালে ও মুম্বাই ফিরে যাবে।

কী নাম?

সাঁইদাস লাহিড়ী।

লাহিড়ী! বাংলা বলছে না?

না। বাংলা জানে না।

কী আর করা! ভিতরেই ডাকো। প্রমিতার সঙ্গে যে ছেলেটা এসে ঘরে ঢুকল সে অন্তত ছ'ফুটের ওপরে লম্বা, টকটকে ফর্সা রং, মুখশ্রী চমৎকার। নীল জিনস আর উটের গায়ের রঙের পুল ওভারে কী সুন্দর যে দেখাচ্ছে! ঘরটা যেন আলো হয়ে গেল।

সুপুরুষ ছেলেটিকে দেখে চোর ডাকাত বলে মনে হয় না। চেহারায় বাঙালিয়ানাও নেই। নন্দিনী বিরক্তি ভুলে কয়েক সেকেন্ড চেয়ে থেকে বললেন, হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট, ইয়ং ম্যান? ছেলেটি সুন্দর একটু হেসে ইংরিজিতে বলল, বড় অসময়ে এসে পড়েছি। কিন্তু আমি আর সময় করতে পারিনি। মাফ করবেন। নন্দিনী দেখলেন, ছেলেটি চোস্ত ইংরিজি বলে। নন্দিনী একটু নরম গলায় বললেন, তোমার কি খুব জরুরি কোনো দরকার? আমার স্বামী রাত দশটার আগে ফিরবেন না।

ওঁর সঙ্গে দেখা হলে ভালো হত। কিন্তু আমার ফ্লাইট কাল সকালে। আজ সারাদিন আমি ব্যস্ত ছিলাম বলে আসতে পারিনি।

তুমি কী করো?

আমি বিজনেসম্যান। আপনি আমার কার্ড রেখে দিন।

আমার স্বামী কি তোমাকে চেনেন?

না। চেনার দরকারও নেই। শুধু একটা জিনিস যদি দয়া করে ওঁকে দিয়ে দেন তাহলেই হবে।

বলে প্যান্টের পকেট থেকে সেলোফেনে মোড়া একটা জিনিস বের করে সেন্টার টেবিলে রেখে দিল।

জিনিসটা কী বলো তো!

একটা গয়না।

নন্দিনী অবাক হয়ে বললেন, গয়না! কার গয়না? কাকে দিতে চাইছ?

ছেলেটি মাথা নেড়ে বলল, সে সব আমার জানা নেই। আপনি শুধু আপনার হাজব্যান্ডকে বলবেন মুম্বই থেকে সরোজা দেবী ওটা পাঠিয়েছেন। এর বেশি কিছু সরোজা দেবী আমাকে বলেননি। উদ্বেগের গলায় নন্দিনী বললেন, কিন্তু তাঁকে তো আমরা চিনি না, গয়না নেব কেন?

সম্ভবত আপনার হাজব্যান্ড ওঁকে চেনেন।

হিপ পকেট থেকে একটা কার্ড হোল্ডার বের করে একটা কার্ডও ছেলেটা সেন্টার টেবিলে রেখে দিল। বলল, আমি অপেক্ষা করতে পারছি না। আমার একটা জরুরি মিটিং আছে।

দাঁড়াও বাপু। আগে গয়নাটা দেখি।

প্রমিতা তাড়াতাড়ি মোড়কটা এনে নন্দিনীর হাতে দিল। নন্দিনী খুলে চমকে গেলেন। চমৎকার একটা নেকলেস। একটু পুরোনো ডিজাইন বটে, কিন্তু বেশ ভারী এবং দামি পাথর বসানো। ও বাবা! এ তো দামি জিনিস! কিন্তু আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

সাঁইদাস তেমনি সুন্দর হেসে বলল, আমি দুঃখিত যে, এর বেশি আমিও কিছু জানি না।

সরোজা দেবী তোমার কে হন?

আমাদের চেনা জানা আছে।

তোমার পদবি লাহিড়ী! তোমার বাবার নাম কী?

এস লাহিড়ী। তিনি বাঙালি। কিন্তু আমি বাংলা জানি না।

তিনি কী করেন?

রিটায়ার্ড। চাকরি করতেন।

সাঁইদাস, গয়নাটা যদি আমরা না নিই?

আপনার হাজব্যান্ড মিস্টার লাহিড়ী হয়তো রিফিউজ করবেন না।

আর যদি করেন তাহলে আমাকে জানিয়ে দেবেন।

সরোজা দেবীর ফোন নম্বর কী? সেটা লিখে দিয়ে যাও।

সরি মিসেস লাহিড়ী, ওঁর কোনও ফোন নেই। উনি আশ্রমে থাকেন। খুব সেকলুডেড লাইফ। কারও সঙ্গে কন্ট্যাক্ট রাখেন না।

সাধিকা নাকি?

ওই রকমই।

কী যে মুশকিল হল! তুমি বোসো বাপু, একটু চা খাও।

না মিসেস লাহিড়ী, বসবার সময় নেই। আমার জন্য অনেক লোক অপেক্ষা করছে।

ছেলেটা যেমন হুট করে এসেছিল তেমনি হুট করেই চলে গেল। নেকলেসটা হাতে নিয়ে ভারী স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন নন্দিনী।

প্রমিতা, কিছু বুঝতে পারছ?

না, মা।

সরোজা দেবীর নাম তো জন্মেও শুনিনি ওঁর মুখে।

আমার কী মনে হচ্ছে, জানেন মা?

আমার মনে হয় বাবা যখন মুম্বইতে ছিলেন তখন বোধহয় ওই সন্ন্যাসিনীর কাছে দীক্ষা টীক্ষা নিয়েছিলেন। কিন্তু নেকলেসটা এল কেন? শিষ্যকে হয়তো গুরুর আশীর্বাদ!

উঁহু। গুরু শিষ্যকে নেকলেস পাঠায়, এ তো জন্মে শুনিনি।

বাবাকে তো ক্লাবে তখনই একটা ফোন করতে পারতেন, মা!

ওই দেখো! তাই তো! কথাটা তো আমার মাথায় আসেনি। তুমিও তো বাপু বলতে পারতে আমায়!

আসলে আমারও কেমন যেন একটু হকচকিয়ে যাওয়ার মতো হয়েছিল। ছেলেটা কী হ্যান্ডসাম, বলুন!

হ্যাঁ, আবার পদবিটাও লাহিড়ী। কী জানি বাপু, আমার বড্ড গোলমেলে লাগছে।

পিয়ালি তিন কাপ চা ট্রেতে করে এনে বলল, ও মা! লোকটা কোথায় গেল! চা নিয়ে এলুম যে!

নন্দিনী বললেন, তুই খা না মুখপুড়ি। সে চলে গেছে।

আমার চাও তো আছে।

তাহলে বলরামকে দে।

তোমার যেমন কথা! বলরাম হল নিষ্ঠে বামুন, বাইরের লোকের কাপে ঢালা চা সে খায় নাকি? জাত যাবে না?

তাহলে ফেলে দিগে যা।

ঝকমকে দাঁতে এক গাল হেসে পিয়ালি বলল, ফেলব কেন, আমিই দু—কাপ খেয়ে নিই।

নন্দিনী চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বললেন, আমার সিরিয়ালটার আজ বারোটা বাজল। কতটা হয়ে গেল বলো তো!

কাল রিপিট শোটা দেখে নেবেন।

নন্দিনী সিরিয়ালটায় মন দিতে পারছেন না। মনটা বারবার নেকলেস, সাঁইদাস আর সরোজা দেবীতে ঘোরাফেরা করছে। চন্দ্রজিৎ সরকারি চাকরির সুবাদে দিল্লি, মুম্বই আর চেন্নাইতে থেকেছেন। কোথাও কোথাও তিন চার বছর ধরে। নন্দিনী নিজের কলেজের চাকরি ছেড়ে, স্বামীর সঙ্গে কখনো টানা বসবাস করেননি। তবে গ্রীষ্ম আর পুজোর ছুটিতে গিয়ে থেকে আসতেন। তাতে সম্পর্কটা যেন তরতাজা থাকত। দুজনে দুজনের কাছে একঘেয়ে বা পুরোনো হয়ে যাননি।

সরোজা দেবী কে, প্রশ্নে মনটা উচাটন। ক্লাবে ফোন করে চন্দ্রজিৎকে জিজ্ঞেস করবেন কিনা সেটা ঠিক করতে পারছিলেন না। ব্রিজ খোলার সময় কোনো বিক্ষেপ চন্দ্রজিৎ পছন্দ করেন না। তা ছাড়া দশটা সাড়ে দশটায় লোকটা তো ফিরে আসবেই। ততক্ষণ কষ্ট করে ধৈর্য ধরে থাকাই তাঁর যুক্তিযুক্ত মনে হল। সেন্টার টেবিলে রাখা কার্ডটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে দেখলেন নন্দিনী। প্লাস্টিকের ভারী সুদৃশ্য কার্ড। সাঁইদাস লাহিড়ী। সাঁই এন্টারপ্রাইজ। ওরলি। মুম্বই। নীচে কয়েকটা টেলিফোন নম্বর, ফ্যাক্স নম্বর, ই—মেল অ্যাড্রেস ইত্যাদি যেমনটা হয় আর কি। লেবু, বিট নুন আর আদা দেওয়া কালো চা—টা এ সময়ে খুবই উপভোগ্য লাগে নন্দিনীর। আজ যেন চায়ের কোনো স্বাদগন্ধই পেলেন না। পিয়ালিকে বললেন, জানালার একটা পাল্লা খুলে পরদা সরিয়ে দে তো! কেমন হাঁফধরা লাগছে!

পিয়ালি গিয়ে জানালার পাল্লা খুলে দিতেই কনকনে বাতাসের ঝাপটা এসে দুলিয়ে দিল দেয়ালের ক্যালেন্ডার।

## ৩

এ বাড়িতে কাজে ঢুকে ভারী অবাক হয়ে গিয়েছিল মনসাবালা। বাসন মাজা নয়, ঘর ঝাঁট দেওয়া বা পোঁছা নয়, কাপড় কাচা হয় মেশিনে। কাজ বলতে ঝাড়ন দিয়ে ফার্নিচার আর দরজা জানালা মোছা, কুটনো কাটা, গিন্নিমার এটা ওটা এগিয়ে দেওয়া। এইটুকুন কাজের জন্য নাকি সাতশো টাকা! অবাক কাণ্ড! আর হ্যাঁ, কেউ এলে নীচে গিয়ে দরজা খুলতে হয়। কোরাকাঠির বাপের বাড়ি বা শ্বশুর বাড়ির গাঁয়ে তাকে এর চেয়ে দশগুণ খাটতে হত। রান্নাবান্না তো ছিলই, সেই সঙ্গে বাসন মাজা, উঠোন আর ঘর নিকোনো, ধান সেদ্ধ করে শুকোনো, চিঁড়ে কোটা, মুড়ি ভাজা, টিপকলে গিয়ে জল ধরা—কী নয়? এ বাড়িতে আসার সাত দিনের মধ্যে তার শরীর ফিরল। পায়ের হাজা সারল, আরও অনেক কিছু হতে লাগল। প্রথম প্রথম কি একটু আধটু মন খারাপ হত না? কান্না পেত না? সে হত বটে, বিশেষ করে শ্রীপতির জন্য। কখনো একটা বেফাঁস কথা কয়নি। তা ছাড়া গাঁয়ের মাটি, নদী, গাছপালা, আকাশ, টিয়ার ঝাঁক, শশা আর শাকের খেত সব কিছুই মনে পড়ত। বড্ড হু হু করত মন। কিন্তু দিন পনেরোর মধ্যেই সে সব যেন পালা জ্বরের মতো সেরে গেল। গিন্নিমা হয়ে গেল মা, বাড়ির কর্তা বাবা। বাড়ির ছেলে দাদা, তার বউ বউদি। মনসার নতুন নাম হল পিয়ালি। বেশ লোক এরা। দেওয়া থোওয়ার হাত আছে। প্রথম মাসে মাইনে দিয়েই গিন্নিমা বলল, টাকা কাকে পাঠাতে চাস? তোদের সুন্দরবনে মানিঅর্ডার যায় তো! পিয়ালি একটু ভাবনায় পড়ে গিয়ে বলে, তা আছে বোধহয়। আমরা তো কখনো চিঠি পত্তর পাইনা। পিয়ালি টাকাটা নিয়ে খুব কষে খানিক ভাবল। তার কি কোরাকাঠিতে মা বাবার কাছে টাকা পাঠানো উচিত? কিছু টাকা কি শ্রীপতির কাছেও পাঠানো উচিত নয়? কিন্তু ভেবে দেখল, মা বাবার সুখে দুঃখে চলে যাবে। টাকা গেলে তার মদখোর দাদাই সেটা উড়িয়ে দিয়ে আসবে শুঁড়িখানায়। আর শ্রীপতি মোটেই অভাবী লোক নয়। তার ভ্যানগাড়ি আছে, নৌকো আছে, ধানজমি আছে। সুতরাং সে টাকা পাঠাল না। গিন্নিমা তাকে তিনমাস বাদে স্টেট ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলে দেয়। রাস্তাঘাট আজকাল সড়গড় হয়ে গেছে। পিয়ালি এখন নিজেই গিয়ে প্রতি মাসে ব্যাংকে টাকা জমা দিয়ে আসে। গাঁয়ে থাকতে লেখাপড়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না। গত চার বছরে এ বাড়িতে সে যেমন

মাইক্রোওয়েভ, ওয়াশিং মেশিন, মিউজিক সিস্টেম চালাতে শিখেছে, তেমনি কাজ চালিয়ে নেওয়ার মতো বাংলা, ইংরিজি আর অঙ্কও।

প্রথম কাজে ঢোকার চার পাঁচ মাস বাদে একদিন শ্রীপতি দেখা করতে এল। নীচে গিয়ে দরজা খুলে মানুষটাকে দেখে ভারী আহ্বাদ হয়েছিল সেদিন। এক গাল হেসে বলেছিল, তুমি এসেছ? ভাবতে পারছি না।

শ্রীপতি ভারী লজ্জা লজ্জা মুখ করে বলল, দেখতে এলুম। এখানে সব ঠিক আছে তো! অসুবিধে নেই?

না না। ভীষণ ভালো বাড়ি। এসো, এই সিঁড়ির নীচেই বসতে হবে কিন্তু।

শ্রীপতি ঘাড় নেড়ে বলল, সেই ভালো।

দুজনে বসে কিছুক্ষণ কথা হল। তারপর শ্রীপতির জন্য কিছু খাবার আনতে ওপরে গিয়ে গিন্নিমাকে বলল, মা, দেশ থেকে আমার এক জ্ঞাতি ভাই এসেছে খবর নিতে। একটু রুটি তরকারি দিই? সেটা আবার জিজ্ঞেস করার কী আছে? রুটি তরকারির সঙ্গে একটা সন্দেশও দিস। ফ্রিজ থেকে বের করে নে।

শ্রীপতি ভারী যত্ন করে খেল। খাওয়া দেখে চোখে জল এল পিয়ালির। কেন এল তা কে বলবে!

আরও সাত আট মাসে যখন লোকটা এল তখন আর তেমন আবেগটা টের পেল না পিয়ালি। একটু যেন তফাত হয়ে গেছে দুজনের মধ্যে। তবে কথাটথা হল অনেক। শ্রীপতি বলেই ফেলল, দেখে মনে হয় এখানে বড্ড ভালো আছ তুমি। গাঁয়ে তো এত যত্নআত্তি পাও নি! থাকো তাহলে। শেষে বোধহয় একটা দীর্ঘশ্বাসও ফেলেছিল শ্রীপতি। পাছে তাকে নিয়ে যাওয়ার বায়না করে সেই ভয়ে কাঁটা হয়েছিল পিয়ালি। দেখা গেল শ্রীপতি সেই ধার দিয়েও গেল না। ভারী নিশ্চিন্ত লাগল তার।

এই বছরখানেক আগে থেকে একটা ঘটনা একটু একটু করে ঘটতে লেগেছে। ঘটনাটা ভারী অদ্ভুত। দুলাল নামে একজন ছোকরা কাঠমিস্তিরি এ বাড়িতে কাজে লেগেছিল। তার হাতের কাজ খুব ভালো। গিন্নিমা তাকে দিয়ে একটা মস্ত ঠাকুরের সিংহাসন করালেন। সে ভালো ঝুন কাঠ নিয়ে এসে গ্যারেজ ঘরের এক কোণে কাঠ কুঁদে কুঁদে সিংহাসনটা বানাচ্ছিল। মাঝে মাঝে তাকে চা—বিস্কুট দিয়ে আসতে পিয়ালিকে পাঠাত গিন্নিমা। পিয়ালি চা পৌঁছে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ দুলালের কাজ দেখত। তন্ময় হয়ে কাজ করত দুলাল। এক ডাকে সাড়া পাওয়া যেত না। করাত, হাতুড়ি, বাটালি, ছেনি, র‍্যাঁদা, কত যে তার যন্ত্রপাতি। কাজ করতে করতে প্রায়ই তার চা যেত ঠান্ডা হয়ে। পিয়ালি ঝংকার দিত—বলি, চা—টা খাবে নাকি? আমি বাপু এঁটো কাপের জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না। দুলালের স্বভাব ভারী ভালো। ঝকঝকে দাঁতে হেসে বলত, ওঃ, চা এনেছ বুঝি? আমার কাজের সময় কেমন যেন মাথায় ভূত চাপে। দাও, ঠান্ডাই মেরে দিই।

কিন্তু মুগ্ধ হয়ে দেখার মতো ছিল তার হাতের কাজ। মাস খানেকের মাথায় যখন সিংহাসনটা শেষ হল তখন যে দেখে সেই দশমুখে তারিখ পরে। সিংহাসন তো নয়, যেন একখানা মন্দির। তার সর্ব অঙ্গে কারুকার্য, পনেরো হাজার টাকার বরাত ছিল। গিন্নিমা খুশি হয়ে আরও হাজার টাকা দিয়ে বলল, তোমার হাতের কাজ যখন এতই ভালো, তাহলে আমাকে বাবা আরও কিছু আসবাব করে দাও। ইংলিশ খাট আমার বড্ড ন্যাড়া ন্যাড়া লাগে। আমাকে আগের দিনের মতো খুব কারুকাজ করা একখানা পালঙ্ক করে দাও। সঙ্গে ম্যাচিং টেবিল, বুককেস।

দুলাল সবই করে দিল। সেগুলোও হল দেখার মতোই। তার দুঃখ নিজের দোকান নেই, ঘুরে ঘুরে কাজ করতে হয়। মানিকতলার এক ফার্নিচারের দোকানে দুলাল চুক্তিমতো কাজ করে দেয়। সেই দোকানেই রাতে থাকে।

গিন্নিমা একদিন তাকে বললেন, আমার আউট হাউসটা ফাঁকা পড়ে আছে। সেখানে থাকতে পারিস। বদলে আমার বাইরের ফাইফরমাস খেটে দিস, বাজার করে দিস।

ছয় মাস হল দুলাল আউট হাউসে আছে। সকালে বাগানে জল দেয়, দরকার হলে দোকানপাটে গিয়ে দরকারি জিনিস এনে দেয়। বেলা এগারোটা বারোটায় বেরোয়, রাত দশ সাড়ে দশটায় ফেরে। এ বাড়ির দু'দুটো গাড়ি সেই ধোয়ামোছা করে। তা ছাড়া সে ইলেকট্রিকের কাজ জানে, জামাকাপড় ইস্তিরি করতে

পারে, প্লাম্বিং করতে পারে। তা ছাড়া বাড়ির একটা পাহারার কাজও হয়। গিন্নিমা একদিন পিয়ালিকে বলল, হ্যাঁ, রে, দুলালকে তোর পছন্দ হয়?

পিয়ালি ভিতরে ভিতরে শিউরে উঠল আতঙ্কে। বলল, ও কী কথা মা?

কেন রে, খারাপ কী বললুম বল তো! সেও তো শুনি বাদা অঞ্চলের ছেলে। তোর সঙ্গে তো দিব্যি মানায়।

পিয়ালির মুখ শুকিয়ে গেল। বলল, তাই কি হয়?

কেন রে, তোর কি বিয়ের বয়স হয়নি? আমার তো ইচ্ছে তোরা দুটিতে আমার কাছেই থাক। তুই যেমন আমার কাজ করছিস তেমনি করবি। দুলালকে যত্নআত্তি করবি। বেচারার তো শুনেছি মা—বাপ নেই। হাতের কাজই ভরসা। দেখবি, একদিন ও বেশ উন্নতি করবে। পছন্দ নয় কেন রে?

পিয়ালির মনে হচ্ছিল, এ কথা শোনাও পাপ হচ্ছে। সিঁদুর লুকিয়ে কাজে ঢুকেছে বটে, কিন্তু তা বলে বিয়েটা তো আর মিথ্যে হয়ে যায়নি! সে কিছুই বলতে পারল না। তবে ভয়ে বড্ড গুটিয়ে গেল। বুকের মধ্যে গুড়গুড় করতে লাগল তার।

গিন্নিমা বলল, তোর চেহারাখানা ভালো, মনে হয় দুলালেরও তোকে মনে ধরেছে। সে তো ফচকে ছেলে নয়! চেহারায়, বয়সে সব দিক দিয়েই তো তাদের মানায়। দুলালটাকে যদি বেঁধে ফেলতে পারিস তাহলে তোরও ভবিষ্যতের ভাবনা থাকবে না। তোদের তো আরও অল্প বয়সেই বিয়ে হয়, তবে ওরকম করছিস কেন?

পিয়ালি পালাতে পারলে বাঁচে। রাতে সে প্যাসেজের বিছানায় শুয়ে বালিশে মুখ গুঁজে খুব কাঁদল। এসব কেন হচ্ছে? তার কি উচিত হবে শ্রীপতির কাছে ফিরে যাওয়া? কিন্তু তাই বা হবে কী করে? এ বাড়ির সুখ আরাম ছেড়ে সে কি ওই গাঁয়ে গিয়ে থাকতে পারবে এখন? মাথাটা বড্ড গরম হল তার। অনেক রাত পর্যন্ত এপাশ ওপাশ করল, ঘুম হল না ভালো করে। পরদিন সকালেই দুলালের সঙ্গে নীচে দেখা। পিয়ালি দরজায় গুঁজে রাখা খবরের কাগজ আনতে গিয়েছিল। মুখোমুখি হতেই দুলাল তার বেজায় সুন্দর হাসিটা হেসে বলল, তোমার মুখটা অমন শুকনো কেন?

এমনি।

একটা কথা কইব তোমাকে?

শক্ত হয়ে সিঁটিয়ে গিয়ে সে বলল, বলো। এ বাড়ির মা তোমাকে কিছু বলেছে? পিয়ালি মুখ নামিয়ে চুপ করে রইল। দুলাল খুব সরল মুখে বলল, আমার চালচুলো নেই বটে, বাপের কাছ থেকে যেটুকু হাতের কাজ শিখেছি তাই ভরসা। বাদায় একখানা টিনের ঘর আছে আর দু বিঘে জমি, কিন্তু তার তিনজন ভাগিদার। সব বললুম তোমাকে, কিছু লুকোছাপা নেই।

পিয়ালি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, বিয়ের কথাটা কে তুলল? তুমি?

দুলাল ফের হাসল। বলল, না গো, আমি তুলিনি। ইচ্ছে ছিল আগে একখানা দোকান টোকান দিয়ে বসি, তারপর সংসার করার কথা ভাবব। এখন টাকা জমাচ্ছি। তবে এ বাড়ির মা যখন বলল, হ্যাঁ রে দুলাল, পিয়ালিকে বিয়ে করবি, তখন শুনে আমার মন্দ লাগল না। তুমি একটা বেশ মেয়ে।

পিয়ালি একবার চোখ তুলে তাকাল দুলালের দিকে। দাঁড়িয়ে শুধু হাসছে, ওর হাসিটা বরাবর ভালো লাগে পিয়ালির। সোজা সরল মানুষ, বিভোর হয়ে কাজ করে শুধু। সংসারের ঘোরপ্যাঁচ তেমন জানে না। শ্রীপতির সঙ্গে খানিকটা যেন মিলও আছে। তফাত হল শ্রীপতির তেমন আলাদা গুণ নেই।

শ্রীপতির তেমন আলাদা গুণ নেই।

পিয়ালি ঠোঁটটা কামড়ে বলল, আমার এখন ওসব নিয়ে ভাববার সময় নেই।

দুলাল একটু যেন থতিয়ে গিয়ে বলল, রাগ হল নাকি?

না, রাগ নয়। আমার তো মনে হয়, এই বেশ আছি।

তা তো ঠিকই। কিন্তু এরকম ভাবে তো সারাজীবন কাটবে না।

মেয়েরা কি একা একা জীবন কাটাতে পারে?
আমার কথা ভেবে ঘুম হচ্ছে না বুঝি?
সত্যি কথা বলব?
আবার কী কথা?
তুমি হলে বড় ভালো হয়। তুমি বড় সাব্যস্তের মেয়ে।
তার মানে কী?
আমার মা বলত, সাব্যস্ত মানে সব দিকে নজর, বুদ্ধি বিবেচনা এই সব আর কী? বাড়ির মাও বলেন, পিয়ালি শুধু গতরে খাটে না, বুদ্ধিও খাটায়।
ঝি হিসেবে ভালো, বউ হিসেবে ভালো কিনা তা কে বলবে?
এটাও তো বেশ বুদ্ধির কথা বললে! আমি কেমন বর হয়ে দাঁড়াব তা কি আমিই জানি? শুধু মনে হয়, আমার পিছনে একটা আপনজন কেউ থাকলে বড় ভালো হত। শুধু মেয়েমানুষ নয় কিন্তু, আপনজন, নিজের জন। বুঝলে!
পিয়ালি বুঝল। কিন্তু রাতে ফের চুপি চুপি কাঁদল, ভাবল। ঠিক বটে তাদের সমাজের স্বামী—স্ত্রীর ছাড়ান কাটান আকছার হয়। কেউ তো আর তা নিয়ে আইন আদালত করে না। তবে বদনাম হবে একটু। কিন্তু কথা সেটা নয়। কথা হল, তার ভিতরে একটা দোটানা দেখা দিয়েছে।
তিন চারদিন পরেই একদিন বেলা দশটায় শ্রীপতি এসে হাজির। তাকে দেখে পিয়ালির যে কী হল, চোখের দিকে মোটেই তাকাতে পারে না। শ্রীপতি কোনো দাবি—দাওয়া নিয়ে আসে না, সে জানে। কোনোদিন একটা পয়সা চায়নি তার কাছে, টেনে নিয়ে যেতে চায়নি গাঁয়ে। বরং ভারী লজ্জা আর বোকা—বোকা মুখ করে ভয়ে ভয়ে দু—চারটে কথা বলেই চলে যায়। গা ছোঁয়ারও চেষ্টা করে না। পিয়ালি ভালো করে কথাই কইল না সেদিন। তাড়াতাড়ি দুটে রুটি খাইয়ে, 'কাজ আছে' বলে বিদায় করে দিল।
দোটানা ভাবটা কয়দিন ছিঁড়ে খাচ্ছিল তাকে। হ্যাঁ বটে, শরীর, মন সবকিছুই একজন কাউকে লতিয়ে নিয়ে বেড়ে উঠতে চায়। দুলালকে বিয়ে করলে তার দু—দিক রক্ষা হয়। এ বাড়িতে থাকা এবং সংসার ধর্ম। তার মন ধীরে ধীরে, খুব ধীরে ধীরে দুলালের দিকে ঝুঁকে পড়ছে, সে বুঝতে পারছিল। শ্রীপতি অশান্তি করবে না, সে জানে। জোর জবরদস্তি করা বা এসে চেঁচামেচি করে হাল্লাচিল্লা ফেলে দেওয়ার লোকও সে নয়। তবে শ্রীপতির কথা জানাজানি হবে, এটাও ঠিক। ব্যাপারটা দুলালকে একদিন বুঝিয়ে বলতে হবে।
তবে তার ভয়—ভয় করছে। মন কু গাইছে। কেমন পাপের গন্ধ পাচ্ছে সে। নীচের তলায় এক জোড়া স্বামী—স্ত্রী ভাড়া ছিল এতকাল। তারা সারাদিন বাসায় থাকেই না। সকালে বেরোয়, অনেক রাতে আলাদা আলাদা ফেরে। মেয়েটা নাকি খবরের কাগজে চাকরি করে, ছেলেটা কোন কোম্পানিতে। একদিন রাতে রাতের তুমুল ঝগড়া লাগল। চেঁচামেচি গভীর রাতে দোতলাতেও পৌঁছে গিয়েছিল। শুনে চুপি চুপি নেমে এসেছিল সে আর প্রমিতা। কী গালাগাল যে করছিল দুজনে দুজনকে। ইংরিজিতে, বাংলায়। তখনই জানা গেল, তারা মোটে স্বামী—স্ত্রীই নয়। বিয়ে টিয়ে হয়নি। একসঙ্গে থাকে। সেই রাতেই মেয়েটা চলে গেল।

৪

রাত্রি দশটার সময় গাড়ি চালিয়ে ফিরছিলেন চন্দ্রজিৎ। মনটা কিছু বিক্ষিপ্ত। শেষ ডিলটায় গেমটা হয়ে যাওয়ার কথা। চারটে নো ট্রাম্পের খেলা। কন্ট্রাক্ট ব্রিজ অতি সূক্ষ্ম ক্যালকুলেশনের ব্যাপার। ডামি থেকে স্পেডের বিবি খেললেই তিনটে পিট অনায়াসে চলে আসত। ওই একটা ভুলেই...
কথা হচ্ছে, ভুলভ্রান্তি হচ্ছে কেন? বুড়ো হচ্ছেন নাকি? বুড়ো বয়সে মাথায় কুয়াশা জমে, রিফ্লেক্স কমে যায়। নিজেকে বুড়ো ভাবা তাঁর কখনো পছন্দ নয়। ভাবেনও না। সকালে হাঁটা, ব্যায়াম করা, খাদ্য নিয়ন্ত্রণ

এবং মনকে উদ্বেগমুক্ত রাখার নিরন্তর চেষ্টা চালিয়েও বার্ধক্য কি নানা রন্ধ্রপথে ঢুকে পড়তে চাইছে তাঁর সত্তায়? আগে ষাট পেরোলে লোকে জড়ভরত হয়ে যেত। আজকাল তো তা নয়। আশি নব্বই পেরিয়েও বিস্তর লোক নানাবিধ গুরুতর কাজ করে যাচ্ছে। আর তিনি একটা উটকো ভুল করে ফেললেন ছেলেমানুষের মতো! তাঁর পার্টনার সঞ্জিৎ রায় তো বলেই ফেলল, এ কী দাদা, এটা যে আনাড়ির মতো খেলা হল!

লজ্জাটা এখনও লিঙ্গার করছে মনের মধ্যে। স্পিডোমিটারে চোখ পড়তেই ভ্রু কুঁচকে গেল তাঁর। বাপ রে! বে—খেয়ালে নব্বই কিলোমিটারের কাছাকাছি স্পিড তুলে ফেলেছেন। সচরাচর পঞ্চাশ থেকে ষাটের বেশি গতিতে চালান না কখনো। রাস্তা ফাঁকা থাকলেও না। আসলে ভিতরকার উত্তেজনা শরীরে ছড়িয়ে গেছে। তাই পা শক্ত হয়ে বসেছে অ্যাকসেলেটরের ওপরে।

গতি কমিয়ে তিনি সল্ট লেকের নির্জন পথে ঢুকে পড়লেন। মন থেকে শেষ ডিলটা তাড়াতে পারছেন না। ভিতরে শরীর, মন, বোধ ও বুদ্ধির মধ্যে কো—অর্ডিনেশন ছিন্নভিন্ন হয়ে আছে। এত অসতর্ক মানুষ তিনি নন।

বাড়িতে ঢুকবার সময় একবার হর্ন দেন চন্দ্রজিৎ। সেই শব্দে পিয়ালি দরজা খুলে দেয়। আজও দিল। গাড়ি গ্যারাজে ঢুকিয়ে চন্দ্রজিৎ সদর পেরিয়ে নিজের ঘরে এসে জামাকাপড় বদলান। কারও দিকে তেমন তাকিয়ে দেখেন না। আজ আবার প্রবল অন্যমনস্কতা রয়েছে। মাথাটাও গরম। চারপাশটা যেন আবছা আবছা। কোনো ছাপ পড়ছে না মনে, চোখে, বোধে, যেন চারপাশে কেউ নেই।

হাত মুখ ঠান্ডা কনকনে জলে ধুয়ে তিনি শোওয়ার ঘরে এসে বিছানায় একটু বসলেন। দরজাটা বন্ধ রাখতে হয়। সামনের ঘরে রাত এগারোটা পর্যন্ত টিভি চলে।

সেই শব্দে ঘুম আসতে চায় না। শুতে যাচ্ছিলেন, দরজা ঠেলে নন্দিনী ঘরে ঢুকলেন।

শোনো, একটু কথা আছে।

অন্ধকারেই স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, বলো।

মুম্বই থেকে সাঁইদাস লাহিড়ী নামে একটা ছেলে আজ তোমার খোঁজে এসেছিল।

সাঁইদাস লাহিড়ী!

হ্যাঁ। চেনো?

নাম থেকে তো চিনতে পারছি না। কী চায়?

সরোজা দেবী নামে কেউ আছে তোমার চেনা?

এক সেকেন্ড চুপ করে থেকে চন্দ্রজিৎ বললেন, সরোজা!

হ্যাঁ।

কী ব্যাপারটা বলবে?

সরোজা দেবী তোমাকে একটা নেকলেস পাঠিয়েছেন।

আবার একটু চুপ থেকে চন্দ্রজিৎ বললেন, নেকলেস!

হ্যাঁ। তোমার রি—অ্যাকশন দেখে মনে হচ্ছে, চেনো।

চন্দ্রজিতের মনটা এখনও বিক্ষিপ্ত। বিরক্তির সঙ্গে বললেন, অমন গোয়েন্দার মতো জেরা করছ কেন? এটা তো রহস্যকাহিনি নয়! জেরা করব কেন? সিম্পলি জানতে চাইছি। রহস্যকাহিনি কিনা তা তুমিই জানো। কারণ আমি এদের নাম কখনও তোমার মুখে শুনিনি।

চন্দ্রজিৎ এবার একটু রেগে গিয়ে উঁচু গলায় বললেন, আমি কয়েক হাজার লোককে চিনি। তাদের সকলের কথা কি তোমাকে বলা সম্ভব? আর বলতে যাবই বা কেন? বলতে হবেই না কেন? চেঁচিও না। একজন মহিলা তোমাকে একটা দামি নেকলেস কেন পাঠাল সেটা জানার কৌতূহল কি আমার হতে পারে না? কৌতূহল হলে কথা ছিল না। কিন্তু তোমার কথায় একটা সন্দেহও বেরিয়ে আসছে।

সেটা কি অন্যায়? আমি জানতে চাই সরোজা দেবী কে?

বলব না। নান অফ ইওর বিজনেস। তুমি যেতে পারো।

ছোটলোক ইতরের মতো মেজাজ দেখিও না। আমি তোমার অন্নে প্রতিপালিত নই, তোমার ওপর নির্ভরও করি না। কাকে মেজাজ দেখাচ্ছ?

আমি কি তোমার বাপেরটা খাই না পরি? তুমি আমাকে ধমকানোর কে? তোমাকে কি আমার সব কাজের কৈফিয়ত দিতে হবে? সেই অধিকার অর্জন করেছ কখনো?

লোকে জানে আমি তোমার স্ত্রী, আইনসংগত স্ত্রী। স্ত্রীর অবশ্যই সবকিছু জানবার অধিকার আছে।

থাকত, যদি তুমি শুধু আইনসংগত স্ত্রী না হয়ে প্রকৃত স্ত্রী হতে। তোমার সঙ্গে আমার স্বামী—স্ত্রীর সম্পর্ক কবে হল? চিরকাল তো নিজের কেরিয়ারের জন্য কলেজে পড়ে রইলে। আমি কী খাই, কী পরি, তার খবর নিয়েছিলে কখনো? শুধু ভ্যাকেশনে গিয়ে মুখ দেখিয়ে আসতে। চমৎকার ব্যবস্থা, রাত এগারোটায় এখন স্ত্রীর অধিকার ফলাতে এসেছেন!

প্রমিতা বোধহয় মেয়ের ঘরে ছিল। এবার ছুটে এসে তাড়াতাড়ি নন্দিনীকে পিছন থেকে দু—কাঁধে ধরে বলল, মা, শান্ত হোন! শান্ত হোন! এত উত্তেজিত হওয়ার মতো কিচ্ছু হয়নি তো!

নন্দিনী ফুঁসে উঠে বললেন, হয় নি! কিছু না হলে তোমার শ্বশুর অমন ষাঁড়ের মতো চেঁচাত? কথায় বলে, চোরের মায়ের বড় গলা। পাপ ঢাকতে চেঁচিয়ে পাড়া মাত করছে।

এবার গলা সপ্তমে উঠে গেল চন্দ্রজিতের। পাপ! কিসের পাপ! অ্যাঁ! কিসের পাপ? ডুবে ডুবে জল খেলে বুজি একাদশীর বাপেও টের পায় না, না? সুজিত রায়ের সঙ্গে তোমার লটর পটরের কথা আমি জানি না ভেবেছ? সেটা তো আজকের নয়। লং ফিফটিন ইয়ার্স। কী বললে! কী বললে তুমি! তোমার জিব খসে পড়ল না?

কেন জিব খসে পড়বে? সত্যি কথা বললে জিব খসে পড়ে নাকি? তুমি এতদূর নীচ! এত অধঃপতন তোমার?

আমার অনেক আগে তোমার অধঃপতন শুরু হয়েছিল। জানতে চাও সরোজা কে? তুমি যা বলে সন্দেহ করছ তাই। আর সাঁইদাস আমার ছেলে। আসল ছেলে। কিছু বলার আছে তোমার?

নন্দিনী থরথর করে কাঁপছিলেন। প্রমিতা তাঁকে জড়িয়ে ধরে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করতে করতে বলল, মা, এখন চুপ করে থাকুন। বাবা এখন ভীষণ রেগে আছেন। এ বয়সে এত রাগ হলে হার্টে প্রেশার পড়বে।

সামনের ঘরে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দু—হাতে শক্ত করে কান চেপে বিস্ফারিত চোখে দাঁড়িয়ে ছিল পিয়ালি। ডোরবেল বাজতেই হঠাৎ হরিণের গতিতে তরতরিয়ে নীচে নেমে গেল।

একটু বাদে যখন সত্রাজিৎ ঘরে এসে ঢুকল তখন ঘরের সব আসবাবপত্র স্বাভাবিক। সংসারের কোথাও কোনো ভাঙচুর বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছে না। নিচু হয়ে জুতো মোজা ছাড়তে ছাড়তে সে বলল, ফাঁকা ঘরে টিভি চলছে কেন রে? মা কোথায়, তোর বউদিই বা কোথায় গেল?

ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় কোনোরকমে পিয়ালি বলল, ঘরে আছে।

ও।

নিজের ঘরে অন্ধকারে গুম হয়ে বসে আছেন চন্দ্রজিৎ। হুইস্কিটা যেন মাথায় উঠে বসে আছে। মাথার মধ্যে ঘূর্ণিঝড়ে উড়ছে খড়কুটো। স্থির চিন্তা অসম্ভব। রাগ আর ঘেন্না রক্ত কণিকায় বুঝি স্ফুলিঙ্গের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। নন্দিনীকে তিনি ঘৃণা করেন। এত ঘৃণা তিনি পৃথিবীর আর কাউকে করেন না।

তিনি কি কোনো অন্যায় করেছেন? অনেক বিচার করে দেখেছেন চন্দ্রজিৎ। না, তিনি কোনো অন্যায় করেছেন বলে তাঁর মনে হয় না। তাঁর বিবেকে কোনো দাগ নেই। একজন লম্বা চওড়া, সক্ষম যুবক নারীসঙ্গ চাইতেই পারে। তিনি স্ত্রীকে বহুবার বলেছেন, তিনি যথেষ্ট রোজগার করেন, চাকরির বাহানায় স্ত্রীর ওই দূরে সরে থাকা তাঁর পছন্দ হচ্ছে না। কিন্তু কিছুতেই চাকরি ছাড়তে রাজি হয়নি নন্দিনী। পুজো বা গ্রীষ্মের ছুটিতে

বেড়ানোর মতো আসত বটে, তাও প্রতি ছুটিতে নয়। পরীক্ষার খাতা দেখা, শরীর খারাপ, বাবার অসুখ— নানা টালবাহানায় বিরহী যক্ষের কাছে সে অধরা থেকেছে। অথচ একজন ক্ষুধার্ত পুরুষ অপেক্ষা করেছে তার জন্য। সরোজা ছিল তাঁরই অফিসের একজন কর্মচারী। খুব মিশুকে স্বভাবের। চেহারাটি মিষ্টি। প্রথম প্রথম নিজের টিফিনের বাক্সে তাঁর জন্য খাবার নিয়ে আসত, পান খাওয়াত। এইভাবেই সূত্রপাত হয়েছিল। তারপর যা হওয়ার কথা তাই হয়েছিল। নন্দিনীকে ডিভোর্স করে সরোজাকে বিয়ে করা সহজ ছিল না। এদেশে ছেলেরা যে সহজে ডিভোর্স পায় না তা মারাঠি উকিল বুঝিয়েছিল তাঁকে। তাই আর চেষ্টা করেননি। সরোজা সাহসী মেয়ে, সংস্কারমুক্ত, বিয়ের জন্য চাপও দেয়নি তাঁকে। বলেছিল, আই শ্যাল রিমেন এ সিঙ্গল মাদার। বুদ্ধিমতী মেয়ে, নন্দিনী যখন মুম্বই যেত কখনো দেখাসাক্ষাৎ করার চেষ্টা করেনি। নারীমুক্তি মোর্চার সংগঠন নিয়ে ব্যস্ত থাকত সে। সেই সংগঠন কুমারী মায়েদের পুনর্বাসন নিয়ে কাজ করত দেশ জুড়ে।

সরোজার গর্ভস্থ সন্তান বিষয়ে যখন চন্দ্রজিৎ খুব উদ্বেগে রয়েছেন, তখন সরোজা তাঁকে একদিন বলেছিল, তুমি ভেবো না যে, তুমিই আমাকে নষ্ট বা অন্যায়ভাবে ব্যবহার করেছ। ব্যাপারটা তা নয়। আমিও তোমাকে ব্যবহার করেছি। সুতরাং তোমার অনুতাপের কোনো দরকার নেই। পুরুষ ও মহিলার মধ্যে মুক্ত সম্পর্কের তো আমি পক্ষপাতীই।

তার উদারতা দেখে চন্দ্রজিৎ মুগ্ধ। এমনিতে তিনি যে এরকম মুক্ত সম্পর্কের সমর্থক তা নয়। কিন্তু ওই সংকটের সময় ওই আশ্বাসবাক্য মন্ত্রের মতো কাজ করেছিল।

সরোজার ছেলে যখন জন্মায় তখন চন্দ্রজিৎ দিল্লিতে। সরোজা যখন ফোনে তাঁকে খবরটা দিয়েছিল, তখন ভারী অদ্ভুত লেগেছিল তাঁর। তিনি বাবা হয়েছেন, কিন্তু বৈধ বাবা নয়। এটা যে কীরকম ব্যাপার দাঁড়াল, সেটা তাঁর বোধগম্য হচ্ছিল না। খুশি হচ্ছেন আবার একটা হাহাকারও হচ্ছে।

বছর বারো আগে মুম্বই গিয়ে সরোজার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। সরোজাকে গম্ভীর, শান্ত, গভীর বলে মনে হয়েছিল তাঁর। তখনই বলেছিল, দ্যাখো, কোনো কৃতকর্মকে গোপন রাখা দুর্বলতা, আমি চাই, তুমি অকপটে তোমার বউকে সব বলে দাও। আমার কথা, সাঁইদাসের কথা।

চন্দ্রজিৎ ভয় পেয়ে বললেন, তা হলে যে খুব অশান্তি হবে। হোক না। তুমি কি মনে করো তুমি গর্হিত কোনও পাপ করেছ? যদি তাই মনে হয় তবে সেটা তোমার স্ত্রীর কাছে গোপন করা আরও পাপ। অকপট হয়ে দ্যাখো। প্রথমে অশান্তি হবে, কিন্তু তারপর তুমি মনে শান্তি পাবে। আমাকে দ্যাখো, আমি তো এই সমাজের মেয়ে হয়েও লুকোইনি যে আমি এক কুমারী মা।

আমি তোমার মতো সাহসী নই।

তা হলে নিজেকে তোমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত লম্পট বলে মনে হবে। আমার মনে হয়, তোমার বউয়ের কাছে এখনই সব খোলাখুলি বলে দেওয়া উচিত। তোমার ছেলেকেও বলো। বললেই দেখবে মনের ভার কমে গেছে। আমি তো উসির কাছেও কিছুই লুকোইনি। আমার ওপর তাতে তার শ্রদ্ধা নষ্ট হয়নি। আমার মনে হয় মানুষ অকপট হতে পারে না বলেই চোরের মতো অপরাধবোধ নিয়ে থাকতে হয়। তাতে অনেক বেশি কষ্ট।

চন্দ্রজিৎ অবশ্য তা পেরে ওঠেনি। তাঁর সাজানো শান্তির সংসার, তাতে বজ্রাঘাত করার সাহস তাঁর হল কই?

সরোজা শেষ অবধি একটা কথাই তাঁকে বারবার বলেছিল, কনফেস, প্লিজ কনফেস। দুনিয়ার মুখোমুখি সোজা হয়ে দাঁড়াও। পশুপাখিরাও মিথ্যে কথা বলে না, মিথ্যাচার করে না। আমরা কি তাদের চেয়ে বেটার স্পিসিস নই?

কয়েক মাস আগে উসি অর্থাৎ সাঁইদাস কলকাতায় তার ব্যবসার কাজে এসেছিল। সে বরাবর কলকাতায় এলে চন্দ্রজিৎকে ফোন করে খুব সৌজন্য ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করে, খোঁজখবর নেয়। তাঁকে 'স্যার' বলে ডাকে বরাবর। সে খবর দিয়েছিল, সরোজা এখন আধ্যাত্মিক জীবনযাপন করে। কারও সঙ্গে তেমন সংযোগ রাখে

না। উসি যে আজ এসে সরোজাকে বহুদিন আগে তাঁর উপহার দেওয়া নেকলেসটা ফেরত দিয়ে গেছে সেটা এমনি নয়, তা চন্দ্রজিৎ বুঝতে পারছেন। নেকলেস ফেরত পাঠানোর মধ্যে সেই পুরোনো বার্তাই পাঠিয়েছে সরোজা, কনফেস, প্লিজ কনফেস। কনফেস করার কথা ইদানীং ভাবছিলেন চন্দ্রজিৎ। কিন্তু উপায় এবং সঠিক সময়টা নির্ধারণ করতে পারছিলেন না। আজ উত্তেজিত হয়ে আচমকা বলে দিয়েছেন। হয়তো এভাবে না হলে পেরে উঠতেন না কোনোদিন। হ্যাঁ, তাঁর মুখ দেখাতে লজ্জা করছে। ঘরের আলোটা জ্বালতেও হচ্ছে সংকোচ। তাঁর বৈধ ছেলে সত্রাজিৎ একটু বাদেই সব জেনে যাবে। ওরা সবাই ঘেন্না করবে তাঁকে। করুক। চন্দ্রজিৎ চিৎ হয়ে শুয়ে বাঁ হাতটা আড়াআড়ি চোখের ওপর চেপে চুপ করে শুয়ে রইলেন। আজ রাতে ওরা আর তাঁকে ডিস্টার্ব করবে না। এখন ওদের অনেক রাত অবধি মিটিং হবে। যা হওয়ার হোক। তবে তাঁর রাগটা কমে গিয়ে শরীর অবসন্ন লাগছে।

## ৫

ঘরদোরে কতকাল ঝাঁটপাট পড়ে না। ঘরখানা পাকাই করেছিল বটে শ্রীপতি। ওপরে নতুন টিন। ঝাড়লে মুছলে একটু ছিরি ফিরত। তা কে আর ওসব ঝঞ্ঝাট করতে যাবে! বাস্তুজমি ছিল বাগান সমেত দু—বিঘের ওপর। তার দুই সাদা গয়াপতি আর পশুপতি নিজেদেরটা আলাদা করতে গিয়ে তাকে মোটে পাঁচ কাঠা ছেড়েছে। চাষের জমি বিঘে দশেক আছে বটে, কিন্তু দেখাশুনো না করলে, নিজে না গত খাটালে আয়পয় তেমন নেই। চারটে ভ্যানগাড়ির মধ্যে একটার চাকা ভেঙে কেতরে পড়ে আছে উঠোনের কোণে, তিনটে বন্দোবস্তে দিয়েছে। কিন্তু আদায় উশুল করার তাগিদটাই নেই বলে কেউ তেমন পয়সা ঠেকায় না। দুপুরে ঘরে বসে সাত পাঁচ ভাবছিল শ্রীপতি। মাসির কথামতো একটা পোস্টাকার্ড জোগাড় করে মনসাকে একটা চিঠিও লিখেছে সে। একটা লাইনে একথাও লিখেছে, মাসি আবার আমার বিয়ে দেওয়ার কথা বলছে। আমি বলি, সে কি হয়?

কিন্তু চিঠিটা পোস্ট করেনি সে। পকেটে থেকে থেকে পোস্টকার্ডটা নেতিয়ে গেছে। চিঠিটা পোস্ট করা উচিত হবে কি না সেটাই বুঝে উঠতে পারছে না সে। চিঠি দেওয়াটা বোধহয় ঠিক হবে না। সর্বনাশটা করেছিল বিশ্বাসদাদা। কোরাকাঠির মানুষ। কলকাতায় কোনো ঠিকাদারের রাজমিস্তিরি, যে বাড়িতে মনসা কাজ করে সেই বাড়িখানায় কাজ করেছিল। সেই সূত্রে বাড়ির গিন্নিমার সঙ্গে ভাব হয়। গিন্নিমা গাঁ থেকে একটা খাটিয়ে পিটিয়ে কাজের মেয়ে এনে দিতে বলেছিল তাকে। সেই যে মনসাকে কাজে ঢোকাল তারপর বিশ্বাসদাদার আর দেখা নেই। দেখা হলে শ্রীপতি একবার জিজ্ঞেস করত, তার নতুন বিয়ের বউটাকে অমন লোভ দেখিয়ে ঘরছাড়া করাটা কি ঠিক হয়েছে বিশ্বাসদাদার? গাঁ ঘরের মেয়ে, বড়লোকের বাড়ির ব্যবস্থা দেখে মাথা ঘুরে গেছে।

ঘরে ইঁদুর দৌড়োদৌড়ি করছে খুব। চৌকির নীচে চালের বস্তা আছে কয়েকটা। সেইখানেই যাতায়াত। গ্রীষ্মে বর্ষায় সাপও ঢোকে। ওসব তেমন গ্রাহ্য করে না শ্রীপতি। মনটা বড্ড এলিয়ে পড়েছে। নইলে এক সময়ে সে অসুরের মতো খাটত। বাস্তুজমিটা ছাড়া বাপের তো তেমন কিছু পায়নি সে। মাইক ভাড়া দিয়ে, ভ্যান চালিয়ে নৌকোয় মালামাল পার করে উদয়াস্ত খেটে পাকা ঘর, জমিজিরেত করেছিল। সেই অসুরটা যে কোথায় গিয়ে গা—ঢাকা দিল, কে জানে! এখন পড়ে আছে শুধু খোলটা।

বাইরে থেকে কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে, শ্রীপতিবাবু আছেন নাকি! শ্রীপতিবাবু!

গলাটা চেনা নয়। এ তল্লাটে তাকে বাবু বলে ডাকেই বা কে? শ্রীপতি বাইরে এসে দেখল, পাতলা চেহারার একজন তার বয়সি ছেলেই দাঁড়িয়ে আছে। চারদিক চেয়ে চেয়ে দেখছে। দেখার মতোই দৃশ্য বটে। সারা উঠোন জুড়ে গাছের পাতা, ছোট ছোট শুকনো ডালপালা, খড়কুটো পড়ে আছে। ঝাঁট পড়েনি, নিকোনো হয়নি।

তুলসী মঞ্চে তুলসী গাছটা শুকিয়ে কঙ্কাল হয়ে দাঁড়িয়ে। জল দেওয়া হয়নি গাছে।

কাকে খুঁজছেন?

আপনিই কি শ্রীপতিবাবু?

হ্যাঁ।

ছোকরা ভারী সুন্দর হাসল। বলল, বাড়িতে ঢুকে চারদিকে দেখে মনে হচ্ছিল, বাড়িতে বহুকাল কেউ নেই বুঝি!

শ্রীপতি হেসে বলল, না থাকার মতোই আছি।

আমার নাম দুলাল দাস। কলকাতা থেকে আসছি। গোসাবার দিকে বাড়ি। তা দেশেই যাচ্ছিলাম। ভাবলাম একবারটি দেখা করে যাই। কলকাতা থেকে আসছে শুনে শ্রীপতি একটু খাতির করে বলে, তা ভিতরে এলে হয়।

ভিতরে এলে হয়।

ভিতরেই ভালো। একটু কথা আছে।

লোহার চেয়ারটায় ছোকরাটাকে বসিয়ে নিজের চৌকির বিছানাটায় বসল শ্রীপতি। ছোকরা ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘরটা দেখছিল। ঝুল, মাকড়সার জাল, মেঝেময় ধুলো, বিছানায় ময়লা চাদর। দেখার মতোই ব্যাপার।

ছেলেটা তার দিকে চেয়ে বলল, আর কেউ থাকে না বুঝি? না। আমি একা।

ছোকরা একটু চুপ করে বসে কী যেন ভেবে নিয়ে বলল, দেখুন, আমি একটু বিপদে পড়ে এসেছি। দোষঘাট ধরবেন না। শুনেছি, আপনি লোক বড় ভালো, তাই সাহস করে এসেছি।

আমি ভালো লোক কে বলল?

কোরাকাঠির শীতল বিশ্বেসকে চেনেন তো!

শীতল বিশ্বেসকে না চিনে উপায় কি শ্রীপতির। সে—ই তো নষ্টের গোড়া, সে মাথা নাড়া দিয়ে বলল, চিনি।

শীতলদা ভরসা দিয়ে বলেছিলেন, তুমি শ্রীপতির কাছে যাও। সে বড় ভালো লোক।

নিজের প্রশংসা শুনতে এখন বিশেষ ভালো লাগছিল না শ্রীপতির। সে মাথা নিচু করে বলল, কথাটা কী?

বলছি। আমি কাঠের মিস্তিরি। গাঁয়ে কদর নেই, বাজারও নেই, তাই কলকাতায় গিয়ে বসেছি। বলতে নেই, সেখানে এখন আমার মেলা কাজ। বালিগঞ্জে একটা বাড়ির কাঠের কাজ করতে গিয়ে শীতলদার সঙ্গে আলাপ। কথায় কথায় তার কাছে কিছু কথা ভেঙে বলে ফেলেছিলুম। তাতে ফের অনেক কথা জানা হল। আপনার কথাও। শ্রীপতি চেয়ে রইল চুপ করে। তার যেন মনে হচ্ছিল এরপর একটা ধাক্কা আসবে।

ছোকরা ফের একটু ফাঁক করে দিয়ে বলল, আমি সল্ট লেকের ডিডি ব্লকে একটা বাড়িতে থাকি। লাহিড়ীদের বাড়ি। চেনেন তো!

চিনি। ও বাড়িতে—

ছোকরা হাত তুলে তাকে থামিয়ে বলল, দোষঘাট নেবেন না কিন্তু। ও বাড়িতে এই অঞ্চলের একটা মেয়ে কাজ করে। নাম পিয়ালি। গিন্নিমা তার সঙ্গে আমার বিয়ে দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। মেয়েটিও বড় ভালো। চেহারা, স্বভাব, সহবৎ সব দিক দিয়েই অমন মেয়ে হয় না। শ্রীপতির মুখটা একটু হাঁ হয়ে গেল। কথাই এল না মুখে।

ছেলেটা একটু হেসে বলল, কুমারী মেয়ের মতোই থাকে। আমি তো কিছু বুঝতেও পারিনি। তাই আমিও বিয়েতে মত করলুম। কিন্তু মেয়েটা শুনে কেমন গুম মেরে গেল। কাটা কাটা কথা কইল। এমনটা হওয়ার কথা নয়। বলতে নেই, আমার হাতের কাজ ভালো। ভগবানের দয়ায় ভালোই কামাই হয়। শিগগিরই দোকান দেব। আমার মনে হয়েছিল পিয়ালি বর্তে যাবে। কিন্তু সে তেমন খুশি হল না শুনে। তবে দু—চারদিন বাদে যেন নিমরাজি মতো হল।

শ্রীপতি শূন্য চোখে চেয়ে বলল, 'ও'।

আজ এই দিন চারেক হল শীতলদার সঙ্গে আলাপ। কোথায় থাকি জিজ্ঞেস করায় যখন লাহিড়ীবাড়ির কথা বললুম তখন শীতলদা লাফিয়ে উঠল, ও বাড়িতে তো আমিও কাজ করেছি। এখন কথায় কথায় মনসাবালার সব কথা বেরিয়ে পড়ল। আমার তো মাথায় হাত! না জেনে একটা কাজ করে ফেলেছি। তখন শীতলদা বলল, দ্যাখো বাপু, আমি শ্রীপতির মাসির কাছে শুনে এসেছি, সে আবার শিগগির বিয়ে বসবে। পিয়ালির তো ফেরার লক্ষণ নেই। তা যদি হয় তবে তোমার পিয়ালিকে বিয়ে করার কথা পরিষ্কার। তবে কথাটা আমার বিশ্বাস হয়নি। তুমি বরং গিয়ে শ্রীপতির কাছে জেনে এসো।

তাই জানতে এসেছেন?

হ্যাঁ। গত সাতদিন পিয়ালির সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। সে মোটে আমার সঙ্গে দেখাই করতে চায় না। ডাকলে সাড়া দেয় না। ওপর থেকে নীচে নামে না। মনে হয় দোটানায় আছে। আপনি যে বিয়ে করছেন, এ খবর কি সে জানতে পেরেছে? শ্রীপতি হেসে বলে, খবর তো আমিই জানি না।

ভারী অবাক হয়ে দুলাল বলে, তাহলে কি কথাটা সত্যি নয়? না। তবে পিয়ালির যদি আপনাকে বিয়ে করার ইচ্ছে হয় তবে করবে।

দুলালের মুখ ভারী উজ্জ্বল হল, রাগ করলেন না তো, ভাই?

শ্রীপতি ম্লান হেসে বলে, রাগারাগির ব্যাপার তো নয়। গায়ের জোরে তো সব দখল করা যায় না। আমার সে সাধ্যও নেই। না দুলালবাবু, আমার দিকে কোনো দাবিদাওয়া নেই। যান, বিয়ে করে সুখে থাকুন গে।

আপনার মতো মানুষ দেখিনি শ্রীপতিবাবু। শীতলদা বলেছিল বটে আপনি মানুষ ভালো। কিন্তু এতটা ভালো তা বুঝতে পারিনি। শ্রীপতি মৃদু হেসে বলে, মনসার কাছে যাব—যাব করছিলাম কয়েকদিন ধরে। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আর যাওয়ার দরকার নেই। কী বলেন?

দুলাল মাথাটা নিচু করে রইল। বোধহয় লজ্জা হয়েছে। তারপর খুব সংকোচের সঙ্গে পকেট থেকে একখানা মাঝারি ডায়েরি আর সস্তা ডটপেন বের করে শ্রীপতির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, কটা কথা লিখে দেন।

কী কথা?

আপনার যে আপত্তি নেই। সেই কথাটা পিয়ালি নইলে ঠিক বিশ্বাস হবে না।

শ্রীপতির হাত কাঁপল না। সুন্দর গোটা গোটা অক্ষরে সে ডায়েরির পাতায় লিখে দিল, কল্যাণীয়া মনসা, দুলালবাবুকে তুমি বিয়ে করতে পারো। আমার কোনো আপত্তি নেই। ইতি।

ডায়েরিটা পকেটে রেখে দুলাল বলল, আপনার চেয়ে বয়সে বোধহয় আমি বড়ই হব, নইলে পায়ে হাত দিয়ে একটা প্রণাম করে যেতাম। ছিঃ ছিঃ। ও কথা শুনলেও পাপ হয়। আপনি আসুন। নিশ্চিন্তে আসুন।

দুলাল চলে যাওয়ার পর মনটা বড্ড ফাঁকা হয়ে গেল শ্রীপতির।

সামনের জীবনটা যেন ধু ধু করছে। মনসাকে লেখা পোস্টকার্ডখানা বের করে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ল সে। তারপর ছিন্ন টুকরোগুলো মুঠোয় নিয়ে বসে রইল চুপ করে।

দিনটা কেটে গেল একটা ঘোরের মধ্যে। রাতটা কাটল দুঃস্বপ্ন দেখে। বিটকেল সব স্বপ্ন।

দুটো দিন কাটল ভারী কষ্টে। মনটা যেন কেমন কুয়োর মধ্যে পড়ে আছে। মাথাটা কেন যেন পাগল—পাগল। জীবনের একটা কপাট বন্ধ হয়ে গেল তো! সে কপাট আর খুলবে না কখনও। হয়তো এই ভালো হল। এখন নিশ্চিন্তে থাকা যাবে।

দু—দিনের মাথায় বেলা এগারোটা নাগাদ মদনার দোকানের বেঞ্চে বসেছিল শ্রীপতি। মদনা খদ্দের সামলাচ্ছিল। হঠাৎ হেকে বলল, ওরে শ্রীপতি, পটল গায়েন একটা চিঠি রেখে গেছে তোর নামে।

পটল গায়েন! সে কে?

পিয়ন। তোর খোঁজ করছিল কাল। চিঠি আছে। আমি বললুম, এখন তাকে বাড়িতে পাবে না, আমার কাছে রেখে যাও, দিয়ে দেব। শ্রীপতি পোস্টকার্ড হাতে নিয়ে দেখল, আঁকাবাঁকা কাগের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং অক্ষরে লেখা, শ্রীচরণেষু হ্যাঁ গো, তুমি শিগগির একবার আসবে? ভীষণ দরকার, চিঠি পেয়েই আসবে কিন্তু। দেরি করবে না, মা কালীর দিব্যি। ইতি মনসা।

চিঠিটা হাতে নিয়ে বজ্রাহতের মতো বসে রইল শ্রীপতি। মনসা, মনসা ডাকে কেন? সব তো চুকেবুকে গেল। তবে ডাকে কেন? চটকা ভেঙে সে উঠে পড়ল, বলল, মদনদা, দুশোটা টাকা হাওলাত দেবে? বড্ড দরকার।

মদন অবাক হয়ে বলে, দেব না কেন? নিয়ে যা, বলি চললি কোথায়?

ঘাটের দিকে দৌড়তে দৌড়তে শ্রীপতি বলল, কলকাতায়। পৌঁছতে বেলা প্রায় দুটো হল। ডোরবেল বাজানোর পর মাত্র কয়েকবার চোখের পাতা ফেলতে না ফেলতেই দরজা খুলে সামনে দাঁড়াল মনসা। আলুথালু চুল, চোখ বড় বড়। মুখখানা শুকনো, কেমন অবাক অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে বড় বড় শ্বাস ফেলছে। তারপরই হঠাৎ তার দু—হাত ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলল, কেমন পুরুষ তুমি? কেমন পুরুষ? নিজের বউকে পরের বাড়িতে ফেলে রাখতে লজ্জা করে না তোমার? লজ্জা করে না?

শ্রীপতি এমন অবাক যে বাক্যস্ফূর্তি হচ্ছে না।

টপটপ করে দু—চোখ থেকে জল পড়ছে মনসার। নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছে কান্নায়, এক্ষুনি তুমি আমাকে এই যক্ষের পুরী থেকে নিয়ে চলো, এক্ষুনি! আমি আর এক লহমাও থাকব না এখানে! শ্রীপতির বড় ভোম্বল লাগছে মাথাটা, কিচ্ছু বুঝতে পারছে না।

তাকে কথা বলতে দিলও না মনসা, তার চোখের দিকে চেয়ে উদ্ভ্রান্ত মুখে বলল, এরা ভীষণ খারাপ! ভীষণ! নোংরা ঢেকে বাবু বিবি সেজে থাকে। কেন এখানে ফেলে রেখেছিলে আমাকে? কেন?

শ্রীপতি শুধু কোনো রকমে বলতে পারল, নিয়ে যেতেই তো আসি, তারপর ফিরে যাই।

আর নয়! আর এক মুহূর্ত নয়! দু—মিনিট দাঁড়াও, আমি আসছি। বলে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল মনসা, একটু বাদেই তরতর করে নেমে এল নীচে। এক হাতে একটা সুটকেস বগলে একটা পুঁটুলি।

চলো, চলো, আর দেরি নয়।

এই তাড়াহুড়োয় শ্রীপতির শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। বড্ড জোর পায়ে হাঁটছে মনসা। শ্রীপতি তাল রাখতে পারছে না। সাজেওনি ভালো করে। চুল এখনও আলুথালু, চোখের নীচের জলের দাগ। মনসা একটা ট্যাক্সি দাঁড় করাল। বলল, ওঠো।

শ্রীপতি ভারী আতঙ্কিত হয়ে বলে, ট্যাক্সিতে কোথায় যাবে?

ধামাখালি।

ওরে বাব্বা, সে যে অনেক ভাড়া লাগবে।

লাগুক। আমার টাকাগুলো দিয়ে কি আমার শ্রাদ্ধ হবে? ওঠো তো। তিন দিন আগেই ব্যাংক থেকে সব টাকা তুলে রেখেছি। অনেক টাকা।

শ্রীপতির যে কেমন লাগছে সে নিজেই বুঝতে পারছে না।

পাশাপাশি বসে সে একটা গভীর স্বস্তির শ্বাস ছেড়ে চোখ বুজল। ঠেলা দিয়ে মনসা বলল, ঘুমোবে না। কথা বলো, আমার কত কথা জমে আছে।

ঘুমোচ্ছি না, গো। ঠিক যেন বিশ্বাস হচ্ছে না। দুলালবাবু নামে একজন এসেছিল আমার কাছে ক—দিন আগে।

জানি। সে আমাকে বিয়ে করতে চায়। শোনো, নিজের জিনিস যদি পাহারা দিয়ে না রাখতে পারো তবে শেয়াল শকুনে ছিঁড়ে খেতে চাইবেই। বুঝেছ?

শ্রীপতি হঠাৎ টের পেল তার ভিতরকার যে অসুরটা ফেরার হয়ে গিয়েছিল সে হঠাৎ কোন ফাঁকে ফিরে এসে ভিতরে সেঁদিয়েছে। তার ভিতরটা এখন ফুঁসছে, টগবগ করছে, লন্ডভন্ড হচ্ছে। একেবারে ভাসাভাসি কাণ্ড!

# অনুভব

সামনের বারান্দায় বসে খবরের কাগজ পড়তে পড়তেই হৃদয়ের সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি কাজ করল। কাগজটা মুখ থেকে সরিয়ে দোতলার বারান্দা থেকে নীচের মাঝারি চওড়া রাস্তার দিকে চেয়ে সে দেখল তার ছেলে মনীশ, নাতি অঞ্জন আর পুত্রবধূ শিমুল আসছে। দৃশ্যটি এই শরতের মেঘভাঙা উজ্জ্বল সোনালি রোদে ভারী চমৎকার দেখাচ্ছে। মনীশের পরনে গাঢ় বাদামি রঙের চৌখুপীওলা ঝকঝকে পাতলুন, গায়ে হালকা গোলাপি জলছাপওলা হাওয়াই শার্ট। লম্বাটে গড়নের, ফর্সা ও মোটামুটি স্বাস্থ্যবান মনীশকে বেশ তাজা ও খুশি দেখাচ্ছে। রাতে নিশ্চয়ই খুব ভালো ঘুমিয়েছে, স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া হয়নি এবং হাতে কিছু বাড়তি টাকা আছে। নাতির পরনে নীল চৌখুপী এবং ডোনাল্ড ডাকওলা বাবা স্যুট, শিমুলের শ্যামলা ছিপছিপে শরীরে আঁট হয়ে পেঁচিয়ে উঠেছে একটা বিশুদ্ধ দক্ষিণী রেশমের কাঁচা হলুদ রঙের চওড়া কালোপেড়ে শাড়ি।

দৃশ্যটা চমৎকার। মনীশের হাতে সন্দেশের বাক্স। শিমুলের কাঁধ থেকে ব্যাগ ঝুলছে। আজ রবিবার, ওরা সারাদিন থাকবে, সন্ধের পর বন্ডেল রোডের ফ্ল্যাটে ফিরে যাবে। মনীশ বাবাকে দেখতে পেয়ে হাত তুলে চেনা দিল। হৃদয়ও হাত তোলে। তারপর নিস্পৃহ হয়ে আবার ইজিচেয়ারে পিছনে হেলে বসে খবরের কাগজ দিকে তাকায়।

কিন্তু খবরের কাগজ পড়ে না হৃদয়। সে বসে তার সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি বা ইনস্টিংকট—এর কথা ভাবতে থাকে। এই যে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে হঠাৎ মনের মধ্যে একটা ইশারা জেগে উঠল আর হৃদয় দোতলার বারান্দা থেকে রাস্তায় তাকিয়ে দেখল সপরিবারে তার ছেলে আসছে, এ ব্যাপারটা তাকে বেশ খুশি করে। এমন নয় যে ছেলেকে দেখে তার আনন্দ হয়েছে। বরং এই এ রবিবারের আগন্তুক মনীশকে সে খুব একটা পছন্দ করে না। ওর বউ শিমুলকে আরও নয়। মনীশের বয়স এখন বছর পঁচিশেক হবে, হৃদয়ের ধারণা শিমুলের বয়স মনীশের চেয়ে অন্তত বছর দুই তিন বেশি। নাতি অঞ্জনকে এমনিতে খারাপ লাগে না, হৃদয়ের, তবে তার বাপ মা তাকে নিয়ে এত ব্যস্ত এবং সতর্ক যে হৃদয় তার সম্পর্কে খুব আগ্রহ বোধ করে না আজকাল। একটু ক্যাডবেরী কি সন্দেশ হাতে দিলেও অঞ্জনের বাপ মা সমস্বরে 'ওয়ার্মস ওয়ার্মস' বলে আঁতকে ওঠে। আরে বাবা, কৃমি কোন বাচ্চার নেই? তা বলে কি বাচ্চারা মিষ্টি খাচ্ছে না? অন্য কেউ স্নান করালে নাকি ছেলের ঠান্ডা লাগে বলে শিমুলের ধারণা। এ বাড়িতে এসেই ছেলের জন্য শিমুল ফি রবিবার হাফ বয়েল্ড ডিম আর সবজির স্টু বানানোর বায়না ধরবে। অত যত্নের ছেলেকে ছুঁতে একটু ভয় করে হৃদয়ের অরা ভয় করলে ভালোবাসা বা স্নেহটা কিছুতেই আসতে চায় না।

কিন্তু হৃদয় তার ছেলে এবং ছেলের পরিবারকে দেখে খুশি হোক বা না হোক, এই প্রায় পঞ্চাশ বছরের কাছাকাছি বয়সে নিজের সূক্ষ্ম বোধশক্তি দেখে কিছু তৃপ্তি পেয়েছে। বলতে কি, এই ইনস্টিংকট যে তার কাছে এ বিষয়ে বরাবর যে নিঃসন্দেহ ছিল। সেবার জামসেদপুর যাওয়ার সময় তার কামরায় টি টি একটা বিনা টিকিটের ছোকরাকে ধরেছিল। ছোকরা বার বার তার এ পকেট ও পকেট খুঁজে রাজ্যের কাগজপত্র, নোটবই, রুমাল খুঁজে খুঁজে হয়রান। বলছে—টিকিটটা ছিল তো। পকেটেই রেখেছিলুম! কেউ বিশ্বাস করছিল না অবশ্য। টি টি তাকে বাগনানে নামিয়ে জি আর পি—তে দিয়ে দেবে বলে শাসাচ্ছে। ছোকরা তখন হৃদয়ের দিকে চেয়ে সাদা মুখে বলেছিল—দাদা, ঝাড়গ্রাম স্টেশনের কাছেই আমরা দোকান, আমার ভাড়াটা দিয়ে দিন, আমি ঝাড়গ্রাম নেমে ছুটে গিয়ে টাকা এনে দিয়ে দেব আপনাকে। হৃদয়ের ইনস্টিংকট তখনই বলেছিল যে, এ ছোকরা মিথ্যে বলছে না। চোখে মুখে সরল সত্যবাদিতার ছাপ ছিল তার। টিকিটও হয়তো কেটেছিল। কিন্তু ইনস্টিংকটকে উপেক্ষা করেছিল হৃদয়। ভেবেছিল, যদি আহাম্মকের মতো ঠকে

যাই? পরে অবশ্য ছোকরা সেই কামরাতেই খুঁজে পেতে তার ঝাড়গ্রামের চেনা লোক বের করে ভাড়া মিটিয়ে দেয় এবং হৃদয়ের কাছে এসে এক গাল সরল হাসি হেসে বলে—দাদা, পেয়ে গেছি। শুনে মনটা বড় খারাপ হয়ে গিয়েছিল হৃদয়ের। সে তো জানত, মুখ দেখেই তার সূক্ষ্ম অনুভূতিবলে টের পেয়েছিল, ছোকরা মিছে কথা বলছিল না। তার সেইটুকু উপকার সেদিন করতে পারলে আজ এই সুন্দর সকালের সোনালি রোদটুকুকে আর একটু বেশি উজ্জ্বল লাগত না কি তার কাছে!

ওরা দোতলায় উঠে এসেছে টের পাচ্ছিল হৃদয় তার বউ কাজল দরজা খুলে নানারকম অভ্যর্থনা ও আনন্দের শব্দ করছে। করবেই। ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই মনীশই যা একটু আধটু আসে। আর সবাই দূরে। মেজো ছেলে অনীশ আমেরিকায়, ছোট ক্ষৌণীশ তার মেজদার পাঠানো টাকায় দেরাদুন মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে পড়ছে। একমাত্র মেয়ে অর্পিতা বোম্বাইয়ে স্বামীর ঘর করে। এ বাসায় কাজল আর হৃদয়, হৃদয় আর কাজল। শুনতে বেশ। কিন্তু আসলে যৌবনের সেই প্রথমকাল থেকেই কোনোদিন কাজলের সঙ্গে বনল না হৃদয়ের। ফুলশয্যার রাতেই কাজল প্রথম আলাপের সময় বলেছিল—আমি কিন্তু গানের ক্ষতি করতে পারব না তাতে সংসার ভেসে যায় যাক। তখনই হৃদয়ের ইনস্টিংকট বলেছিল—একথাটা এই রাতে না বললেও পারত কাজল বিয়েটা হয়তো সুখের হবে না।

হয়ওনি। কাজল গান ছাড়েনি। এখনো রেডিয়তে মাঝে মাঝে গায়, দু—একটা গানের স্কুলে মাস্টারি করে। প্রাইভেটে শেখানো তো আছেই। কিন্তু ফুলশয্যার রাতে তার কথা শুনে যেমন মনে হয়েছিল এ মেয়ে বোধহয় লতা মঙ্গেশকর হবে তেমনটা কিছুই হয়নি। বরং অতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশে জীবনে কিছু জটও পাকিয়েছে কাজল। তাকে বিভিন্ন ফাংশানে চানস দিতে পারে বলে কিছু প্রভাবশালী লোকের খপ্পরে পড়ে নিজেকে নষ্ট করেছে। হৃদয় কানাঘুষো শুনেছে, কাজল নিজের পবিত্রতা বজায় রাখে না। এখানেও সেই ইনস্টিংকট ছোটো ছেলে ক্ষৌণীশকে কোনো দিনই নিজের ছেলে বলে ভাবতে পারে না হৃদয়।

মনীশ বারান্দায় এসে পাশের টুলের ওপর হৃদয়ের অভ্যস্ত ব্র্যান্ডের এক প্যাকেট সিগারেট আর এক বাক্স ভোটা দেশলাই রেখে বলে—কেমন আছো বাবা?

হৃদয় আজকাল কথা বলতে ভালবাসে। কিন্তু কথায় ভেসে যেতে ভারী ভয় হয় তার। সূক্ষ্ম অনুভূতি তাকে সাবধান করে দেয়, কথা বলো না, বেশি কথা বললেই ওরা বিরক্ত হবে। ভাববে তুমি বুড়ো হয়েছো। তোমার ব্যক্তিত্ব নেই।

হৃদয় সতর্ক হয়। এত বেশি সতর্ক হয় যে মুখই খোলে না। ঘাড় নেড়ে জানায় ভালো।

অনীশ আমেরিকা থেকে আর ডাক্তার দাদার জন্য খুবই আধুনিক ধরনের একটা ব্লাড প্রেসারের যন্ত্র পাঠিয়েছে। সেটা প্রতিবারই সঙ্গে আনে মনীশ। আজও এনেছে। টুলের ওপর রেখে হাত বাড়িয়ে বলল—হাতটা দাও, প্রেসারটা দেখি।

হৃদয় মাথা নাড়ে, না। খামোখা দেখ। হৃদয়ের প্রেসারের কোনো গন্ডগোল নেই। তেমন কিন্তু বয়সও হয়নি তো তার। মোটে সাতচল্লিশ। একুশ বছর বয়সে সে বিয়ে করেছিল মায়ের বায়নায়। বাইশ বছর বয়সে মনীশ হয়। এখনো হৃদয়ের চেহারা ছিপছিপে, পঁয়ত্রিশ ছত্রিশের বেশি দেখায় না। চুল এখানো বেশ কুচকুচে কালো, চলাফেরা যুবকের মতো চটপটে। বয়সের বিন্দুমাত্র ছাপ নেই। তবে যে মনীশ প্রায়ই তার প্রেসার দেখে সেটা একরকম তোষামোদ ছাড়া আর কিছুই নয়। বাপকে সে কোনো দিনই রোজগারের পয়সা দেয় না।

মনীশ চাপাচাপি করল না, তবে কৌতূহলভরে মুখের দিকে চেয়ে বলল—তোমার মেজাজটা আজ খারাপ নাকি?

বারান্দার ওদিকটায় নাতি কোলে করে কাজল এসে দাঁড়াল। 'ওই দেখ, ওই দেখ বলে রাস্তায় আঙুল দিয়ে কী একটু দেখিয়ে ফিরে চাইল হৃদয়ের দিকে। বেশ কোমল গলায় বলল—দেখাও না প্রেসারটা। দেখাতে দোষ কি?

হৃদয় তার প্লাস পাওয়ারের চশমাটা খুলে কোলের ওপর রেখে বিতর্কের জন্য প্রস্তুত হয়ে ঠান্ডা গলায় বলে—কেন দেখাবো?

এই স্বর চেনে কাজল। ভ্রূ কুঁচকে স্বামীর দিকে চায়। তার মুখের রেখা কঠিন হয়ে ওঠে। বলে—থাক, থাক, দেখাতে হবে না।

মনীশ খুব চালাকের মতো বলে—বাবা, ডোন্ট মাইন্ড। জাস্ট চেক আপ করতে চেয়েছিলাম। জাস্ট চেক আপ, তা ছাড়া কিছু নয়।

কাজল ধমকে দেয়—থাক তোকে দেখতে হবে না। যে চায় না তারটা দেখবি কেন?

হৃদয়ের ইনস্টিংকট বলল, আজকের দিনটা ভালো যাবে না। হয় দুপুরে, নয়তো রাত্রে একটা তুমুল ঝগড়া লাগবে কাজলের সঙ্গে। লাগবেই।

কাজল নাতিকে নিয়ে এবং মনীশ তার যন্ত্র নিয়ে ঘরে ফিরে যায়। হৃদয় বসে থেকে খবরের কাগজে চোখ বোলায়। জনতা গভর্নমেন্ট হয়তো বেশি দিন টিকবে না। ইন্দিরাও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ক্ষমতা ফিরে পাবে বলে মনে হয় না। তাহলে নাইনটিন এইট্টিতে ভারতবর্ষ শাসন করবে কে? ভূতে?

যে যুবতী মেয়েটি তাদের রান্না করে সে এসে টুলের ওপর এক কাপ চা রাখল। মেয়েটির দিকে কোনোদিনই খুব ভালো করে তাকায় না হৃদয়। তাকাতে ভরসা হয় না। মেয়েটির বয়স ছাব্বিশ কি সাতাশ হবে। স্বামী নেয় না বলে কসবায় বাপের বাড়িতে থেকে কাজ করে খায়। এ বাড়িতে দুবেলা রাঁধে, সারা দিন নানা কাজ করে, সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে যায়। মাইনে পঁচাত্তর টাকা। রাঁধে অবশ্য খুবই ভালো। ইংলিশ ডিনার থেকে মাদ্রাজি ইডলি দোসা সবরকম খাবার করতে পারে। কিন্তু সেটা কোনো যোগ্যতা নয়। আসল যোগ্যতা হল, ওর বয়স। চমৎকার বয়স। চেহারাখানা রোগাটে হলেও খাঁজকাটা শরীরের একটা লাবণ্য আছে। মুখখানা মোটামুটি। আগে উলোঝুলো ঝি—র আসত। এখন সাজে। পরিপাটি করে বাঁধা চুল, চুলে লাল নীল ফিতে, কপালে টিপ। হৃদয়ের সামনে আসবার আগে মুখখানা যে আঁচল দিয়ে ভাল করে মুছে আসে তা হৃদয় ইনস্টিংকট দিয়ে টের পায়।

আজও পেল। খবরের কাগজের পাতায় কোনাচে একটা খুনের খবরে চোখ রেখেও হৃদয় বুঝতে পারে ললিতা তার দিকে খুব নিবিড় চোখে চেয়ে আছে। একটু চাপা গলায়, যেন গোপন কথা বলার মতো করে বলল—আপনার চা।

গভীর শ্বাস ছেড়ে হৃদয় বলে—হুঁ।

লক্ষ্য করেছে হৃদয়, বয়সে যথেষ্ট ছোট হলেও ললিতা তার বউকে বউদি আর তাকে দাদা বলেই ডাকে। আবার মনীশ আর তার বউকে বলে বড়দা আর বড়বউদি। কাজল বলে বলেও তাকে আর হৃদয়কে মাসি মেসো গোছের কিছু ডাকাতে পারেনি ললিতাকে দিয়ে। এ সবই একরকম ভালো লাগে হৃদয়ের। একটা গোপন অবৈধ তীব্র অনুভূতি। ললিতা তাকে মেসো বলে ডাকলে হয়তো এই অনুভূতিটা হত না তার।

কাজল গানের স্কুল বা টিউশনিতে যায়। ছুটির দিনে ফাঁকা বাড়িতে কত দিন একাই থাকে হৃদয় আর ললিতা। কোনোদিন হৃদয় সচেষ্ট হয়নি। ললিতাও না। তবে দুজনকে ঘিরে একটা তীব্র অনুভূতির বৃত্ত যে বরাবর তৈরি হয়েছে এটা ইনস্টিংকট দিয়ে কতবার টের পেয়েছে হৃদয়। কিন্তু বাইরে ভালোমানুষ এবং ভিতরে এক শয়তান হয়ে বেঁচে থাকা ছাড়া সে আর কীই বা করতে পারে?

হৃদয়ের আর কিছুই বলার ছিল না। ললিতা চলে গেল। কিন্তু হৃদয়ের কেমন যেন মনে হয়, ললিতা আজ তার কাছ থেকে কিছু শুনতে চায়। কিন্তু হৃদয়ের যে বলার মতো কথা নেই। জীবনে অন্তত একবার খারাপ হওয়ার বড় ইচ্ছে তার। কিন্তু কিছুতেই একটা মানসিক ব্যারিকেড ডিঙিয়ে যেতে পারে না।

এই ব্যারিকেড অনায়াসে ভেঙেছে কাজল। যতই বুঝতে পেরেছে যে, স্বাভাবিক পথে গানের জগতে সে ওপরে উঠতে পারবে না, ততই সে অলি গলি রন্ধ্রপথের সন্ধানে নিজেকে সস্তা করেছে। হৃদয়ের সঙ্গে সম্পর্কটা বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যেই বিষিয়ে যায়। তাই হৃদয় একসঙ্গে থেকেও কাজলকে বিশেষ নজরে

রাখেনি। কিন্তু টের পেয়েছে ঠিকই। তার ইনস্টিংকট কম্পাসের কাঁটার মতো নির্দেশ করে দিয়েছে। অনেক বছর আগে সন্ধেয় হৃদয় এমনি বারান্দায় বসে ঝুঁকে রাস্তা দেখছিল। তার দুপাশে কিশোর মনীশ আর কিশোরী অর্পিতা। হঠাৎ রাস্তার ভিড়ের মধ্যে সে কাজলকে ফিরতে দেখল। দৃশ্যটা নতুন কিছু নয়। প্রায়ই সন্ধে পার করে কাজল বাসায় ফেরে। তবু সেদিন নতমুখী, অন্যমনা কাজলের হেঁটে আসার ভঙ্গির মধ্যে কী দেখে তার ইনস্টিংকট নিঃশব্দে চেঁচিয়ে উঠল—অস্পৃশ্য! অস্পৃশ্য! তখন মনীশ আর অর্পিতা ভারী খুশির গলায় চেঁচিয়ে উঠেছিল—মা! কিন্তু কাজল ওপরের দিকে তাকায়নি। খুব অন্যমনস্ক ছিল।

সেই রাত্রেই শোওয়ার ঘরে হৃদয়ের জেরার কাছে প্রায় ধরা পড়ে কাজল। কিন্তু স্বীকার করল না কিছু, উলটে কত ঝগড়া করল। কিন্তু তাতে হৃদয়ের অনুভূতি বদলে গেল না।

এতদিন বাদে এই সুন্দর শরতের ভোরে সেই সব পুরোনো কথা মনটা ভারী এলোমেলো করে দিল। বাতাসে কোল থেকে উড়ে গড়িয়ে পড়ল খবরের কাগজের আলগা পাতা। গত তিন চার বছর ধরে একটানা কাজলের সঙ্গে তার সম্পর্কহীনতা চলছে।

হৃদয় উঠল। কারো সঙ্গে কথা বলল না। পায়জামার ওপর একটা পাঞ্জাবি চড়িয়ে, মানিব্যাগটা পকেটে পুরে বেরিয়ে এল। বেরোবার মুখে শুনতে পেল তিনটে শোওয়ার ঘরের মধ্যে যেটা সবচেয়ে ভালো সেই পূর্ব—দক্ষিণ কোণের ঘরে মনীশ আর কাজল কথা বলছে। অঞ্জনকে ভিতরের ডাইনিং স্পেসে খাওয়াতে বসিয়েছে শিমুল। শিমুলকে ভালো করে চেনেও না সে। একদিন মনীশ ওকে রেজিস্ট্রি বিয়ে করে নিয়ে এসেছিল প্রণাম করাতে। সেই প্রথম দেখা। সামাজিক মতে একটু বিয়ের অনুষ্ঠান হয়েছিল পরে। তারপর থেকে ওরা আলাদা। শিমুল শ্বশুরকে দেখে নড়ল না। একটু ভদ্রতার হাসি হেসে বলল—ভালো তো?

হৃদয় ভ্রূ কোঁচকায়। এরা কারা, কোত্থেকে এল তা যেন ঠাহর পায়। এত অনাত্মীয় এরা যে কথার জবাব পর্যন্ত দিতে ইচ্ছে করে না তার। দিলও না হৃদয়। ভিতরের বারান্দায় এসে সিঁড়ির দিকে পা বাড়ানোর সময় একবার অভ্যাসবশে রান্নাঘরের দিকে এক ঝলক তাকাল সে। ললিতা প্রেশার কুকারের স্টিম ছাড়ছে। ধোঁয়াটে বাষ্পের মধ্যে আবছা দেখায় তাকে। তবু দুখানা চোখের কৌতূহল ভরা দৃষ্টি স্পর্শ করে হৃদয়কে। কাউকে কিছু বলে আসেনি হৃদয়। কিন্তু কে জানে কে ললিতার দিকে চেয়ে বলল—আমি একটু বেরোচ্ছি।

ললিতা তাড়াতাড়ি প্রেসার কুকার রেখে উঠে আসে। মুখে ঘেমো ভাব, চুল কিছু এলোমেলো, অকপটে চেয়ে থেকে বলল—ফিরতে কি দেরি হবে?

—হতে পারে।

ললিতা কিছু বলল না। কিন্তু সিঁড়ির রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল, যতক্ষণ হৃদয় না চোখের আড়ালে গেল।

পুরোনো আড্ডা সবই ভেঙে গেছে। বাইরের পৃথিবীটা এখন আর আগেকার মতো নেই। বড্ড পর হয়ে গেছে সব। এখন হৃদয়ের সবচেয়ে প্রিয় জায়গা হল তার দোতলার ফ্ল্যাটের সামনের বারান্দাটুকু। এ গ্রেড ফার্মে সবচেয়ে উঁচু থাকের কেরানি হিসেবে তাকে অফিসে অনেকক্ষণ কাজ করতে হয়। সেটুকু সময় বাদ দিয়ে বাকি দিনটুকু সে বসে থাকে বারান্দায়। বেশ লাগে। অনেক মাইনে পায় হৃদয়। ওভারটাইম নিয়ে হাজার দুই আড়াই কি কখনো তারও বেশি। পুজোর মাসে দেদার বোনাস পেয়েছে। সবটা তার খরচ হয় না। কাজলেরও আর খারাপ নয়। দুজনের বনিবনা নেই বলে কাজল তার কাছে বড় একটা বায়না বা আবদার করে না। তাই হাতে বেশ টাকা হৃদয়ের। কিন্তু সেই টাকা খরচ করার পথ পায় না সে। কী করবে? মদ খেতে রুচি হয় না। জামা কাপড়ের শখ নেই। জিনিস কেনার নেশা নেই। কী করবে তবে?

বুক পকেটে মানিব্যাগটা টাকার চাপে ফুলে হৃৎপিণ্ডটা চেপে ফুলে হৃৎপিণ্ডটা চেপে ধরেছে। ভারী লাগছে। ব্যাগে কত টাকা আছে তার হিসেব নেই হৃদয়ের। কয়েক শো হবে। হাজার খানেকের কাছাকাছিও হতে পারে।

চওড়া গলি পার হয়ে কালীঘাটের উলটোদিকে রসা রোডে এসে দাঁড়ায় হৃদয়। লক্ষ লক্ষ লোক ছুটি আর রোদে বেরিয়ে পড়েছে। কোথায় যাচ্ছে তা ভেবে পাওয়া শক্ত। মোটামুটি সকলেরই কোনো না কোনো গন্তব্য রয়েছে যা হৃদয়ের নেই। চারদিকে এত অচেনা মানুষের মধ্যে আজকাল বেশ একটু অস্বস্তি বোধ করে সে। কেন যেন তার ইনস্টিংকট তাকে সব সময়ে সাবধান করে দেয়, চারদিক সম্পর্কে সজাগ থেকো। এরা বেশিরভাগই খুনে, বদমাশ, চোর পকেটমার দাঙ্গাবাজ ঝগড়ুটে। তোমাকে একটু বেচাল দেখলেই পকেট ফাঁক করবে, ঝগড়া বাধাবে, অপমান করবে, মেরে বসবে বা মেরেই ফেলবে।

ফাঁকা অলস গতির ট্যাকসি ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখে কিছু না ভেবেই হাত তোলে হৃদয় এবং উঠে পড়ে। আজকাল তার বাইরের সম্পর্কে ভীতি জন্মেছে আগে যা ছিল না। সে সবচেয়ে নিরাপদ বোধ করে নিজের সামনের বারান্দায়। যদি তার কোনো গন্তব্য থাকে তবে তা ওই ভাড়াটে বাড়ির বারান্দাটুকুই। বাদবাকি শহর, দেশ বা রাষ্ট্র তার কাছে এক দূরের অচেনা রাজ্য। ট্যাকসি চৌরঙ্গীর দিকে যাচ্ছে, পিছু হেলে বসে হৃদয় নিস্তেজ চোখে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে। তার সুখদুঃখের বোধ ডুবে গেছে একেবারে। কী সুখ কী দুঃখ বলতে পারে না। এত অনাত্মীয় হয়ে গেছে তার আত্মীয়স্বজন যে তার ভয় হয়, এদের মধ্যে মরে গেলে সে তেমন কোনো শোক করবে না। ভেবে মাঝে মাঝে সে একটু অবাক হয়। নিজের মনকেই জিজ্ঞেস করে, যদি এখন মনীশ বা অনীশের কিছু হয় তবে তোমার রিঅ্যাকশন কেমন হবে? যদি কাজলের কিছু হয়, তাহলে? ইনস্টিংকট তাকে বলে, কিছু হলে তোমাকে বাপু জোর করে থিয়েটারি কান্না কাঁদতে হবে।

কামুর আউটসাইডার বইখানা পড়েছে হৃদয়, অ্যালিয়েশনের কথাও তার অজানা নয়। সে কি ওইসবেরই শিকার? হৃদয়ের ইনস্টিংকট সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে—না হে, তা নয়। আসলে তোমার সন্নিসী হওয়ারই কথা ছিল যে! তা হতে পারোনি বলে তোমার মনটা তোমাকে ফেলে জঙ্গলে চলে গেল। এখন তুমি আর তোমার মন ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই।

মানিব্যাগটা বুকে বড্ড চাপ দিচ্ছে। দম চেপে ধরছে। অস্ফুট একটু শব্দ করে হৃদয়। ট্যাক্সিওলা বাঙালি ছোকরাটি একবার ফিরে চায়। বলে—কিছু বলছেন?

হৃদয় মানিব্যাগটাকে পকেটসুদ্ধ খামচে ধরে বুক থেকে আলগা করে রাখে। তারপর ট্যাক্সির মুখ ঘোরাতে বলে। কোথাও যাওয়ার নেই শুধু ওই নিয়তি নির্দিষ্ট বারান্দাটা ছাড়া।

বাড়ি ফিরে আসতে আসতে প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল হৃদয়ের। কেন এই বাড়ি ছাড়া তার আর কোনো গন্তব্য থাকবে না? কেন আর কোথাও তার যাওয়ার নেই? কেন এত কম মানুষকে চেনে সে?

মানিব্যাগটা আলগা করে ধরে রেখেও বুকের বাঁ ধারের অস্বস্তিটা গেল না। দমচাপা একটা ভাব। রসা রোডে নিজের গলির মোড়ে ট্যাক্সিটা ঠিক যেখানে ধরে ছিল সেখানেই আবার ছেড়ে দিল সে। কী অর্থহীন এই যাওয়া আর ফিরে আসা!

বেলার রোদ খাড়া হয়ে পড়েছে। জ্বলে যাচ্ছে শরীর, ঝলসে যাচ্ছে চোখ। হৃদয় ধীর পায়ে হেঁটে গলিতে ঢুকল। আস্তে আস্তে দোতলায় সিঁড়ি ভেঙে উঠতে লাগল। ওপরে খুব হই—চই শোনা যাচ্ছে। এবার পুজোয় কাজলের একটা আধুনিক গানের এক্সটেন্ডেডপ্লে রেকর্ড বেরিয়েছে। স্টিরিওতে সেই রেকর্ডটা বাজছে এখন। বহুবার শোনা হৃদয়ের। কেউ বাড়িতে এলেই বাজানো হয়। জঘন্য গান। প্রায় অশ্লীল দেহ ইঙ্গিতে ভরা ভালোবাসার কথা আর তার সঙ্গে ঝিনচাক মিউজিক।

দোতলার বারান্দায় উঠতে খুবই কষ্ট হল হৃদয়ের। মানিব্যাগটা বের করে ঝুল পকেটে রেখেছে, তাও বাঁ দিকের বুকে চাপটা যায়নি। এখন সেই চাপ—ভাবের সঙ্গে সামান্য পিন ফোটানোর ব্যথাও। সিঁড়ির রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে হাঁ করে দম নিচ্ছিল হয়। বুঝতে পারছে তার মুখ সাদা, গায়ে কলকল করে ঘাম নামছে।

ললিতা ডাইনিং হলের পরদা সরিয়ে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। দেখে থমকে দাঁড়ায়। দু—পা এগিয়ে এসে বলে—কী হয়েছে?

হৃদয় কখনো এ মেয়েটার চোখে চোখ রাখতে পারে না। মনে পাপ। চোখ সরিয়ে নিয়ে খুব অভিমানের গলায় বলে—কিছু না।

এ অভিমানের দাম দেয় কে? হৃদয় হাঁফ ধরা বুক হাতে চেপে ঘরের দিকে এগোয়। বুঝতে পারে, শব্দগুলো আবছা হয়ে আসছে চোখে, বুকে ফুরিয়ে আসছে বাতাস। স্ট্রোক কী?

ভাবতেই মনটা অদ্ভুত ফুরফুরে হয়ে গেল আনন্দে। দীর্ঘকাল সামনের বারান্দায় বসে সে কি এই স্ট্রোকেরই অপেক্ষা করেনি? ইনস্টিংকট বলত—আসবে হে আসবে একদিন। সে এসে সব যন্ত্রণা ধুয়ে মুছে নিয়ে যাবে।

কার কথা বলত তার ইনস্টিংকট তা তখন বুঝতে পারত না সে। আজ মনে হল, এই অদ্ভুত অসুখের কথাই বলত।

হৃদয় ভেবেছিল, খুব নাটকীয়ভাবে সে ঘরের দরজায় লাট খেয়ে পড়ে যাবে। কিন্তু পড়ল না। হাত পা কাঁপছিল থরথর করে, বুকে অসম্ভব ধড়ধড়ানি আর হুলের ব্যথা, গায়ে ফোয়ারার মতো ঘাম। তবু পড়ল না। চেতনা রয়েছে এখনো, খাড়া থাকতে পারছে। পরদাটা সরিয়ে ড্রইং কাম ডাইনিং স্পেসে ঢুকল সে।

দরজার মুখে ললিতা এসে পিছন থেকে দুটো কাঁধ ধরে বলে—শরীরটা তো আপনার ভালো নেই। বউদিকে ডাকব?

বিরক্তি গলায় হৃদয় বলে—না, কাউকে ডাকতে হবে না।

ললিতা বোকা নয়। সব জানে স্বামী—স্ত্রীর সম্পর্ক। তাই মৃদু স্বরে বলে—আচ্ছা চলুন, আমি বারান্দায় পৌঁছে দিই আপনাকে।

খুব যত্নে ইজিচেয়ারে তাকে স্থাপন করে ললিতা। টুল থেকে জিনিসপত্র নামিয়ে সেটা সামনে রেখে পা দুটো টান করে মেলে দেয় টুলের ওপর। মৃদুস্বরে বলে—চোখ বুজে একটু বিশ্রাম করুন।

মুখে বড় ঘাম জমেছিল হৃদয়ের। ললিতা কিছু খুঁজে না পেয়ে তাড়াতাড়িতে নিজের শাড়ির আঁচলে যত্নে ঘামটুকু মুছে দিল। বলল—পাখা আনছি। চোখ বুজে ঘুমোন তো।

আলো মুছে যাচ্ছিল, ক্লান্তিতে এক অতল খাদে গড়িয়ে যাচ্ছে শরীর। তবু চোখ তুলে চেয়ে তাকে হৃদয়। হাঁ করে চেয়ে থাকে ললিতার দিকে। একটুও কামবোধ করে না সে। সব ভুলে হঠাৎ 'মা' বলে ডেকে উঠতে ইচ্ছে করে।

ঝিনচাক মিউজিকের সঙ্গে কটু সুরের গান বেজে যাচ্ছে স্টিরিওতে, সঙ্গে বাচ্চা বুড়োর গলায় হাঃ হাঃ হোঃ হোঃ। কিন্তু এই সামনের বারান্দায় এই শরৎকালের উজ্জ্বল দুপুরে ভারী পুরোনো দিনের এক আলো এসে পড়ল। হৃদয়ের ইনস্টিংকট বলল, মরবে না এ যাত্রায়।

# বানভাসি

পরশুদিন দুপুরে ভাত জুটেছিল। আর আজ এই রাতে হিসেবে দু—দিন দাঁড়ায়। তবে খিদেটিদে উবে গিয়েছিল জলের তোড়ে তল্লাট ভেসে যেতে দেখে। পরশু থেকে আজ অবধি কাশীনাথ তার নৌকোয় কতবার যে কত জায়গায় খেপ মেরে লোক তুলে এনেছে তার লেখাজোখা নেই। রায়চক উঁচু ডাঙা জমি, এইরকম দু—একটা জায়গা ডোবেনি। এখন সেই সব জায়গায় রাসমেলায় ভিড়। খোলা মাঠেই বৃষ্টির মধ্যে বসে আছে মানুষ। কেউ কেউ মাথার ওপর কাপড়—টাপড় টাঙিয়ে মাথা বাঁচানোর একটা মিথ্যে চেষ্টা করছে। কেউ বাচ্চাটাচ্চার মাথায় ছাতা ধরে আছে সারাক্ষণ। তাতে লাভ হচ্ছে না। ভিজছে, সব ভিজে সেঁধিয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে। এরপর মরবে।

রিলিফ এলে অন্য কথা। কিন্তু তাই বা আসবে কোন পথে! রেল বন্ধ, সড়ক বন্ধ, চারদিকে অথৈ জল।

কুলতলি থেকে একটা পরিবারকে তুলে এনে রায়চকে নামিয়ে ভাঙড়ে যাচ্ছিল আরও কিছু লোককে তুলে আনতে। শরীর নেতিয়ে পড়ছে, হাত চলতে চাইছে না, কেমন যেন আবছা দেখছে সে। মাথার মধ্যে ঝিমঝিম। কাশীনাথ বুঝতে পারছিল আর বেশিক্ষণ নয়। দু—দিন পেটে দানাপানি নেই। জুটবেই বা কোথা থেকে। কাল দুপুরে এক বুড়ি তাকে দু—গাল চালভাজা খাইয়েছিল। আর রায়চকের বাজারের টিউবওয়েল থেকে পেট পুরে জল। সেই কয়লাটুকুতেই শরীরের ইঞ্জিন চলছিল এতক্ষণ। আর নয়। কিন্তু নেতিয়ে পড়লেও চলবে না। বড় ড্যামের জল ছেড়েছে, তার স্রোতে নৌকো না সামলালে উলটে যাবে। নয়তো কোন আঘাটায় গিয়ে পাথরে বা গাছে ধাক্কা মেরে নৌকো টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। এর নৌকো এখন মানুষের জীবনতরী। ডুবলে চলে?

ঘুমও আসছিল তার। আর বারবার ঢুলে পড়ছিল। বইঠা বা লগির ওপর হাত থেকে থাকছে বারবার। ফের চমকে জেগে উঠছে। নয়াবাঁধের কাছে নৌকোটা একটু ভিড়িয়ে কয়েক মিনিটের জন্য চোখ বুজে ঘুমের আলস্যিটা ছাড়াতে গিয়েছিল সে। যখন চোখ মেলল তখন রাত হয়ে গেছে। গোলাগুলির মতো বৃষ্টির ফোঁটা ছুটে আসছে আকাশ থেকে। ঝলসাচ্ছে মারুনে বিদ্যুৎ।

জামাটা খুলে নিংড়ে নিল কাশীনাথ। ভাঙড়ে এই দুর্যোগে যাওয়ার চেষ্টা করা বৃথা। নৌকো ডুববে। সে কোমরজলে নেমে নৌকোর বাঁধনটা অন্ধকারেই একটু দেখে নিল। বটগাছের শেকড় শক্ত জিনিস। পাটের মোটা কাছিও মজবুত। নৌকো আর যাবে না। তবে নৌকোর খোলে জল উঠেছে অনেক। ফের নৌকো ভাসাতে হলে জল ছেঁচতে হবে। আপাতত জলেই ডুবে থাক। ভাসন্ত বানে নৌকোর ওপর মানুষের খুব লোভ। জলে ডুবে থাকলে—আর যাই হোক চুরি যাবে না।

বৃষ্টিকে ভয় খেয়ে লাভ নেই। জলে তার সর্বাঙ্গ ভিজে সাদা হয়ে আছে। সে নেমে পাড়ে উঠল। নয়াবাঁধ চেনা জায়গা। দু—পা এগোলেই হাটের অন্ধকার কয়েকটা চালাঘর। সেখানে এণ্ডিগেণ্ডি নিয়ে বানভাসি মানুষের ভিড়।

তারপর বসতি, চেনাজানা কেউ নেই এখানে। তার দরকারও নেই। সে বটতলা থেকে আর এগোল না। একটা মোটা শিকড়ের ওপর বসে পড়ল। ঘুম নয়, একটু ঝিমুনি কাটানো দরকার।

ঘুমিয়ে পড়েওছিল। হঠাৎ মুখের ওপর জোরালো টর্চের আলো এসে পড়ল, কে রে? কে ওখানে?

চমকে সোজা হল কাশীনাথ। সামনে ছাতা মাথায় কয়েকজন লোক। অন্ধকারে ভালো ঠাহর হল না, তবু আন্দাজে বুঝল, এলেবেলে লোক নয়।

কাশীনাথ কী বলবে ভেবে পেল না। সে কাশীনাথ, কিন্তু এর বেশি তো আর কিছু নয়! তা সেটা তো আর দেওয়ার মতো কোনো পরিচয়ও নয় তার।

কাশীনাথ ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, এই একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলাম আজ্ঞে। চোর ছ্যাঁচড় নই, নৌকো বাই।

মাছ ধরো?

আগে ধরতুম। এখন হাটেবাজারে মাল নিয়ে যাই।

কে একজন চাপা গলায় বলল, ওলাইচণ্ডীর কাশীনাথ।

সামনের লোকটা বলল, ও, এই কাশীনাথ!

কাশীনাথ খুব অবাক হল। এরা তাকে চেনে! কী করে চেনে? তাকে চেনার কথাই তো নয়।

তোমার নৌকো কোথায়?

বটগাছে বেঁধে রেখেছি। শরীরে আর দিচ্ছিল না বলে একটু ডাঙায় বসে জিরিয়ে নিচ্ছিলাম বাবু। দোষ হয়ে থাকলে মাপ করে দেবেন। না হয় চলেই যাচ্ছি।

আরে না না, দোষের হবে কেন? তবে এটা কি আর জিরোনোর জায়গা? তুমি তো মেলা লোকের প্রাণ রক্ষে করেছ হে বাপু।

করেছে নাকি কাশীনাথ? প্রাণরক্ষে করা কি সোজা কথা? প্রাণ বাঁচানোর মালিক ভগবান। সে কিছু লোককে বানভাসি এলাকা থেকে তুলে এনে ডাঙা জমিতে পৌঁছে দিয়েছে মাত্র তারা যে কীভাবে এরপর বেঁচে থাকবে তা সে জানে না।

কাশীনাথ টর্চের আলোর দিকে চেয়ে বলল, ভাঙড়ের দিকে যাচ্ছিলাম বাবু, তা শরীরে বড্ড মাতলা ভাব। তাই—

বুঝেছি। বলি দানাপানি কিছু পেটে পড়েছে?

ওসব তো ভুলেই গেছি। কারই বা দানাপানি জুটছে বলুন। সব দাঁতে কুটো চেপে শুধু ডাঙা খুঁজছে।

লোকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তাই বটে হে। লোকের দুর্দশা দেখলে আঁত শুকিয়ে যায়। নয়াবাঁধে তবু আমরা কিছু চিঁড়ে—গুড় আর খিচুড়ির ব্যবস্থা করেছি। দিন দুই হয়তো পারা যাবে। রিলিফ না এলে তার পর কী যে হবে কে জানে।

কাশীনাথের পায়ে অন্তত গোটা সাতেক জোঁক লেগেছে। সে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে সেগুলোকে উপড়ে ফেলতে ফেলতে বলল, সে আর ভেবে কী হবে। কিছু তো মরবেই।

তা বাপু, বলি কি, তোমার পরিবার পরিজন সব কোথায়?

কেউ নেই বাবু। আমি একাবোকা মানুষ।

ঘরদোর?

ওলাইচণ্ডীতে আছে একখানা কুঁড়ে। তা সেটাও বন্যার তোড়ে ফি বছর ভেসে যায়। এবারেও গেছে। এখন নৌকোই ঘরবাড়ি বাবু।

লোকটা একটু হাসল। বলল, আমাকে চেনো? আমি হলাম নয়াবাঁধের সাধুচরণ মণ্ডল।

কাশীনাথ তটস্থ হয়ে বলল, বাপ রে! আপনি তো মস্ত মানুষ বাবু।

হেঁ হেঁ। নামটা শোনা আছে তা হলে।

খুব খুব। তল্লাটের কে না চেনে বলুন।

আমি একটু মুশকিলে পড়েছি যে কাশীনাথ। তোমাকে যে পেলুম তা যেন ভগবানের আশীর্বাদে। বলছিলুম কি, মংলাবাজার চেনো?

খুব চিনি। নিত্যি যাতায়াত। সেইখানে কয়েকজনকে পৌঁছে দিতে হবে। নয়াবাঁধে এসে আটকে পড়েছে। এই সাংঘাতিক স্রোতে নৌকো ছাড়তে রাজি হচ্ছে না মাল্লারা।

তা স্রোত আছে বটে। তোমার মতো একজন ডাকাবুকো লোকই খুঁজছিলাম আমি। যদি পৌঁছে দিতে পারো তবে ভালো বখশিস পাবে।

বখশিসের কথায় কাশীনাথ হেসে ফেলল। হাতজোড় করে বলল, এ তো ভগবানের কাজ বাবু। বকশিশ কিসের? ও সব লাগবে না।

বলো কী? পয়সা হল লক্ষ্মী। তাকে ফেরাতে আছে?

অতশত জানি না বাবু। তবে এ সময়টায় পয়সার ধান্ধা করতে মন সরছে না। মানুষের যা দুর্দশা দেখছি। আমি পৌঁছে দেব খন।

তা হলে এসো, আমার বাড়িতে চাট্টি ডালভাত খেয়ে নাও। শরীরের যা অবস্থা দেখছি, না খেলে পেরে উঠবে না।

ঠিক আছে, চলুন।

সাধুচরণের বাড়িখানা বিশাল। প্রকাণ্ড উঠোনের তিন দিক ঘিরে দোতলা বাড়ি। পাঁচ—সাতখানা হ্যাজাক জ্বলছে। উঠোনে ত্রিপলের নীচে বড় বড় কাঠের উনুনে মস্ত লোহার কড়াইতে খিচুড়ি রান্না হচ্ছে। চারদিকে মেলা লোকলস্কর, মেলাই চেঁচামেচি। বৃষ্টির মধ্যেই বাঁশে ঝুলিয়ে খিচুড়ির বালতি নিয়ে লোক যাচ্ছে পিছনের উঠোনে বানভাসিদের খাওয়াতে।

সাধুচরণ তাকে নিয়ে ঘরে বসাল। বলল, গা মুছে নাও। বড্ড ধকল গেছে তোমার হে। শুকনো কাপড় পরবে একখানা?

কাশীনাথ হাসল, তাতে লাভ কী? আমাকে তো ঝড়ে জলে বেরোতেই হবে।

তাই তো।

দশ—পনেরো মিনিটের মধ্যেই শালপাতা আর গরম ভাতের হাঁড়ি চলে এল।

সাধুচরণ বলল, তোমাকে ওই লঙ্গরের খিচুড়ি খাওয়াচ্ছি না বাপু।

কাশীনাথ তার খাতির দেখে একটু অবাকই হচ্ছে।

পেটে রাক্ষুসে খিদে ছিল, কিন্তু ভাতের গরাস মুখ পর্যন্ত পৌঁছতেই কেমন গা গুলিয়ে উঠল তার। মনে হল, এই খাওয়ানোটার ভিতরে একটা অহঙ্কার আছে।

খাও খাও, পেট পুরে খাও হে।

ডাল ভাত ঘাঁটি এবং পুঁটি মাছের ঝোল—আয়োজন খারাপ নয়। কিন্তু কাশীনাথ পেট পুরে খেতে পারল কই? কত মানুষের উপোসী মুখ মনে পড়ল। কত বাচ্চার খিদের চেঁচানি। ঘটির জলটা খেয়ে সে উঠে পড়ল। পাতে অর্ধভুক্ত ভাত—মাছ পড়ে রইল। পাতাটা মুড়ে নিয়ে সে বেরিয়ে এসে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিয়ে ঘটির জলে আঁচিয়ে নিল।

সাধুচরণ কোথায় গিয়েছিল। ফিরে এসে বলল, এই অন্ধকারে তো আর মংলাবাজার যেতে পারবে না। বারান্দার কোণে চট পেতে দিতে বলেছি। শুয়ে ঘুমোও। কাল সক্কালবেলা বেরিয়ে পড়ো।

এর চেয়ে ভালো প্রস্তাব আর হয় না। সে বলল, যে আজ্ঞে।

তারপর চটের বিছানায় হাতে মাথা রেখে মড়ার মতো ঘুম।

কাকভোরে ঘুম ভাঙল। বাড়ি নিঃঝুম। এখনও আলো ফোটেনি। সে বসে আড়মোড়া ভাঙল। গা—গতরে ব্যথা হয়ে আছে। তবে কালকের চেয়ে অনেক তাজা লাগছে। অনেক জ্যান্ত। সে উঠে পড়তে যাচ্ছিল, একটা মেয়ে এসে দাঁড়াল। কিশোরী মেয়ে, পরনে একখানা হাঁটুঝুল ফ্রক। আবছা আলোয় যতদূর দেখা গেল, মেয়েটি রোগাটে।

তুমিই আমাকে মংলাবাজারে নিয়ে যাবে?

তা তো জানি না। সাধুচরণবাবু বললেন, কাদের যেন পৌঁছে দিতে হবে।

আমাকে আর পিসিকে।

তা হবে।

পিসি পৌঁছাবে। কিন্তু আমি জলে ঝাঁপ দেব। আমাকে বাঁচাতে পারবে না।

শশীনাথ হাঁ করে মেয়েটার মুখের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, জলে ঝাঁপ দেবে। কেন?

মরব বলে।

মরারই বা এত তাড়াহুড়ো কিসের?

সব কথা বলার সময় নেই। তবে এটুকু জেনো, আমি জ্যান্ত অবস্থায় মংলাবাজার যাব না। সারারাত জেগে বসে ওই জানালা দিয়ে তোমাকে লক্ষ করেছি, কখন ঘুম ভাঙে।

তুমি কি সাধুচরণবাবুর কেউ হও?

আমি ওঁর ছোট মেয়ে বিলাসী।

বটে! তাহলে তোমার দুঃখু কিসের? মরতে চাইছ কেন?

সে অনেক কথা। কাল রাতে নয়নের সঙ্গে আমার পালিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বন্যা হয়ে সব ভেস্তে গেল। বাবা টের পেয়ে আমাকে মংলাবাজারে মামাবাড়িতে পাচার করতে চাইছে। বিয়েও ঠিক করে ফেলেছে।

এ তো সাংঘাতিক ঘটনা।

তাই বলে রাখছি তোমাকে, আমি কিন্তু মরব। তুমি কিন্তু দায়ী হবে।

আমাকে কী করতে বলছ?

বললে শুনবে?

বলেই দেখো না।

গোবিন্দপুর চেনো?

কেন চিনব না?

আমাকে সেখানে পৌঁছে দাও।

সেখানে কী আছে?

ওটাই নয়নের গাঁ। কাছেই। বন্যা না হলে আধঘণ্টা হাঁটলেই পৌঁছানো যেত।

কাশীনাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, গোবিন্দপুরের অবস্থা কী তা জানি না। যদি ডুবে গিয়ে থাকে তা হলে তোমার নয়ন কি আর সেখানে বসে আছে?

তবু আমাকে যেতে হবে। এ বাড়ি থেকে না পালালে আমি বাঁচব না।

তারপর আমার কী হবে জানো? সাধুচরণবাবু আমাকে আস্ত রাখবেন কি? তিনি মস্ত সার্জেন, চারদিকে নামডাক। লোকলস্কর থানা—পুলিশ সব তাঁর হাতে।

আমার হাতে এই সোনার বালাটা দেখছ? তিন ভরি। আমার দিদিমা দিয়েছিল। এটা তোমাকে দিচ্ছি।

পাগল! ও সব আমার দরকার নেই!

মা শীতলার দিব্যি তোমায় যদি না নিয়ে যাও।

উঃ, কী মুশকিল!

শুনেছি তুমি নাকি খুব সাহসী লোক। অনেকের প্রাণ বাঁচিয়েছ। আমাকে বাঁচাতে পারবে না? এমন কী শক্ত কাজ?

তুমি নয়নের কথা ভেবে দুনিয়া ভুলে বসে আছ। আমার তো তা নয়। আমাকে যে আগুপিছু ভাবতে হয় গো!

হঠাৎ মেয়েটা ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতে শুরু করল।

কী মুশকিল!

পায়ে পড়ি, আমাকে নিয়ে চলো। আমার যে বুকটা জ্বলে যাচ্ছে।

দেখ বিলাসী, যদি ধরো তোমাকে গোবিন্দপুর নিয়েই যাই, তা না হয় গেলুম। কিন্তু যদি নয়নকে খুঁজে পাওয়া না যায় তখন তোমাকে ঘাড়ে করে আমি কোথায় কোথায় ঘুরব?

ঘুরতে হবে না। যে কোনো ঘাটে নামিয়ে দিও। আমি ভিক্ষে করে হোক, দাসীগিরি করে হোক, চালিয়ে নেব। বন্যার জল নামলে ঠিক নয়ন এসে আমাকে নিয়ে যাবে।

আর ইদিকে আমার হাতে হাতকড়া?

তোমার কিচ্ছু হবে না, দেখো। মা শীতলা তোমার ভালো করবেন।

ভগবান তখনই ভালো করেন যখন আমরা ভালো করি। বুঝলে।

তোমার পায়ে পড়ি।

বড্ড মুশকিলে ফেললে।

নইলে যে আমি মরব।

কাশীনাথ মৃদু স্বরে বলে, সে তোমার কপালে লেখাই আছে।

চলো না। লোকজন উঠে পড়লে যে আর হবে না।

ঠিক আছে। চলো। রাবণে মারলেও মারবে, রামে মারলেও মারবে।

ভোর—ভোর নৌকো ছাড়ল কাশীনাথ। মেয়েটা উলটো দিকে বসা। তাকে বইঠা ধরিয়ে লগি দিয়ে অগভীর জলে নৌকো ঠেলে নিচ্ছে। একটু তাড়াহুড়োই করতে হচ্ছে। লোকজন টের পেলে তাড়া করবে। কাশীনাথের ঘাম হচ্ছে খুব।

ডাঙাপথে গোবিন্দপুর যতটা দূর, জলপথে তত নয়। সাঁ করেই চলে এল তারা। সুপুরি, নারকেল গাছ, কয়েকটা দালানের ওপর দিকটা ছাড়া গোবিন্দপুর গাঁ নিশ্চিহ্ন।

দেখলে তো কী বলেছিলাম।

মেয়েটা তার পুঁটুলি কোলে নিয়ে হাঁ করে দৃশ্যটা দেখছে। দু—চোখে জলের ধারা।

এবার কী করবে বলো!

মেয়েটা তার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। কিশোরী মুখখানি এখন ভোরের আলোয় পদ্মফুলের মতো সুন্দর দেখাল। কান্নায় ভরাট গলায় বলল, কোথাও নামিয়ে দাও আমায়, যেখানে খুশি।

কাশীনাথ একটু ভেবে বলল, শোনো মেয়ে নামিয়ে দিলে তোমার বিপদ হবে। তার চেয়ে চলো, আমি ভাঙড়ে যাচ্ছি কিছু লোককে তুলে আনতে। তাদের পৌঁছতে পৌঁছতে বেলা মরে যাবে। তারপর তোমাকে সাঁঝের পর বরং নয়াবাঁধেই নামিয়ে দেব। বাড়ি চলে যেও।

বাবা আমাকে মেরেই ফেলবে।

দু—চার ঘা মারবে হয়তো। কিন্তু আবার ভালোও বাসবে। বাড়ি হল আশ্রয়। আমাকে দেখ না, আমি এক লক্ষ্মীছাড়া। ভাববার কেউ নেই।

মেয়েটা গুম হয়ে বসে রইল।

নয়ন ভাঙড়ে গেল। বানভাসি লোক তুলল। তাদের পৌঁছে দিল ডাঙা—জমিতে। রায়চকে আজ রিলিফের খিচুড়ি দিচ্ছিল। বিলাসীকে নিয়ে নেমে পড়ল কাশীনাথ। বলল, চাট্টি খেয়ে নাও। আর জুটবে কি না কে জানে।

মেয়েটা আপত্তি করল না। খিচুড়িও খেল পেট ভরে। তারপর বলল, জানো, আমি এভাবে লঙ্গরখানায় বসে খাইনি কখনো। আমার বেশ লাগছে। মানুষের কী কষ্ট, তাই না?

খুব কষ্ট?

কাছেপিঠে থেকে আরও দুটো খেপ মেরে কিছু লোক এনে ফেলতে হল কাশীনাথকে। সঙ্গে সারাক্ষণ বিলাসী।

কেমন লাগছে?

খুব ভালো লাগছে, কষ্টও হচ্ছে। একটা কথা বলব?

কী?

আমি নয়নের দেখা পেয়েছি।

অ্যাঁ! কোথায় দেখা পেলে? বলোনি তো!

রায়চকে। আমাকে দেখেই তাড়াতাড়ি ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল।

বললে না কেন? ধরে আনতাম।

মাথা নেড়ে বিলাসী বলে, তাকে আমার আর দরকার নেই যে!

সে কী? তার জন্যই না বিপদ ঘাড়ে করে বেরিয়ে এলে!

সে এসেছিলুম। এখন এত মানুষ আর তাদের কষ্ট দেখে মনটা অন্যরকম হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে নয়নও আমাকে চায় না।

বাঁচালে। তা হলে চলো নয়াবাঁধে তোমাকে রেখে আসি।

বিলাসী ঘাড় হেলিয়ে বলল, হ্যাঁ।

নৌকো বাইতে বাইতে কাশীনাথ বলল, বাবার মারের আর ভয় পাচ্ছ না?

বিলাসী আনমনে দূরের দিকে চেয়ে থেকে বলল, বাবা আর কতটুকু মারবে? ভগবান যে তার চেয়েও কত বেশি মেরেছে এত মানুষকে।

কাশীনাথ একটু হাসল।

# দেখা

রাজধানী এক্সপ্রেস ছেড়ে যাওয়ার পর হঠাৎ হাওড়া স্টেশনের নয় নম্বর প্ল্যাটফর্মটা আজ বড্ড ফাঁকা আর নির্জন ঠেকছিল নবেন্দ্রর কাছে। নবেন্দ্র চেয়েছিল দূরে বিলীয়মান ট্রেনটার পশ্চাদ্দেশের দিকে। অতি দ্রুত চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে। তারপর মাঠঘাট ভেঙে হা—হয়রান হয়ে দৌড়বে দিল্লির দিকে। পৃথা ওই ট্রেনে দিল্লি গেল। দিল্লিতে দিদি—জামাইবাবুর বাড়িতে দিন তিনেক থেকে লন্ডনের ফ্লাইট ধরবে। আপাতত এক বছরের। পরে সময়টা বাড়তে পারে।

ফাঁকা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকার মানে হয় না। কিন্তু একটা মানসিক বৈক্লব্যে স্থান—কাল—পরিস্থিতি ভুলে সে বেশ কয়েক মিনিট দাঁড়িয়েই থাকে। ফেরার কথা মনেই হয় না। তার কারণ পৃথার এই দূর—গমনটি বড় আকস্মিক। নবেন—একটা অনিশ্চয়তার অশুভ গন্ধ পাচ্ছে।

তাদের বিয়ে হয়েছে তিন বছর। এই তিন বছরই পৃথা ব্যস্ত থেকেছে তার বিপুল পড়াশুনা নিয়ে। প্রথম শ্রেণির মেধাবী ছাত্রী সে নয়। কিন্তু অগাধ পরিশ্রমী। অসম্ভব ধৈর্যশীল ও উদ্যোগী। নবেনের জ্ঞাতসারেই পৃথা অন্তত শতখানেক চিঠি লিখেছে বিদেশে। দিল্লিতে গিয়ে বিভিন্ন মন্ত্রকে যোগাযোগ করেছে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের সঙ্গে পরিচয় করেছে। নিজেকে উপস্থাপিত করার একটা নিজস্ব ক্ষমতা আছে ওর। আর এই সব করতে গিয়ে নবেনের সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্কটা সে প্রায় ভুলে গিয়েছিল। সংসারে ঠিকমতো সেটাই হল না। তাদের মধ্যে ভাব—ভালোবাসার কথা শুরু হয়েই কেমন করে যেন নানা স্কলারশিপ, গ্র্যান্ট, ফেলোশিপের প্রসঙ্গে চলে যেত।

নবেনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই, তা বলে পৃথার থাকবে না কেন? সেটা দোষেরও নয়। এবং শেষপর্যন্ত এই যে কী একটা সায়েন্স স্কলারশিপ পেয়ে সে বিদেশে গেল এটাও তার নিজের কৃতিত্ব। প্রায়ই বলত, সে আর পাঁচটা বাঙালি মেয়ের মতো বিয়ের পর থমকে যেতে চায় না।

বলতে নেই, বিয়েটাও পৃথার অনিচ্ছের অঘটন। বাবার দু—দুটো স্ট্রোক হয়ে যাওয়ায় উদ্বিগ্ন বাপ মেয়েকে প্রায় হাতে পায়ে ধরে বিয়েতে রাজি করান। তখন পৃথা ফিজিক্সে এম এসসি করছে। সেই সুবাদে ফুলশয্যা সেরেই কয়েকদিনের মধ্যে বাপের বাড়ি চলে যায়। যায় তো যায়ই। তিন মাস পাত্তা নেই। পরীক্ষার পর পরই কোনো মন্ত্রীর সেক্রেটারির সঙ্গে সমঝোতা করতে দিল্লি গেল। গেল তো গেলই। বিয়ের প্রায় ছ মাস বাদে শ্বশুরবাড়িতে এল। একমুখ হাসি, একটুও বিরক্তি নেই। যেন সে বাড়ির পুরোনো বউ। কিছুদিন দিব্যি শ্বশুর শাশুড়ি, বর আর অবিবাহিত ভাসুরের সঙ্গে মানিয়ে নিল। মিষ্টি কথা, মিষ্টি ব্যবহার, মনোমালিন্যের নামগন্ধ নেই, বরকে নিয়ে আলাদা থাকার ধান্ধা নেই। মানিপুলেশন শব্দটার অর্থ পৃথার কাছেই প্রথম শেখে নবেন। শব্দের অর্থ জানলেই হয় না, প্রয়োগ না জানলে সব শব্দই কাগুজে থাকে মাত্র।

হয়তো বা নিজের ক্যারিয়ারের জন্য লাগাতার তদ্বির করত গিয়েই ম্যানিপুলেশনের প্রয়োগ—কৌশল অর্জন করেছিল পৃথা। একটু আহ্লাদী গোলগাল মুখ এবং সামান্য মেদসম্পন্ন চেহারার ডলপুতুলের মতো দেখতে পৃথাকে নিয়ে নবেন প্রায়ই ধন্ধে পড়ে যেত। সে প্রায় শৈশব থেকেই স্ত্রৈণ অর্থাৎ যখন তার স্ত্রী বলে কিছুর ছায়ামাত্র জীবনে ছিল না, তখন থেকেই সে তার ভাবী স্ত্রীর অধীন হওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল। বিয়ের পরই যে সে তার বউয়ের অনুগামী হবে এটা তার ভবিতব্যই ছিল। ওই মনোভাব নিয়েই সে বড় হয়েছে। তার নিজস্ব ধারণা হল, বিয়েটা একটা টার্মিনাস। জীবনের উদ্যোগপর্বের ওইখানেই সমাপ্তি। তারপর বউয়ের ছায়ায় নিশ্চিন্তে জীবনটা কাটিয়ে দাও।

আর একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল। বউ যেন সুন্দরী হয়। তা ভাগ্যক্রমে পৃথা বেশ ফরসা, গঠন দুর্গা প্রতিমার মতো। খুব সুন্দরী না হলেও কেউ হ্যাক—ছিঃ তো করবে না। কিন্তু পৃথার স্ত্রৈণ স্বামী হওয়ার জন্য যে অবকাশটা দরকার সেটা কোথায়? স্ত্রী—বৃক্ষের ছায়া চেয়েছিল সে, কিন্তু বৃক্ষ যদি চঞ্চল ও সংক্রমণশীল হয় তা হলে ছায়া জুটবে কী করে?

সে আশা করেছিল, পৃথা তাকে আলাদা ফ্ল্যাটে সংসার পাতার কথা বলবে। কিন্তু পৃথা সেই ধার দিয়েও গেল না। বরং কথা ওঠায় বলেছিল, ও মা। তা কেন? এইখানেই তো বেশ আছি। আমি ট্যুরে বা বিদেশে গেলে তোমাকে দেখার লোক চাই তো। বাচ্চাকাচ্চার প্রসঙ্গ উঠলে একটুও আঁতকে উঠত না, আপত্তিও করত না। শুধু বলত, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার তো দু—তিনটে বাচ্চার মা হওয়ার শখ। প্রিপারেশনের জন্য একটু সময় দাও।

এম এসসির পর অতি দ্রুত পিএইচ ডির গবেষণার সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল সে। ফার্স্ট ক্লাস না পেয়েও এই সুযোগ পেয়ে যাওয়া যার তার কর্ম নয়। তবে সে খাটত, লাইব্রেরি, ল্যাব, প্রফেসরদের বাড়ি গিয়ে হানা, কম্পিউটার ঘাঁটা, চরকিবাজি আর কাকে বলে। আর তার ওই সাঙ্ঘাতিক ব্যস্ততার মধ্যে দাম্পত্য ঢুকবার মতো ফাঁকই থাকত না।

সুতরাং স্ত্রৈণ হওয়ার স্বপ্নটা পূরণ হল না নবেনের। তবে সে পৃথার ব্যাপারটা খুব আন্তরিকতার সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করেছে। সমবেদনা এবং সমর্থনও জানিয়েছে। এমনকী মা ঘরের বউয়ের উড়নচণ্ডীপনা নিয়ে মৃদু আপত্তি তোলায় মাকে বখাঝকাও করেছে। এ সব উচ্চশিক্ষিতা মেয়ের লাইফ তোমরা বুঝবে কী করে? বলার সময় অবশ্য ভুলে গিয়েছিল যে তার মা সুচেতা দেবীও পলিটিকাল সায়েন্সের এম এ। কিছুদিন অধ্যাপনাও করেছিলেন। দ্বিতীয় সন্তান হওয়ার পর চাকরি ছেড়ে দেন।

সব ঠিক আছে। তবু আজ পৃথা বিদেশে চলে যাওয়ার পর ফাঁকা প্ল্যাটফর্মে বড্ড কাহিল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নবেন। মনের ভিতর কী একটা যেন গুড় গুড় করছে। নরমাল লাগছে না। বড্ড অনেক দূরে চলে যাওয়া হল নাকি পৃথার? দূরত্বটা কি বাড়বে?

না এটা যে বিরহ নয় অন্য ব্যাপার, সেটা বুঝতে পারছে নবেন। বিরহের মধ্যে হতাশা থাকে না, মিলনাকাঙ্ক্ষা থাকে, আশা থাকে, একটা সুদূর উজ্জ্বলতার আভাস থাকে। এটা তা নয়। ইংরেজিতে একে বোধহয় বলে ডিজেকশন। ভোম্বল ভাবটা কাটাতে সময় লাগলেও নবেন সংবিৎ ফিরে পেয়ে ভারী অন্যমনস্কভাবেই ঠিক বাস ধরে বাড়ি ফিরে এল।

রাতে খাওয়ার টেবিলে মা বলল, বিয়ের পর ছেলেপুলে না হলে স্বামী—স্ত্রীর সম্পর্ক পাকা হয় না। দাদা নবেনের চেয়ে বছর চারেকের বড়। মাথা নেড়ে বলল, ঠিক নয় মা। ছেলেপুলে হওয়ার পরও বিস্তর ডিভোর্স হচ্ছে। কিন্তু কথাটা হঠাৎ উঠছে কেন? পৃথা বিলেত গেল বলে ভয় পাচ্ছ নাকি?

মা একটু অস্বস্তির সঙ্গে বলল, বিলেত—আমেরিকা আজকাল যা হয়ে উঠেছে, ভাবলে ভয় করে।

শিবেন হাসল, বিলেত আমেরিকার চেয়ে এ দেশ কিছু পিছিয়ে নেই। পরিবারপ্রথা টিকিয়ে রাখতে পারবে না মা। তবে পৃথা ভালো মেয়ে, লেখাপড়া ছাড়া আর কিছু নিয়ে ভাবে না। আমার বিশ্বাস, নবেনের একটা ব্যবস্থা করে ঠিক নিয়ে যাবে ওকে।

নবেনের কাছে এ সব প্রসঙ্গ স্বস্তিকর নয়। তবে পৃথা তাকে কিন্তু কখনো বলেনি যে, বিদেশে গিয়ে সে তার জন্যও ব্যবস্থা করার চেষ্টা করবে। নবেন একটু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, বউয়ের আঁচল ধরে বিদেশে যাওয়ার ইচ্ছে আমার নেই।

শিবেন বলে, সুযোগ এলে ছাড়বি কেন? পৃথা তো আর পর নয়। স্বামীর জন্য এটা তো সে করতেই পারে। বেচারা তো নিজের চেষ্টায় চান্স পেয়ে বিদেশে গেছে। তাতে তোর ইগো প্রবলেম হওয়ার কথা নয়।

নবেন বিরক্ত হয়ে বলে, আমার বিদেশে যাওয়ার ইচ্ছে থাকলে চেষ্টা নিজেই করতাম। আমার কোয়ালিফিকেশনে যাওয়াই যায়। কিন্তু আমার ইচ্ছে নেই।

বাবা পরিতোষ এতক্ষণ কথা বলেননি, এবার বললেন, তা হলে বউমা যদি বিলেতেই ভালো চান্স পেয়ে থেকে যায়, তা হলে কী করবি? আমাকে একবার বলেওছে ওর বিলেত বা আমেরিকায় থাকা খুব পছন্দ।

নবেন গম্ভীর হয়ে বলে, ভেবে দেখতে হবে, এখনই এ সব আলোচনার সময় হয়নি।

মা বলল, বিলেত যাওয়া তোর অপছন্দ হলে তুই তো ওকে বারণও করতে পারতিস। করলি না কেন?

ওর বিলেত যাওয়া আমার অপছন্দ হবে কেন? ইচ্ছে করলে যেতেই পারে। অপছন্দটা তো আমার নিজের ক্ষেত্রে।

আবহাওয়া উত্তপ্ত হচ্ছে দেখে বুদ্ধিমান পরিতোষ আলোচনা অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। নবেন ভালো করে খেল না, ফেলে ছড়িয়ে উঠে পড়ল।

পরদিন দিল্লি পৌঁছে পৃথা ফোনে পৌঁছ—সংবাদ দিল। খুব ব্যস্ত বলে বেশি কথা বলতে পারল না। দিন পাঁচেক পর ই—মেল চেক করতে গিয়ে অফিস নবেন পৃথার লন্ডনে পৌঁছনোর খবরও পেয়ে গেল। লন্ডনে পৌঁছে পৃথার খুব রোমাঞ্চ হচ্ছে। ভীষণ সুন্দর, ভীষণ ভালো শহর।

অ্যাকোমোডেশনের ব্যবস্থা এখনও হয়নি। অস্থায়ী বন্দোবস্তে আছে। জবাবে নবেন তাকে শুভেচ্ছা জানাল, ভালোবাসা এবং চুম্বনও। তবে আবেগটা তেমন কাজ করছিল না। একটা অসম্পূর্ণ সম্পর্ক কেমন যেন স্মৃতির চেহারা নিচ্ছে। পৃথা তার বিধিসম্মত বউ বটে, কিন্তু যেন আপনজন নয়, পর মহিলা।

এরপর প্রায় দিন কুড়ির ফাঁক, ফের ই—মেল এল। পৃথা একটি চমৎকার দক্ষিণ ভারতীয় পরিবারে পেয়িং গেস্ট হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। কাজের জায়গা খুবই কাছে। পার্ট টাইম জব পেয়ে গেছে, ভালো আছে, খুব ভালো আছে।

পৃথা যেসব বাধা জয় করবেই এই আস্থা নবেনের আছে। নাছোড়বান্দা, ধৈর্যশীল, সর্বদা আশাবাদী এবং অমিত পরিশ্রমী ম্যানিপুলেটররা কখনো ব্যর্থ হয় না। কিন্তু দুটো ই—মেলের কোথাও কোনো আবেগ, ভালোবাসা বা চুম্বনের কথা নেই। নবেন পৃথার স্বামী, নিজস্ব মানুষ, কিন্তু সেই ভাবটা কোথাও প্রকাশ পাচ্ছে না। বিয়ের পর সে আর পৃথা দেহগতভাবে মিলিত হলেও নবেন বুঝতে পারত, পৃথা ব্যাপারটা উপভোগ করছে না। তাড়াতাড়ি দায়সারাভাবে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলত এবং ঘুমোত। সারাদিন দেদার দৌড়ঝাঁপের ফলেই বোধহয় ওর ঘুম ছিল খুবই গভীর। সারারাত জেগে প্রেমালাপ করেনি কখনো।

নবেনের ধন্ধ কাটছে না।

তিন মাস বাদে পৃথা একটা ফোন করল।

শোনো, আমি একটা খুব ভালো স্কলারশিপ পেয়ে গেছি।

বাঃ, খুব ভালো কথা

বোধহয় আমি এখন পার্মানেন্টলি এখানে থেকে যেতে পারব।

পার্মানেন্টলি?

হ্যাঁ, ইস আমার যে কী থ্রিলিং লাগছে। এর মধ্যে একটা মিনি ট্যুরে ইউরোপ ঘুরে এসেছি। এখানে কাজের যে কত সুযোগ।

ভালো, খুব ভালো। দেশে কবে আসবে?

এখন তো যাওয়ার প্রশ্নই নেই। কাজের ভীষণ চাপ, ও সব পরে ভাবা যাবে, তোমরা সবাই ভালো তো!

হ্যাঁ, এ দেশে যতটা ভালো থাকা যায়।

একটা অ্যাপার্টমেন্টও নিয়েছি। নিজের জায়গা না হলে কাজকর্মের খুব অসুবিধে।

কিনলে নাকি?

হ্যাঁ, ক্রেডিটে ছোট অ্যাপার্টমেন্ট, তবে কোজি। সবাইকে জানিয়ে দিও। কেমন? ভালো থেকো।

নবেন বুঝতে পারল না, এটা বিরহকাতরা স্ত্রী ও স্বামীর সংলাপ হওয়া উচিত কি না।

সাধারণত নবেনের তেমন কোনো কেনাকাটা করার থাকে না। ডিসেম্বরের এক সন্ধেবেলায় সে অফিস থেকে বেরিয়ে এক কলিগের পাল্লায় পড়ে সল্ট লেকের শপিং মলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ঘ্যাম জায়গা, বিস্তর জিনিস। নবেনের জিনিসপত্র বেশি লাগে না। তার কলিগ শুভ্র সংসারী মানুষ, ইংরেজি নববর্ষে কার্ড আর গিফট কিনতে ব্যস্ত। নবেন এ পাশে ও পাশে ঘুরছে।

হঠাৎ একটি নারীকণ্ঠ বলে উঠল, আপনি রণজিৎ, না? নবেন একটা দোকানের শো কেসে বিচিত্র সব মোবাইল ফোন দেখছিল। তার এ যন্ত্র নেই। অপ্রয়োজনবিধায় কেনার কথা মনে হয়নি। তবু দেখতে দোষ কী? সে সোজা হয়ে মহিলার দিকে তাকাল। ছোটখাটো চেহারা, শ্যামলা, মুখের তুলনায় বেঢপ বড় একটা চশমা চোখে, সাদামাটা একটা হলুদরঙা শাড়ি আর গায়ে কমলারঙের শাল জড়ানো একটা মেয়ে। বয়স ছাব্বিশ—সাতাশ মুখের ডৌলটা ভারী মিষ্টি।

নবেন মাথা নেড়ে বলল, না, আমি রণজিৎ নই।

মেয়েটা বেশ অবাক। অবিশ্বাসের গলায় বলল, নন?

না। আমি নবেন বোস।

মেয়েটা একটু হতাশার গলায় বলল, ক্ষমা করবেন। ভুল করে ফেলেছি। আপনি ঠিক রণজিতের মতোই দেখতে। তবে বারো—তেরো বছর আগেকার দেখা তো। কিছু মনে করবেন না।

আরে না। এরকম ভুল তো লোকে আখছার করে।

মেয়েটার ডান হাতে একটা দড়ি দিয়ে বোনা সুন্দর ব্যাগ। তাতে কেনাকাটা জিনিসপত্র। বাঁ কাঁধে ঝুলছে কালো ভ্যানিটি ব্যাগও, চোখের বিস্ময়টা এখনও কাটেনি, বলল, আমি একটু আনমনা মানুষ, মাঝে মাঝে এরকম ভুল করে ফেলি।

বলে হাসল। আর এই হাসিটা যেন মেয়েটার বয়স বছর দশেক পিছিয়ে দিল হঠাৎ। একেবারে সহজ সরল শিশুর মতো হাসি। দুপাটি সুচারু সাদা দাঁত।

নবেনের বেশ লাগল মেয়েটাকে। বলল, কলকাতা শহরে আনমনা মানুষের কিন্তু বিপদ।

বিপদে পড়ি না নাকি? প্রায়ই রাস্তা পেরোতে গিয়ে গন্ডগোলে পড়ে যাই। বার দুই ট্রাফিক পুলিশের বকুনি খেতে হয়েছে। আমার নাম সঞ্চিতা মিত্র। সেক্টর ফাইভে থাকি। আপনি কি সল্ট লেকে থাকেন?

না। কাঁকুড়গাছি। রণজিৎ কে? কোনও আত্মীয় নাকি?

মেয়েটি বোধহয় আলাপী মানুষ। মাথা নেড়ে বলল, না, রণজিৎ শিলিগুড়ির ছেলে। আমাদের পাড়ায় থাকত। ভালো ফুটবল প্লেয়ার। একটা খুনসুটির সম্পর্ক ছিল আমাদের।

খুনসুটি?

হ্যাঁ, খুব খ্যাপাত আমাকে, দাদার বন্ধু।

এনি সফট কর্নার?

খুব হাসল মেয়েটি। শিশুর মতো। বলল, ও বয়সে কি আর খারাপ লাগে?

বারো—তেরো বছরের মধ্যে দেখা হয়নি বুঝি?

কী করে হবে? রণজিৎ কলকাতায় এল খেলতে। তারপর আর কোনো খবর নেই। শুনেছিলাম খেলার সুবাদে রেলে চাকরি পেয়েছে। কোথায় আছে কে জানে।

তাকে মিস করেন বুঝি?

না, না। ও সব ব্যাপার নয়। চেনা ছিল। ওই পর্যন্তই। হুবহু আপনার মতো দেখতে। লম্বা, ছিপছিপে, একই রকম লম্বাটে পুরুষালি মুখ। এমনকী গোঁফটা পর্যন্ত।

মানুষে মানুষে চেহারার মিল তো থাকতেই পারে। আপনি শিলিগুড়ির মেয়ে বললেন, সেক্টর ফাইভে কি আপনার শ্বশুরবাড়ি নাকি?

না না, আমার এখনও বিয়ে হয়নি। রিটায়ার করার পর বাবা কলকাতায় সেটল করলেন। আমি একটা স্কুলে পড়াই। আপনি?

ব্যাঙ্কে।

শুভ্র তার কেনাকাটা সেরে বেরিয়ে এসে ডাকল, হাই নবেন।

এই যে! সব কেনাকাটা হয়ে গেল?

হ্যাঁ! লেটস হ্যাভ সাম কফি। ওঃ সরি, ইউ আর বিজি।

আরে না, এঁর সঙ্গে এখানেই আলাপ হল। আমাকে ওঁর এক চেনা লোক বলে ভুল করেছিলেন। আচ্ছা ম্যাডাম, আসি।

নমস্কার। নমস্কার। আসুন।

শুভ্র খুব স্পোর্টিংলি বলল, ম্যাডাম, আপনিও আসুন না, একসঙ্গে একটু কফি খাই। আজ জব্বর ঠান্ডাও পড়েছে।

থ্যাংক ইউ। কিন্তু আজ আমার একটু তাড়া আছে। কিছু মনে করবেন না।

পথেঘাটে এরকম ঘটনা যতই ঘটে, মানুষ ভুলেও যায়।

প্রায় আট মাস বাদে পৃথা ফোন করল। ফোন করার ব্যাপারে পৃথার হয়তো কিছু হিসেবনিকেশ আছে। কিন্তু ই—মেল দশ পনেরো দিন বাদে বাদেই করে এবং তাতে নিজের খবরই দেয়। সবই সাকসেস স্টোরি। তাতে নবেন সম্পর্কে কোনো জিজ্ঞাসা থাকে না।

টেলিফোনে পৃথা স্কটল্যান্ড ভ্রমণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিল। জেফারসন নামে এক অধ্যাপকের প্রশংসা করল এবং বলল সে একটা মিনি অস্টিন গাড়ি কিনেছে। লাল টুকটুকে, ছোট্ট আর ভারী কিউট।

নবেন যথাসাধ্য আনন্দ প্রকাশ করল এবং পৃথাকে জীবনে আরও এগিয়ে যেতে বলল। এবং একেবারে শেষে জিজ্ঞেস করল, কবে আসবে?

আসব কেন? এখন তো আসার প্রশ্নই নেই। কত কাজ!

তোমাকে যে ভুলতে বসেছি!

আহা, ও আবার কী কথা! ভুলবে কেন?

তুমি আর আমি যদি দু—দেশেই থেকে যাই তা হলে তো সম্পর্কটাই উঠে যাবে।

তা যাবে কেন? সম্পর্ক ঠিকই থাকবে। কিন্তু দেখো, কেরিয়ারটার একটা দাম আছে। হয়তো এখানকার কাজ শেষ হলে আমি ইউ এস এ চলে যাব। সেখানেও কথাবার্তা চলছে। খুব শিগগির দেশেফেরার তো চান্স নেই। কাজেই ও সব ভেবে মন খারাপ কোরো না, আমার স্বপ্ন আগে স্বপ্ন সফল হোক।

ডিসেম্বরের পর জুলাই, এক ঘোর বর্ষার দিনে তার বন্ধু সুবীরের বিবাহবার্ষিকীতে যেতে হয়েছিল তাকে। উপহার কেনা ছিল না বলে সিটি সেন্টার নামে এক শপিং মলে নিজের নতুন মারুতি গাড়িটা পার্ক করে কিছু কিনতে নামল নবেন। কিন্তু কেনাকাটায় সে বিশেষ অপটু। কী উপহার দেবে, কত টাকা বাজেট এ সব কিছুই ঠিক করতে পারছিল না। একবার সোনাদানা, একবার বই, একজোড়া মোবাইল ফোন, এবং শাড়ি আর ধুতি পাঞ্জাবির কথাও মাথায় এল। কিন্তু কিছুই স্থির করতে পারছিল না।

সিটি সেন্টারের অতিশয় চাকচিক্যময় দোকানগুলোর বাইরে থেকে ঘুরে ঘুরে সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করছিল সে, এবং তখনই আচমকা মেয়েটাকে দেখতে পেল। হাতে সেই দড়ির ব্যাগ, চোখে চশমা, সবুজ শাড়ি আর ব্লাউজ।

আপনি সঞ্চিতা না?

আপনি নবেন। বলেই সেই শিশুর মতো হাসি। মুগ্ধ হয়ে গেল নবেন। এত ভাল হাসি কারও দেখেনি সে। বলল, আপনি এখানেই কেনাকাটা করেন বুঝি?

এটা কাছে হয়। তা ছাড়া কেনাকাটা আমার এক বাতিক। জিনিস কিনি বলে মা খুব বকে। কিন্তু কী করব, শপিং আমার একটা নেশা। আপনি এখানে যে?

আমি আবার আপনার উলটো, কেনাকাটা একদম পারি না। আমার বন্ধুর ম্যারেজ অ্যানিভার্সারিতে উপহার কিনব বলে নেমেছি কিন্তু কী কিনব, সেটাই ঠিক করে উঠতে পারিনি এখনও।

বাজেট কত?

সেটাও ঠিক করিনি। ব্যাঙ্কের ক্রেডিট কার্ড আছে, সুতরাং যা খুশি কিনে ফেলব। কী দেওয়া যায় বলুন তো?

ম্যারেজ অ্যানিভার্সারিতে দামি জিনিস দেবেন কোন দুঃখে? সস্তায় দেখনসই জিনিস দিলেই তো হয়। কেনাকাটায় সমস্যা থাকলে স্ত্রীকে নিয়ে এলেই তো হয়।

সেটা সম্ভব নয়। আমার স্ত্রী একজন আছেন বটে, তবে তিনি এখন বিলেতে, নিজের কেরিয়ার তৈরি করছেন।

বাঃ দারুণ ব্যাপার তো?

হ্যাঁ, দারুণ। নিদারুণও বলতে পারেন। তিনি এ দেশে আদৌ ফেরার কথা ভাবছেন না।

তাতে কী? আপনিও চলে যান না?

দেখুন ম্যাডাম, আমি বিদেশ—প্রেমিক নই। সাহেবরা খেটেখুটে তাদের দেশটাকে ঝাঁ চকচকে রেখেছে, আর আমি গিয়ে সেখানে হামলে পড়ে লুটেপুটে খাব। এই আইডিয়াটা আমার পছন্দ নয়।

ও বাবাঃ, আপনি তো বেশ ইগোইস্ট দেখছি। নাকি বউ বিলেতে গেছে বলে প্রেস্টিজে লাগছে?

না, সে ব্যাপার নয়, যে গেছে যাক, আমি যেতে রাজি নই।

পুরুষদের অনেক কমপ্লেক্স।

তা হবে হয়তো।

আচ্ছা, লেটস ড্রপ দ্য সাবজেক্ট। এখন চলুন তো?

এরপর সঞ্চিতা তাকে সঙ্গে নিয়ে একটা বুটিক থেকে চমৎকার একটা ঘর সাজানোর জিনিস কিনে দিল, মাত্র বারোশো টাকার মধ্যে। তারপর বলল, চলুন, আপনাকে কফি খাওয়াই।

কফি খেতে নবেন বলল, ভাগ্যিস আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল, নইলে উপহার নিয়ে অকুলপাথারে পড়ে গিয়েছিলাম। ধন্যবাদ।

ধন্যবাদ কিসের? কেনাকাটা করতে তো আমার ভালোই লাগে। বউয়ের চিঠি পেয়েছেন?

আজকাল চিঠি আবার কেউ লেখে নাকি? ই—মেল করে। পনেরো কুড়ি দিন পর পর ই—মেল আদানপ্রদান হয়। তিন মাস পর ফোন।

ওমা, সে কী?

তার মানে?

কতদিন বিয়ে হয়েছে আপনাদের?

এই তো সাড়ে চার বছর।

বউ বিলেতে আছে কতদিন?

দেড় বছর হল।

তা হলে ই—মেল আর ফোন এত কম হচ্ছে কেন?

পৃথা আর কোনো নম্বর দেয়নি। আমাকে ফোন করতে বারণ করে। বলে ভীষণ ব্যস্ত। বাড়িতে থাকে না। ই—মেল অবশ্য আমি প্রায়ই করি, কিন্তু ও পনেরো দিন পরপর চেক করে।

রাগ করে যায়নি তো?

না, পৃথা কাজের মেয়ে, রাগ অভিমান নেই।

আপনার স্ত্রীরা ভেনচারের কথা জেনে ভীষণ ভালো লাগছে। আমাদের দেশের মেয়েরা তো আকাশের দিকে তাকাতে ভয় পায়।

প্লিজ! প্রসঙ্গটা থাক না। কফিটা বরং এনজয় করি?

ঠিক আছে। সাতটা বাজে, নেমন্তন্নে যেতে হবে তো!

ও হ্যাঁ, সময়টা খেয়াল ছিল না।

যাবেন কী করে? বাইরে তো এখনও প্রচণ্ড বৃষ্টি।

হ্যাঁ, তবে গাড়ি আছে। চলুন, আপনাকে ড্রপ করে দিয়ে যাই।

তার দরকার নেই। আমারও একখানা গাড়ি আছে।

ফের কেনাকাটার দরকার হলে আপনাকে পাব কোথায়? মোবাইল নম্বরটা দিন।

ফোন নম্বর দেওয়া—নেওয়ার ভিতর দিয়ে দুজনের আজকের পালা শেষ হল। যাওয়ার সময় সঞ্চিতা বলল, শুনুন, আপনার সঙ্গে যে আমার বন্ধুত্ব হয়েছে, সেটা আপনার স্ত্রীকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিন।

কেন?

দিন না। শুনে রাখুন, ই—মেল নয় কিন্তু। বেশ ভাল প্যাডের কাগজে লিখবেন, আর খামে করে পাঠাবেন।

কারণটা কী?

যা বলছি তা করেই দেখুন না। ভালো হবে।

যাঃ, কিসের ভালো হবে? কিছুই বুঝতে পারছি না।

মেয়েদের পরামর্শ উপেক্ষা করতে নেই।

উপেক্ষা করল না নবেন। দিন সাতেক ভেবে তারপর একদিন সত্যিই লম্বা একটা চিঠি লিখে ফেলল পৃথাকে। সঞ্চিতাকে যে তার বেশ ভালো লাগছে সেটাও সবিস্তারে লিখল। লিখল সঞ্চিতার আনমনা উদাসীন স্বভাবের কথা। আর চমৎকার হাসির কথাটাও।

চিঠি ডাকে দেওয়ার পাঁচদিনের মাথায় রাত বারোটায় পৃথার উত্তেজিত ফোন এল।

হ্যালো, কী ব্যাপার বলো তো? সঞ্চিতাটা কে?

সেটা তো চিঠিতে লিখেছি। পড়োনি?

এই প্রথম পৃথার গলায় অদ্ভুত উত্তেজনা লক্ষ করল নবেন। প্রায় চেঁচিয়ে সে বলল, কতদিন পরিচয় হয়েছে?

মাস পাঁচ—ছয় হবে।

ওর সঙ্গে আর মিশবে না।

মেলামেশির ব্যাপার নয়। সবে তো দু দিন দেখা হয়েছে।

সেটা কি আর দু দিনেই থেমে থাকবে?

তুমি এরকম অ্যাজিটেটেড হচ্ছ কেন? জাস্ট একটা—পট করে ফোন কেটে দিল পৃথা।

তারপর মাসখানেকের মধ্যে আর সঞ্চিতার সঙ্গে দেখা হয়নি বটে, কিন্তু ফোনে কথা হয়েছে বার কয়েক। আন্তরিক কথাবার্তা, সমবেদনামূলক ভাববিনিময়।

মাস দেড়েক বাদে হঠাৎ রাতে পৃথার থমথমে গলা পাওয়া গেল ফোনে, তোমার পাসপোর্ট কোথায়?

পাসপোর্ট? আমার তো পাসপোর্ট নেই। তুমি তো তা জানো।

কেন নেই?

পাসপোর্টের কোনো প্রয়োজন তো দেখা দেয়নি।

আমি এ সব শুনতে ছাই না। তুমি কালই পাসপোর্টের ফর্ম নিয়ে এসো। পরশুর মধ্যে জমা দাও। তৎকাল লিখে আপ্লাই করলে তাড়াতাড়ি পাওয়া যাবে।

হঠাৎ পাসপোর্টের দরখাস্ত করতে যাব কেন? কোনো প্রয়োজন তো দেখা দেয়নি। কোনো স্কলারশিপ বা ফেলোশিপ বা ইনভিটেশন তো পাইনি।

প্রয়োজনটা তোমার নয়, আমার। সামনের সপ্তাহে আমি তোমাকে টিকিট পাঠিয়ে দিচ্ছি।

কিসের টিকিট? কী ব্যাপার বুঝিয়ে বলো।

তুমি চলে এসো।

তার মানে? হঠাৎ আমি বিলেতে দৌড়ব কেন? আমার বিদেশে যাওয়ার কোনো ইচ্ছেই নেই।

আমার খুব তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করছে।

ইচ্ছেটা এত দেরি করে হল?

তুমি আসবে কি না।

এই প্রথম পৃথার গলায় রাগের উত্তাপ পেল নবেন। সে ধরে নিয়েছিল গ্রেট ম্যানিপুলেটররা কখনো রাগ করে না।

যাওয়া সোজা নয় পৃথা, গিয়ে হবেই বা কী? তুমি ব্যস্ত মানুষ, আমাকে সময় দিতে পারবে না।

তোমার জন্য আমি ছুটি নেব।

তাতে তোমার কাজের ক্ষতি হবে না?

হলে আমি সেটা ঠিক ম্যানেজ করে নেব।

ঠিক আছে, আমি একটু ভেবে দেখি।

তার মানে, তোমার আসার ইচ্ছে নেই?

দেখি, তোমার অভিনব প্রস্তাবে ইচ্ছেটা জাগে কি না।

আমি জানি, ওখানে একটা কিছু হচ্ছে।

কী হচ্ছে?

সেটা তুমিই জানো।

বলে খুব রাগ করেই যেন ফোনটা কেটে দিল। আশ্চর্যের বিষয় পৃথার এই নতুন চরিত্র দেখে একটুও অখুশি হল না নবেন। তার যেন ভালোই লাগল ব্যাপারটা।

পরদিন অফিস থেকে ফোনে সঞ্চিতাকে ব্যাপারটা বলল নবেন। সঞ্চিতা মৃদুস্বরে বলল, আপনি আপনার স্ত্রীকে এতদিন ঠিক বুঝতে পারেননি।

তাই হবে হয়তো, কিন্তু এখন কী করি?

আপনার যাওয়া উচিত?

আমার ইচ্ছে হচ্ছে না। আপনি নারীবাদী বলেই আমার স্ত্রীর পক্ষ নিচ্ছেন।

আপনি কি ভেবেছিলেন আমি আপনার পক্ষ নেব?

নিরপেক্ষ থাকতে পারেন তো!

আমি তো নিরপেক্ষই। আপনি অন্য দিকে ঝুঁকে আছেন বলেই পক্ষপাত দেখছেন।

কোন দিকে ঝুঁকে আছি?

আপনার স্ত্রীর উলটোদিকে। ওঁর দোষ কী বলুন তো! নিজের কেরিয়ার তৈরি করছেন, এই তো? আর কোনও দোষ আছে কি?

না, অন্তত আমার জানা নেই।

তা হলে শি ইজ গুড, নাথিং রং?

ওর আবেগ কম, ভালোবাসা কম।

ও সব আপনার আরোপিত ব্যাপার। ভালোবাসার কথা না বলাটাই অপরাধ নয়। বরং যারা ভালোবাসার কথা বেশি বলে তাদের দুধে জল আছে।

আপনি তো পৃথাকে চেনেন না। তা হলে বলছেন কী করে?

আমি ওঁর বয়সি একটা মেয়ে। মেয়েরা মেয়েদের অনেক বেশি বোঝে।

খুব অনিচ্ছের সঙ্গে পাসপোর্টের দরখাস্ত জমা দিল নবেন। তৎকাল স্কিমেই। এবং পাসপোর্ট অফিসের প্রথাসিদ্ধ হয়রানির পর পেয়েও গেল।

তিনদিনের মধ্যে পৃথার ফোন।

পাসপোর্ট পেয়েছ?

পেয়েছি।

এখানে খুব শীত। তবে তোমাকে বেশি গরম জামা আনতে হবে না। এখানে অনেক বেশি ভালো জিনিস পাওয়া যায়। টিকিট আর দুশো পাউন্ডের চেক পাঠিয়ে দিয়েছি। পেয়ে যাবে।

কেন যে এ সব করছ?

আমার ইচ্ছে।

আমি কিন্তু দু—সপ্তাহের বেশি ছুটি পাব না।

আগে এসো তো, যাওয়ার কথা পরে।

তার বিলেত যাওয়ার কথা শুনে দাদা শিবেন ও বাবা পরিতোষ খুব খুশি। মা খুব খুশি নন। তবে তেমন কোনও মন্তব্য না করে শুধু বললেন, দ্যাখ, ভাব কতক্ষণ থাকে।

অফিস থেকে অনায়াসেই এক মাসের ছুটি মঞ্জুর হল। কলিগরা দারুণ আনন্দ প্রকাশ করল। বেশ একটা উৎসবের মেজাজ। যাওয়ার আগের দিন সঞ্চিতা তাকে ডাকল কফিশপে। অক্টোবরের এক বিকেলে। মৃদু হেসে বলল, বিরহ শেষ হয়েছে তা হলে?

যার শুরুই ছিল না, তা শেষ হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।

এখনও স্ত্রীর ওপর রাগ পুষে রেখেছেন। আশ্চর্য!

রাগ। আ ফিলিং অফ ডিজেকশন। ওকে যখন রাজধানী এক্সপ্রেসে তুলে দিলাম তখনও ওর তোমন কোনো মন খারাপ দেখিনি। বরং নিজের ব্যাপার নিয়ে ভারী ব্যস্ত।

পুরুষরা যে মেয়েদের কাছে কী চায়! একটা মেয়ে ভালো চান্স পেয়ে নিজের চেষ্টায় বিদেশে যাচ্ছে, তার তো থ্রিল হবে। আপনি থ্রিলটা উপভোগ করলে পারতেন।

যাকগে বাদ দিন। আমি কিন্তু কিছুতেই যেতাম না। শুধু আপনার কথায় যাচ্ছি।

কথাটার প্রতিবাদ করল না সঞ্চিতা। বড় বড় চশমার ভিতর দিয়ে নিবিড় চোখে তার দিকে চেয়ে একটু সিক্ত গলায় বলল, এখন থেকে আমার কথা শুনে চলবেন।

কিন্তু কেন যে আপনি আমাকে পরামর্শটা দিলেন সেটা বুঝতে পারলাম না। স্বামী—স্ত্রীর মধুর মিলন ঘটানোর জন্য, নাকি আমার স্ত্রীকে আমার উপর টেক্কা দেওয়ার সুযোগ করে দিতে?

কোনোটাই নয়।

তা হলে?

ভালোবাসা কথাটার অর্থ জানেন?

কেন জানব না? সবাই জানে।

আমি যে ভালোবাসার কথা বলছি তার অর্থ আপনার জানা নেই।

আপনার নতুন অর্থটা বলুন, শুনি।

নতুন নয়। আসল অর্থটা মানুষ ভুলে গেছে। ভালোবাসা মানে হল, যাকে ভালোবাসি তার ভালো—তে বাস করা।

বুঝলাম না। আমার আর পৃথার মধ্যে এখনও ভালোবাসা জন্মায়নি।

আমি আপনাদের কথা বলছি না। আমার কথা বলছি।

তার মানে?

যে দিন রণজিৎ বলে আপনাকে ভুল করেছিলাম, সে দিন থেকেই আমি আমার বশে ছিলাম না। সিটি সেন্টার রোজ যেতাম শুধু আপনার জন্যে। কতদিন পরে এলেন আর সে দিনই জানলাম আপনি পৃথার। বুকে জ্বালাপোড়া হল, তিন দিন ঘুমোতেও পারিনি।

স্তম্ভিত নবেন অনেকক্ষণ বাক্রুদ্ধ থেকে বলল, বলেননি কেন?

কী বলব বলুন তো? প্রথমদিন যখন দেখা হল তখন বুকে অদ্ভুত আনন্দের রিমঝিম, মাথার মধ্যে যেন অনেক রঙিন বেলুন উড়ছে। ঠিকানা, ফোন নম্বর কিছুই জানতে চাইনি লজ্জায়। কিন্তু জানতাম একদিন ঠিক দেখা হবে। হবেই। হল। কিন্তু যেই শুনলাম আপনার বউ আছে, অমনি এক অদেখা, অচেনা মেয়ের ওপর এমন বিদ্বেষ আর ঘৃণা এল যে আমি অবাক হয়ে ভাবলাম, একজন লোককে ভালোবাসলে কি তার বউটাকে অকারণে ঘেন্না করতেই হবে? যে ভালোবাসার সঙ্গে বিদ্বেষ আর ঘেন্নাও জন্মায় সে কেমন ভালোবাসা? এই সব ভেবে দুটো দিন জ্বলে পুড়ে মরেছি, তারপরে কী করে যেন মনে এল, ওকে যদি ভালোইবাসি তবে ওর যাতে ভালো হয় তাই করা যাক। কেড়ে নিলে জিনিসটা সব সময়ে পাওয়া হয় না।

কিন্তু আমিও যে—

জানি, আপনিও দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। আর একটু সুতো ছাড়া হলেই আপনিও পৃথাকে ঘেন্না করতে শুরু করতেন। আপনি ছোট হয়ে যেতেন, আমিও। দখলদারিই তো ভালোবাসা নয়।

আপনাকে বোঝা কঠিন।

না, মোটেই কঠিন নয়। তবে বুঝবার আর চেষ্টা না করে সবসময়ে আমার কথা শুনে চলবেন। কী, চলবেন তো?

নবেন মুখ নিচু করে মাথা নেড়ে বলল, হুঁ।

# সুখ

এই সময়টায় ছাদে ভেজা জামাকাপড় মেলতে ওঠে চম্পাকলি। আর এই সময়টাতেই ছোকরাটা একটা সাইকেলে বাড়ির চারপাশে চক্কর খায়। চোখ প্রায় সর্বদাই ছাদের দিকে। কবে হুড়মুড় করে নর্দমায় পড়ে, কি ল্যাম্পপোস্টে ধাক্কা খায়, কে বলতে পারে। এই সময়টায় চম্পাকলির সাজগোজ থাকে না, মাথার খোঁপা ভেঙে পড়ে আছে ঘাড়ে, শাড়ি গাছকোমর করে পরা, মুখে কোনো রূপটান নেই। এ হল হাড়ভাঙা কাজের সময়। এখন কি সাজতে আছে! কিন্তু ছোঁড়াটা তাকেই দেখতে আসে রোজ, এটা বুঝতে বি এ—এম এ পাশ করতে হয় না।

চম্পার যে ব্যাপারটা খুব খারাপ লাগে, এমন নয়। যদিও সে বিবাহিতা এবং মোটামুটি সুখী একজন বউ, তবু বাড়তি পাওনা তো কখনো ফ্যালনা হয় না। দেখছে তো দেখুক না, বাড়াবাড়ি না করলেই হল।

কাপড় মেলে ক্লিপ লাগিয়ে একটু রেলিংয়ের ধারে দাঁড়াল চম্পা। আহা বেচারা রোজ এত কষ্ট করে, তাকে একটু প্রসাদ না দিলে হয়? তবে নীচের দিকে তাকায় না সে। যেন উদাস দৃষ্টিতে দিগন্তের শোভা দেখছে এমনভাবে রেলিংয়ে কনুই রেখে চেয়ে থাকে। দু—মিনিটের বেশি নয়। ফের নীচে নেমে কত কাজ।

চম্পাকলি দেখতে কেমন? নিজের মুখে চম্পা তা বলে কেমন করে? তবে ছেলেবেলায় তাকে সবাই ফুটফুটে বলত। বড় হয়ে শুনতে পায়, অ্যাট্রাকটিভ, সেক্সি, রোম্যান্টিক, লাবণ্যময়ী। হয়তো খুব সুন্দরীর পর্যায়ে সে নয়, কিন্তু রাস্তাঘাটে পুরুষরা বেশ তাকায়। ল্যা—ল্যা করেই তাকায়।

ছোকরা বোধহয় সাইকেলে তাকে সাত পাকের জায়গায় সতেরো পাক দিয়ে ফেলল। হ্যাংলাও হয় বটে পুরুষগুলো। মনে মনে হেসে চম্পাকলি ছাদ থেকে দোতলায় নেমে এল। এই তার সংসার। তিনখানা বড় বেডরুম, বেশ বড়সড় হলঘরের মতো, তার অর্ধেকটা বুককেস দিয়ে আড়াল করা আলাদা বৈঠকখানা, বাকিটা লিভিংরুম। শ্বশুর, শাশুড়ি আর তারা দুজন। ননদের বিয়ে হয়ে এখন ইন্দোনেশিয়ায়। চম্পাকলির রাজত্ব মোটামুটি বিঘ্নহীন।

লিভিংরুমে চল্লিশ ইঞ্চির এলসিডি টিভি খোলা। একটু তফাতে চেয়ারে বসে আছেন শাশুড়ি। সারাদিন টিভি দেখার নেশা। সঙ্গে পান আর স্পেশাল দোক্তা। একটু ভারভাত্তিক মানুষ, বেশ পুরু করে সিঁদুর পরেন সিঁথিতে, কপালে বড় সিঁদুরের ফোঁটা। পরনে পাটভাঙা শাড়ি, যেন এখনই বেরোবেন। কিন্তু বেরোতে বিশেষ পছন্দ করেন না। সিরিয়াল দেখতেই বেশি ভালোবাসেন। সন্ধেবেলা দেখা সিরিয়ালের পুনরাবৃত্তি এই দিনের বেলাতেও দেখতেই হবে তাঁকে। চম্পাকলির তাতে আপত্তি নেই। কারণ, ওই খেলনায় মজে থাকেন বলে সংসারের ভালোমন্দে বিশেষ নাক গলান না।

শ্বশুরমশাই বাজারে। আর বাজার মানেই তাঁর মুক্তি। সকাল আটটায় বেরিয়ে বাড়ি ফিরতে সেই এগারোটা। পথে একটা চায়ের দোকানের আড্ডা আছে, একটা কাপড়ের দোকানেও খানিক সময় কাটান। মাছ বাজার, সবজি বাজারেও বিস্তর পুরোনো চেনাজানা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। নিষ্কর্মা লোক, আর করারই বা কী আছে?

চম্পাকলির এত কী কাজ? আসলে চম্পার কাজ বলতে কিছুই নেই। রান্নার একজন আছে, বাসন মাজা, ঘর পরিষ্কার করার একজন আছে এবং সবসময়ের একজন আছে। সুতরাং চম্পাকলির সারাদিন ছুটি। কিন্তু চম্পাকলি ছুটিটা বিশেষ পছন্দ করছে না বেশি সুখেরও কিন্তু ফল—আউট থাকে। এই যে বেশ বড় বড় ঘর, আলোবাতাসের রূপকথায় ভরা ফ্ল্যাট, এ তার শ্বশুরমশাইয়ের করা। নীচের তলায় ব্যাঙ্ককে ভাড়া বসিয়েছেন

তিনি। বিচক্ষণ, দূরদর্শী লোক আর কাকে বলে। মেয়েকেও সমপরিমাণ টাকা দিয়ে দিয়েছেন যাতে বাড়ির ভাগাভাগি নিয়ে কখনো ঝগড়াঝাঁটি না হয়।

চম্পাকলির সুখ এখন সর্বত্র পাখির ডাক ডাকে, প্রজাপতির মতো ওড়ে, সুগন্ধের মতো ভেসে থাকে।

এই যে বারান্দায় দাঁড়িয়ে চম্পা এখন চা খাচ্ছে, এটার মধ্যেও সুখের উঁকিঝুঁকি। দামি দার্জিলিং পাতার চা, সামান্য চিনি আর এক চিমটি হোয়াইটনার দেওয়া। ফরসা পোর্সেলিনের কাপে সুগন্ধী চা সুখের শিহরণে তার দম বন্ধ করে দিতে চায়। আর ওই যে ছেলেটা, উলটোদিকের ইস্তিরিওয়ালার গুমটিতে সাইকেল কেতরে পায়ের ঠেক রেখে দাঁড়িয়ে আছে ওরও কিছু উপচার আছে। রোজ ছেলেটা তাকে পুজো দিয়ে যায়। বারান্দায় চায়ের সময়টায় যে—চম্পাকলি তার একমাত্র ভক্তটিকে দর্শন দেয় মাত্র।

চম্পার আরও ভক্ত ছিল। সেই বারো—তেরো বছর বয়স থেকেই তার উদ্দেশে কত হৃদয়ের বারিধারা বর্ষিত হয়েছে তার হিসেব নেই। অঙ্কের মাস্টার, পিসতুতো দাদা, পাড়ার মস্তান, দাদার বন্ধু এবং বিপজ্জনক নিখিলেশ। নিখিলেশ আসলে দু—জন। একজন সোবার নিখিলেশ, অন্যজন মাতাল। আর নিখিলেশ তাদের বাড়িতে আসত মাতাল হয়েই, রাত বারোটার পর এবং পাড়া কাঁপিয়ে তর্জন—গর্জন করতে করতে। আসলে সে চম্পার উদ্দেশে উচ্চকণ্ঠে প্রেমই নিবেদন করত, তবে মাত্রাজ্ঞান না থাকায় দু—চারটে অশ্লীল শব্দও বেরিয়ে আসত মুখ থেকে। অন্তত বার চার—পাঁচ পাড়ার ছেলেদের হাতে এবং দাদার বন্ধুদের হাতে মার খেয়েছে সে। তবু আসত। সোবার নিখিলেশ একদম অন্যরকম। যেমন ভদ্রলোক, তেমনই স্মার্ট, তেমনি সহৃদয়। সোবার নিখিলেশ কখনো প্রেম নিবেদন করেনি চম্পাকলিকে। সোবার নিখিলেশ ছিল চম্পার বাবার শিষ্য, এস্রাজ শিখতে আসত। এস্রাজ বাজাতও ভালো। বাবা বলতেন, বড় তৈরি হাত ছিল নিখিলেশের, কিন্তু মদই ওর প্রতিভাকে খেয়ে নিল।

আশ্চর্যের বিষয় এই, চম্পাকলি আজ অবধি কারও জন্যই পাগল হল না। কারও জন্যই নয়। এই যে তার দিব্যি কৃতী বর পারিজাত, একে তার একটুও অপছন্দ নয়। মালা পরাল, সাত পাকে বাঁধল, এক বিছানায় শুয়ে পড়ল, সব মসৃণভাবে হল। তার বেশি কিছু হল না। একটা বিস্ফোরণের অভাব হল কি?

সুখ, সুখ আর সুখ... চারদিকে সুখের জাল তাকে ঘিরে রেখেছে। এই সুখের হাত থেকে তার আর রেহাই নেই। সুখে সুখে জর্জরিত জীবন। মাঝে মাঝে শ্বাস রোধ হয়ে আসে। মাঝে মাঝে নেশার মতো মনে হয়।

তার বিয়ের পর সে শুনেছে নিখিলেশ মদ আর এস্রাজ দুইয়ের মধ্যে কোনটা ছাড়বে তাই নিয়ে লটারি করেছিল। লটারিতে মদ হেরে যায়। নিখিলেশ এখন দিন—রাত এস্রাজ নিয়ে পড়ে থাকে। মদ ছোঁয় না। এ খবরটা তো কম সুখকর নয়। তার জন্য একটা মানুষের, এবং হয়তো আরও অনেক মানুষের জীবনে অনেক ওলটপালট ঘটে গেছে। এখনও ঘটে চলেছে। তার প্রমাণ ওই ছেলেটা। সাইকেলারোহী, লম্বা, রোগা, দাড়িয়াল এবং বাবরিচুলো এক উদ্ভ্রান্ত পুরুষ কেবল সাইকেল চালিয়ে চালিয়ে আয়ুক্ষয় করে দিচ্ছে। দোতলায় নিষিদ্ধ ফলের জন্য হৃদয়ের ব্যর্থ ক্ষরণ।

ঘরে ঢুকতেই ফের এক ঝলক সুখের মুখোমুখি চম্পাকলি। আয়না। লম্বা তিন খণ্ড আয়না যেন তিন সখী। চম্পাকে দেখলেই তারা যেন আনন্দে উল্লাসে শিউরে ওঠে। সে চেয়ারে বসার সময় টের পায়, চেয়ারটাও যেন একটা তৃপ্তির শ্বাস ফেলে। সে যখন বিছানায় শোয়, তখন বিছানাও যেন প্রেমিকের মতো তাকে বুকে টেনে নেয়। স্নানের সময় শাওয়ারের জলকণা পর্যন্ত তার জয়ধ্বনি দিতে দিতে তার সর্বাঙ্গ লেহন করতে থাকে!

সুখের সঙ্গে একটু লুকোচুরি খেলবে বলেই সে অকাজের কাজ টেনে নেয় নিজের ঘাড়ে। ওয়াশিং মেশিন চালায়, ওটিজিতে পাউরুটি টোস্ট করে, ফল কাটে, ডাস্টিং করে, ঘর গোছায়। কখনো—সখনো শখের রান্নাও সে করে। আর মন ভালো রাখতে এস্রাজ বাজায়।

নীচে একটু বাগান। রুমালের মতো ছোট। কিন্তু সেখানে সবুজের কার্পেট পাতা, আর ফুলের অকৃপণ চাষ। দক্ষিণের জানালার ফ্রেমটা তাই যেন একটা ল্যান্ডস্কেপ। ওই কোণে একটা ঝিরঝিরে নিমগাছ বাইরেটা

আড়াল করে আছে। এই জানালাটা দিয়েই মাঝে মাঝে গোপন প্রেমিকের মতো হাওয়া আসে, রোদ আসে, আর আসে চোরা হাসি নিয়ে তার সুখ। তখন সুখের সঙ্গেও কথা হয় তার।

সুখ, আমার এত সুখ কেন বলো তো!

আমি যখন দিই, নিজেকে উজার করে দিই।

মাঝেমধ্যে একটু বিরহ—যাতনা থাকবে না তা বলে। ঝালনুন, লঙ্কার গুঁড়ো, তেঁতুলের টক না হলে কি হয়!

তা কী করব বলো, তোমার বিরহের মনই তো নেই। পারিজাত যে গত মাসে পনেরো দিনের জন্য কুয়ালা লামপুর গেল, তোমার ক'ফোটা চোখের জল পড়েছে বলো!

তা অবিশ্যি ঠিক। আমার চোখে—হারাই ভাবটা নেই। আচ্ছা, তাহলে বিরহ ব্যাপারটা কেমন হয় আমাকে একটু বুঝিয়ে দাও তো।

মাখা ময়দার লেচি দেখনি? একটা বড় লেচি ছিঁড়ে দুটো আলাদা লেচি করতে যাও, দেখবে একটা অন্যটাকে ছাড়তে চায় না। গদের আঠা কেমন হয় জানোই তো!

বড্ড ভাবনায় ফেললে সুখ!

ইস্তিরি করা এক পাঁজা জামা—প্যান্ট—শাড়ি ধুতি গুছিয়ে রাখবে বলে ঘরে এসেছিল সবিতা। সবসময়ে মুখখানা হাঁড়ি। কোনো সময়ে ওকে হাসতে দেখে না চম্পা। কথাও বড্ড কম। কাজে অবশ্য ভীষণ ভালো, আর চোর—টোরও নয়।

'হ্যাঁ রে, তুই হাসিস না কেন বল তো!' একদিন জিজ্ঞেস করেছিল চম্পা।

এ কথায় সেদিন ঠোঁটে একফালি চাঁদ দেখা দিয়েছিল। বলল, 'শুধু শুধু হাসব কেন?'

'লোকে হাসির কথায় হাসে, মনে আনন্দ হলে হাসে, নইলে অন্তত মুখটা হাসি—হাসি তো থাকে। তোকে যে সেদিন দুটো শাড়ি দিলুম, আঁশটে মুখ করে নিলি, যেন মরা ইঁদুর ফেলতে যাচ্ছিস!'

'যাঃ তাই বুঝি! কী সুন্দর শাড়ি!'

'বরকে বলেছিস?'

'বলিনি আবার। শুনে বলল, বউদি খুব ভালো।'

আজও সবিতার মুখ সেইরকমই হাঁড়ি।

চম্পা বলল, 'হ্যাঁ রে, রোজ দেখি একটা দাড়িওয়ালা ছেলে সাইকেলে ঘুরে বেড়ায়। লম্বা, রোগা চেহারা। চিনিস?'

সবিতা আলমারি খুলে কাপড়—জামা খুব যত্ন করে সাজিয়ে রাখছিল। মুখ না ফিরিয়েই বলল 'কে জানে, কত লোকই ঘোরে।'

চিনেই বা কী হবে চম্পাকলির! জাস্ট কৌতূহল বই তো নয়। ভুলে যেতে তার দু—মিনিটও লাগে না। তার মনটা কি জলের মতো? যতই দাগ কাটো, কোনও চিহ্ন থাকে না?

মুচমুচে সুখ, টক—ঝাল সুখ, মিষ্টি সুখ, গরমে শীতলতার মতো, শীতে উষ্ণতার মতো সুখ ঘিরে আছে তাকে। কোকিলের মতো ডাকে, দোয়েলের মতো শিস দেয়, ফিঙের মতো লেজ নাচিয়ে পিরিক—পিরিক লাফিয়ে বেড়ায়।

'তোর বর কী করে রে সবিতা?'

'গাড়ি চালায়। অ্যাম্বুলেন্স।'

'অ্যাম্বুলেন্স! এ মা, অ্যাম্বুলেন্স চালায় কেন?'

'তা কী করবে বলো! যা জুটেছে তাই তো করতে হবে।'

'অ্যাম্বুলেন্স' শব্দটাই বিচ্ছিরি। কানে গেলেই যেন একটা করুণ সাইরেনের শব্দ শোনা যায়। আর বুকটা ধকধক করে।

'অনেক মাইনে পায়, না রে?'

'কে জানে কত পায়। আমাকে কি বলবে নাকি? আর যা পায় তার তো প্রায় সবটাই মদ গিলে উড়িয়ে দেয়।'

'ও বাবা, খুব মদ খায় বুঝি?'

'আমাদের ঘরে যত অশান্তি তো ওই নিয়ে। পুরুষ মানুষের রোজগারে সংসার চলে না, আমি রোজগার করি বলে ছেলেপুলে দুটো খেতে পায়।'

অনেকে আছে, দুঃখের সাতকাহন ফেঁদে বসে। সবিতা ঠিক সে রকম নয় বলে বাঁচোয়া। চম্পাকলির হাই উঠছিল।

'অ্যাম্বুলেন্স' শব্দটা বুকে নিয়েই সে সারা ঘর এলোমেলো পায়ে খানিকক্ষণ ঘুরল। মধ্যরাতে মাঝে মাঝে যখন অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেন শুনতে পায়, তখন সে হাত মুঠো পাকিয়ে ফেলে।

## দুই

নানকুর কোথাও পৌঁছনোর নেই। তার সাইকেলখানা শুধু যায় তার ঘুরে ফিরে একই জায়গায় ফিরে আসে। এই লক্ষ্যহীন সাইকেল চালিয়ে তার কোনো আনন্দ নেই। শুধু অভ্যাস আছে। একটা গতি তো। তার বেশি কিছু নয়।

নানকুর পরনে ময়লা জিনস, গায়ে একখানা হাফহাতা কামিজ, পায়ে চপ্পল। সমাজে নানকুর যে—স্তরে বাস তা দারিদ্রসীমার লেভেল ঘেঁষে। বাবা ভূতনাথ একজন ভূতপূর্ব সরকারি কর্মচারী। পিয়কন থেকে কেরানি পর্যন্ত উঠতে পেরেছিলেন, তারপরই অবসরের চিঠি এসে যায়। দুটো মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে ভারি গরিব হয়ে গেছেন বেচারা। ছেলেকেও পড়াতে হয়েছে। বৃথা—বিদ্যা বলে একটা কথা আছে কি? অনেক বিদ্যে আছে যেগুলো থাকলেও যা, না থাকলেও তা। নানকুর যেমন। সে বি কম। তিনবার তিনটে চাকরি পেয়েছিল। একটা ক্যুরিয়র সার্ভিসে। একটা খবরের কাগজে। আর একটা কোম্পানির সেলসম্যান। কোনোটাই টেকেনি। ক্যুরিয়র সার্ভিসটা উঠে গেল। খবরের কাগজটাও চলল না। তৃতীয় কোম্পানিটা মেয়েদের রূপচর্চার জিনিস বানাত। পুলিশ—কেস হয়ে মালিক এখন হাজতে, কোম্পানিতে তালা।

নানকু দাড়ি রাখতে শুরু করে উনিশ বছর বয়সে। এখন সে ঊনত্রিশ। তিনটে টিউশনি সম্বল।

নিজের সাইকেলখানাকে নানকু গভীরভাবে ভালোবাসে। কবে থেকে সওয়ার হয়ে আছে তা ঠিকঠাক বলা সম্ভব নয়, তবে সাইকেল আর নানকু প্রায় অবিভাজ্য। পাড়ার লোক তাকে সাইকেলবাজ বলেই জানে।

প্রথম শুরু হয়েছিল আটচল্লিশ ঘণ্টা অবিরাম সাইকেল চালনা দিয়ে। খিদিরপুরের একটা ক্লাবের উদ্যোগে। এমএলএ, কাউন্সিলর এবং শেষ দিনে মেয়র অবধি এসেছিলেন। সেই অমানুষিক পরিশ্রমের পর বারো হাজার টাকার তোড়া পেয়েছিল সে। এ বাজারে এমন কিছু নয়। তবু সেটাই ছিল তার প্রথম পুরস্কার। এর পর হাওড়ার শিবপুরে বাহাত্তর ঘণ্টা। তাতে উঠেছিল প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা। কিন্তু বাহাত্তর ঘণ্টার ওই অমানুষিক পরিশ্রমের পর নানকুর আর টাকা পাওয়ার আনন্দটা উপভোগ করার মতো অবস্থা ছিল না। এখন বছরে একবার—দু'বার ডাক আসে। আর কিছু করার নেই বলে নানকুকে যেতেই হয়।

নানকুর চাকরি নেই, রূপ বা গুণ নেই, প্রেমিকা নেই, আছে শুধু সাইকেল। তা সাইকেলই তাকে যা হোক কিছু তো দিয়েছে। আজও কলকাতার বিপজ্জনক রাস্তায় রাস্তায় সাইকেল চালিয়েই নানকুর দিন কেটে যায়। কোথাও পৌঁছয় না, কোথাও কারও অপেক্ষা নেই তার জন্য।

মানিক চক্রবর্তীর স্টেশনারি দোকানের সামনে একখানা টুল আছে। বলতে কি, ওই টুলখানাই তার সারাদিনের ঠিকানা। লোকে তাকে ওখানেই এসে খোঁজে এবং পায়।

বেলা দশটায় লোকটা এল। বুড়ো মানুষ। পরনে ঢলঢলে প্যান্ট আর প্যান্টে গোঁজা একখানা সাদা শার্ট, পায়ে কেডস। রোগাভোগা চেহারা। মুখে একটু ভিতু হাসি।

'আপনিই নানকুবাবু?'

'হ্যাঁ।'

'একটু দেখা করতে এলুম।'

নিয়মিত রোজগার না থাকলে স্বভাব খারাপ হয়ে যায়। টাকার জন্য মনটা ছোঁক—ছোঁক করে। হাতের চায়ের খালি ভাঁড়টা ফেলে দিয়ে নানকু বলল, 'অ। তা কী দরকার বলুন তো?'

'আপনার সাইকেলটা কোথায়?'

'কেন? ওই তো দোকানের পাশের ঘুপচিতে ঢোকানো রয়েছে।'

'হাত দিয়ে একটু দেখতুম মশাই। যা খেল দেখালেন সেবার।'

নানকু জানে সে কোনোমতেই স্পোর্টসম্যানের মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য নয়, সে কোনো অর্থেই হিরো নয়, কোনো গ্ল্যামারও নেই তার। বড় জোর তাকে একজন শ্রমিক বলে ধরা যায়। যে—শ্রমিক ঘাম আর ক্লান্তি ছাড়া কিছুই উৎপাদন করে না।

বুড়ো মানুষটি ভারী গদগদ হয়ে গিয়ে সাইকেলটা একটু ছুঁয়ে এলেন। ফিরে এসে পকেট থেকে কিছু টাকা বের করে তার হাতে দিয়ে বললেন, 'এই দু—হাজার টাকা আগাম। একটা রসিদ কেটে দিন।'

'কোথায় হবে? কবে?'

'সামনের শুক্কুরবার। আমাদের ফাউন্ডার্স ডে। সকাল সাতটায় শুরু। রিয়্যালিটি ক্লাবের মাঠ।'

'চিনি। তা কত দিচ্ছেন আপনারা?'

'বাহাত্তর ঘণ্টায় পঞ্চাশ হাজার।'

'ঠিক আছে।' বলে একটা কাঁচা রসিদ কেটে দিল নানকু।

বুড়ো লোকটা চলে যাওয়ার পরই মানিক বলল, 'পারবি? গত মাসেই তোর জন্ডিস হয়েছিল।'

'পেরে যাব। আর তো কিছু পারি না। সাইকেল আজ অবধি ট্রেচারি করেনি।'

'একদিন করবে। দেখিস।'

একটা মেয়ে এসে মানিককে বলল, 'দু—মিটার লাল রিবন দেবেন?'

মানিক বলল, 'কালই তো নিয়ে গেলি রিবন।'

'সে তো হলুদ রিবন।'

'এত রিবন দিয়ে কী করিস?'

'গলায় দেব তো, তাই।' বলে আড়চোখে একবার নানকুকে দেখে নিল মেয়েটা।

নানকু ওকে মুখ—চেনে। হরিবল্লভ বিশ্বাসের মেয়ে শিবানী। কেন এ সময়ে কিছু না—কিছু কিনতে আসে তাও নানকু জানে। ওটা ছুতো। নানকুর লেটার বক্সে একবার একটা বেনামা চিঠিও ফেলে এসেছিল। কাঁচা প্রেমপত্র। কিন্তু হয়, শিবানীর সেই সাধ্য নেই যে, নানকুকে আকর্ষণ করে। আর পাঁচটা মেয়ের মতোই উঠতি বয়সের একটা লাবণ্য আছে হয়তো, তার বেশি কিছু নয়। নানকু ভালো করে তাকিয়েও দেখেনি কোনওদিন। যাকে ঘিরে তার এত অবিরাম পরিক্রমা, সে আকাশের চাঁদের মতো, মেরুশিখার মতো, রূপকথার মতোই অপ্রাপ্য বস্তু।

নিজেকে অনেক বুঝিয়েছে নানকু। পরস্ত্রী মাতৃবৎ। কাজ হয়নি। টের পেলে পারিজাত পাড়ার ছেলেদের ডেকে ঠ্যাঙাবে। উঁহু, তাতেও চিঁড়ে ভেজেনি। বউটা এরপর তোকে ঘেন্না করবে যে! করবে সে তো জানি। খুব খারাপ খারাপ কথা বলেও নিজেকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেছে নানকু। ওরে ওই চম্পাকলিও তো রক্তমাংসের একটা ডেলা ছাড়া কিছু নয়। তারও বাহ্যে—পেচ্ছাপ আছে, দাদ—হাজা—চুলকুনি আছে বুড়ো

বয়সের ঝুলে পড়া দেহযন্ত্র আছে। কিন্তু ভবি ভোলেনি। ভোলেও না। কোনো মুদগরই এই মোহের পক্ষে যথেষ্ট নয়।

তা বলে পাইপ বেয়ে দোতলায় কোনোদিন উঠবে না নানকু। উঠে লাভও নেই। সে তো ধর্ষণকারী নয়। প্রেমিক মাত্র। দৃষ্টিপ্রসাদের ভিক্ষুক। একবার তাকালেই ভিতরকার ফণা ধরা সাপ মাথা নুইয়ে ফেলে।

শিবানী তার দু—খানা মদিরতায় ভরা চোখ হেনে চলে গেল। বেচারা। আরও কত রিবন আর টিপের পাতা কিনতে হবে ওকে। পড়া নষ্ট হবে, ঘুম নষ্ট হবে, চোখের জল ফেলবে। কিন্তু নানকুর কী করার আছে?

একখানা লজঝরে দেশি সাইকেল আর প্রাণান্তকর আটচল্লিশ বা বাহাত্তর ঘণ্টার প্রাণক্ষয় করে সে এই একটি বা দু—টি মাত্র হৃদয় জয় করেছে। তার বেশি কিছু নয়।

সে কোনোদিন দুনিয়ার সেরা সাইক্লিস্টদের সঙ্গে রেসিং সাইকেলে চেপে টক্কর দেবে না, এটা জেনে যাওয়ার পর সে একবার ঠিক করল, আর কিছু না হোক গোটা ভারতটা তো একটা চক্কর দিয়ে আসা যায়। হয়তো তাতেও কিছু নামডাক হতে পারে। কয়েকটা অভিযাত্রী ক্লাবের পরামর্শ নিয়ে একটা রোডম্যাপ তৈরি করে বছর তিনেক আগে এক শীতকালের শুরুতে বেরিয়েও পড়েছিল। ইয়ুথ হস্টেলের মেম্বারশিপ ছিল। ছিল সামান্য কিছু টাকা।

কিন্তু একটা করার রোখ থেকেই সে বিহার প্রায় চষে ফেলেছিল। তারপর মধ্যপ্রদেশ। ছোটখাটো বিপন্নতা তাকে তেমন দমাতে পারেনি। ধানবাদে কিছু গুন্ডা ছেলে তার টাকাপয়সা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল, টুরিস্ট বলে অনেক বোঝানোর পর কী ভেবে ছেড়ে দেয়। ডাকাতে ধরেছিল হাজারিবাগের কাছে। তেমন কিছুই নেই দেখে একটা গাট্টা মেরেছিল শুধু। বিলাসপুরে ফুড পয়জনিং হয়ে দিন তিনেক পড়ে থাকতে হয়েছিল এক ধর্মশালায়।

বড় বিপদটা হল পাঁচমারি যেতে গিয়ে। নির্জন রাস্তায় পথের হদিশ না পেয়ে আঘাটায় চলে গিয়েছিল সন্ধের মুখে। একটা ভাঙা ব্রিজের জন্য ডাইভারশন ছিল সামনে। দেখতে পায়নি ভালো করে। যখন দেখতে পেল, তখন ডাইভারশনের একেবারে মুখে। গতি কমাতে গিয়ে ব্রেক চাপতেই ঢালুতে উলটে পড়ে গেল সাইকেল সমেত সে। কিছুক্ষণ জ্ঞান ছিল না। জ্ঞান হল এক মলিন, অতি দীনদরিদ্র এক হাসপাতালে। রুগির ভিড়ে ছয়লাপ। ডাক্তার নার্সদের দেখা নেই। তার বেডও জোটেনি, প্যাসেজে একটা ময়লা কম্বলের ওপর শোয়ানো অবস্থায় চোখ চেয়ে সে প্রমাদ গুনল। বাঁ কাঁধে প্রচণ্ড ব্যথা। নড়ার উপায় নেই। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক ডাকাডাকির পর একজন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী তাকে জানাল যে, তার কাঁধের হাড় সরে গেছে। কিন্তু হাড়ের ডাক্তার আসবে আরও দু—দিন পর।

সেই দুটো দিন যে কীভাবে কেটেছিল তা বলার নয়। জঘন্য খাবার আর জঘন্যতম পরিবেশ। তবে কিনা এসব তার আন্দাজেই ছিল।

অস্থিবিশারদ ডাক্তারটি বাঙালি। তাই বলে যে নানকুকে পেয়ে খুব আহ্লাদিত হলেন তা নয়। তবে হাড়টা সেট করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলেন যত্ন করেই। বললেন, একদম নড়াচড়া করবেন না। অন্তত দিন সাতেক।

নানকুর মাথায় বজ্রাঘাত। ওই হাসপাতালের চেয়ে তার কাছে তখন গাছতলাও ভালো।

বারণ সত্ত্বেও পরদিনই সে বেরিয়ে খোঁজখবর নিয়ে জানল তার সাইকেলটা থানায় জমা আছে। ব্যথার বড়ি থেকে সে হাসপাতাল থেকে পালিয়ে থানায় গিয়ে সাইকেলটা উদ্ধার করল। দোমড়ানো সাইকেলটার জন্য পুলিশ বিশেষ ঝামেলা করল না।

সাইকেলটা সারিয়েও নিল একটা দোকান থেকে। কিন্তু ব্যথা লাগা কাঁধে সাইকেলের ঝাঁকুনি সইবে না বলে সে ট্রেন ধরল। ভিড়ের ট্রেনে অনভিপ্রেত সাইকেল এবং ভাঙা কাঁধের ব্যথা নিয়ে সে দু—দিনও নরকবাস।

তার অ্যাডভেঞ্চারের ইতি সেখানেই। কারা যেন সাইকেলে বিশ্বভ্রমণ করেছিলেন। সেইসব মহাপুরুষকে সামনে পেলে প্রণাম করত নানকু।

চম্পাকলির একটা রুটিন আছে। সকালে ভেজা জামাকাপড় মেলতে ছাদে ওঠা, কিছুক্ষণ দূরের দিকে উদাস নয়নে চেয়ে থাকা। আধঘণ্টা বাদে বারান্দায় দাঁড়িয়ে চা খাওয়া। তার দিকে না তাকিয়েও বুঝিয়ে দেওয়া, পুরুষ, আমি জানি তুমি আমাকে উপভোগ করছ। করো। তোমার পুষ্পাঞ্জলি আমি গ্রহণ করছি।

চম্পাকলির একজন বিশেষ পুরুষ আছে। আবার নির্বিশেষরাও আছে। বিশেষ পুরুষটি তাকে পায় বটে, কিন্তু ধীরে ধীরে তৃষ্ণা কমতে থাকে নির্বিশেষদের কাছে চম্পাকলি সহজে ফুরোয় না। তাদের তৃষ্ণা দীর্ঘস্থায়ী হয়। তৃষ্ণা দীর্ঘজীবী হোক।

শুক্রবার ভোরবেলা রিয়্যালিটি ক্লাবের মাঠে জনারণ্য। ব্যান্ড বাজছে, মাইকে ঘোষণা চলছে। এমএলএ, কাউন্সিলর আর পাড়ার বিশিষ্টজনের একটা ছোটখাটো সভা করলেন। অল্পস্বল্প বক্তৃতা। যুব সমাজের কাছে তেজস্বী ও বীর হয়ে ওঠার আবেদন। পাড়ার একদল মেয়ে গানও গাইল। গাঁদার মালা পরানো হল নানকুকে। নানকুর মাথায় টুপি, চোখে রোদচশমা, গায়ে টি—শার্ট, পরনে হাফপ্যান্ট আর পায়ে কেডস। এমএলএ সাহেব ফ্ল্যাগ অফ করলেন। নানকুর সঙ্গে পাড়ার আরও প্রায় সাত—আটজন সাইকেলে পরিক্রমা শুরু করল। বাকিরা অবশ্য এক—দেড় ঘণ্টা পরই একে একে বসে যাবে। থাকবে শুধু নানকু আর তার সাইকেল। নানকু জানে, অবিরাম সাইকেল চালানোয় কোনো মজা নেই, লড়াই নেই, রেস নেই, ফার্স্ট—সেকেন্ড হওয়া নেই। বড় একঘেয়ে এই ঘুরে ঘুরে চক্কর কাটা। কোথাও পৌঁছনোর নেই, কোথাও যাওয়ার নেই। প্রথমটায় লোকেরা কিছুক্ষণ কৌতূহল নিয়ে দেখে, তারপর একে একে কেটে পড়তে থাকে।

দুপুরের মধ্যেই মাঠ ফাঁকা হয়ে গেল। দু—চারজন গা এলিয়ে ফোল্ডিং চেয়ারে বসে গল্পগাছা করছে। রাতে আরও ফাঁকা হবে। তা বলে নজরদারি থাকবে না, তা কিন্তু নয়। নজর রাখা হয় ঠিকই। কোনো নিয়মভঙ্গ হল কিনা, লোকটা ফাঁকি দিল কিনা ঠিকই ধরে ফেলা হয়। যে—ডায়াবেটিক বৃদ্ধটি রাতে বারবার ছোট বাইরে করতে ওঠেন তিনি বাথরুমে আসা—যাওয়ার পথে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখেন। হ্যাঁ, ওই তো ঘুরছে!

প্রথম দিনটা পার করা তেমন কঠিন নয়। অভ্যাসে হয়ে যায়। মাঝেমধ্যে নিয়মমাফিক বড় বাইরে, ছোট বাইরে কিংবা খাওয়ার একটু অবকাশ পাওয়া যায়, তখন লুটিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে।

আর কোনো খেলা শিখল না কেন নানকু? কেন এটাই তার বরাতে জুটল?

শনিবার সকালেও কিছু লোক দেখতে এল নানকুর পছন্দমতো গান চলছিল মাইকে। কখনো তীকষ্ন হিন্দি কখনো মোলায়েম বাংলা। সঙ্গে নানকুর ঘোষণা। পঞ্চাশ হাজার প্রাইজ মানি ছাড়াও কেউ কেউ হাজার বা দু—হাজার টাকা পুরস্কার দেবে ঘোষণাও হচ্ছিল। টাকা বাড়লে হাঁটুর জোরও একটু একটু বাড়ে।

ঘটনাটা ঘটল রাতের দিকে। পেটটা বিকেল থেকেই সামান্য চিনচিন করছিল। বেলা চারটে নাগাদ একটা ঠান্ডা পানীয় খাওয়ার পরেই ব্যথাটা বাড়ল। এবং বেশ বাড়তে লাগল। একের পর এক উদ্গার উঠছে। সঙ্গে একটা মৃদু বমির ভাব। মনের জোরে শরীরকে শাসন করে খানিকক্ষণ সাইকেলের স্পিড বাড়িয়ে দিল নানকু। যদি এই ব্যায়ামে পেটের বায়ু বেরিয়ে যায়। কিন্তু তাতে বিশেষ কাজ হল না। ওর পা কাঁপছে, হাতে ধরা সাইকেলের হ্যান্ডেল এঁকেবেঁকে যাচ্ছে, চোখ ঝাপসা হচ্ছে বারবার। আর বুকে একটা কষ্ট।

আরও আধঘণ্টা দাঁতে দাঁত চেপে সাইকেল চালু রেখেছিল নানকু। প্রাইজ মানি তো কম নয়। ফসকে যাবে?

ফসকাল। রাত বারোটা নাগাদ এক ঝলক বমি উলটে এল পেট থেকে। তারপরই আকাশ থেকে যেন নিঃশব্দে প্রকাণ্ড কালো বাদুর নেমে এল তার গায়ে।

সাইকেলটা ছিটকে গেল তলা থেকে। নানকু কেমন কাত হয়ে পড়ল মাটিতে। সাইকেলের নিরালম্ব দু—খানা চাকা কিড়কিড় করে ঘুরে যেতে লাগল শুধু।

হইহই করে ছুটে এল লোকজন। ধরাধরি করে তোলা হল নানকুকে। জ্ঞান নেই। পাড়ার ডাক্তার এসে দেখেই গম্ভীর হয়ে বললেন, হসপিটালাইজড করো।

সাইরেন বাজাতে বাজাতে অ্যাম্বুলেন্স যখন নানকুকে নিয়ে যাচ্ছে তখনও তার অসহায় সওয়ারিহীন সাইকেলখানা পড়েছিল মাঠে। নিষ্প্রাণ।

## তিন

শিবানী জানে, তার দিকে মন নেই নানকুদার। কিন্তু ওই লম্বা, ছিপছিপে, সাইকেলবাজ দাড়িওয়ালা পুরুষটির মধ্যে সে এক বন্য প্রেমিকের রূপ দেখতে পায়। এক কঠোর, জেদি, নাছোড় পুরুষ। যেসব ছেলেরা মেয়েদের মন ভোলানোর জন্য বোকামি করে বেড়ায়, ও তাদের দলে নয়। একদম অন্যরকম।

শিবানীর বুকের ভিতরে তার হৃদয় রক্তের স্রোতে ভেসে যায়, যতবার সে নানকুর কথা ভাবে। আর দিনের মধ্যে কতবার কে ভাবে, কখনো কখনো সারাদিন ধরে ভাবে। মায়ের ডাক কানে পৌঁছয় না, বইয়ের পড়া ঢুকতে চায় না মাথায়, কেমন যেন উদাসী বাতাসের মতো বিরহ বয়ে যায়।

শিবানী তেমন সুন্দরী নয়, আবার হেলাফেলা করার মতোও নয়। তার গানের গলায় প্রশংসা আছে। তার হাসির গুণগান সে অনেকের কাছে শুনেছে। আর তার নাকি পুকুরের মতো গভীর চোখ।

এসব কেন যে নানকু দেখতে পায় না! কেন যে পায় না! ভারী রাগ হয় শিবানীর। একটু তাকাবে তো চারদিকে! আর কতবার রিবন কিনতে মানিকদার দোকানে যাবে শিবানী? আরও কত পাতা টিপ কিনতে হবে তাকে?

পাড়ার মাঠে সেই যে বাহাত্তর ঘণ্টা সাইকেল চালিয়েছিল নানকু, লোক বিশ্বাস করবে না, শিবানী ওই তিন দিন ঠায় জেগে ছিল। কখনো মাঠের ধারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকেছে, কখনো রাত জেগে জানলায় বসে থেকেছে, যেখান থেকে মাঠটা দেখা যায় না, কিন্তু আলো দেখা যায়। খুব বড় বড় সার্চ লাইটের মতো আলো জ্বলেছিল মাঠে।

যদি সে কোনোদিন নানকুর বউ হয়, কিছুতেই তাকে আর সাইকেল চালিয়ে অত কষ্ট করতে দেবে না। কী ভয়ংকর কষ্টের খেলা ওটা! পা চলতে চায় না, চোখ ঢুলে আসে ঘুমে, শরীর ভেঙে পড়তে চায়, তবু কত কষ্টে সাইকেল কেবল চালিয়েই যেতে হয় লোকটাকে। কান্না পায় শিবানীর।

রাতে শুয়ে আজ বড্ড নানকুর কথা মনে পড়ছে তার। ভালোবাসায় ভরে উঠছে বুক। তার লতিয়ে উঠতে ইচ্ছে করে ওই পুরুষকে ঘিরে। নানকু বৃক্ষ হোক সে লতা।

অনেক রাতে হঠাৎ একটা হাহাকার দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছুটে যাচ্ছিল, ওঁয়া ওঁয়া ওঁয়া। অ্যাম্বুলেন্সের আর্তনাদ। বুকটা ধক করে উঠল তার। এত রাতে কার কী সর্বনাশ হল কে জানে! হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে শিবানী বিড়বিড় করে বলল, লোকটিকে বাঁচিয়ে দিও ঠাকুর।

অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেন মধ্যরাতে আর একজনও শুনতে পেল। 'অ্যাম্বুলেন্স' শব্দটাই ভারী বিচ্ছিরি। মন খারাপ হয়ে যায়। আর ওই সাইরেন! কী ভয়ংকর আর্তনাদ ওটা! কোন ব্যথা থেকে উঠে আসছে!

দু—হাত মুঠো করে দাঁতে দাঁত চেপে রইল চম্পাকলি। তারপর হঠাৎ ঢেউয়ের মতো তার বিশেষ পুরুষটির বুকের মধ্যে মাথাটা গুঁজে দিল।

সকালে আজ ছাদে ভেজা কাপড় মেলতে মেলতে চম্পাকলি লক্ষ করল, আজ সেই চলমান সাইকেলটার কোনো পরিক্রমা নেই। বারবার ঝুঁকে ঝুঁকে দেখল সে চারদিকটা। কোথাও নেই। আধঘণ্টা বাদে বারান্দায় দাঁড়িয়ে চা খেল আস্তে আস্তে।

না নেই। বুকটা একটু ফাঁকা লাগল চম্পাকলির একে কি বিরহ বলে? হবেও বা।

# পোকা

রিক্তা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। অন্তহীন ক্লান্তি। হৃতসর্বস্বের মতো অবসাদ। বিকেল পাঁচটা বাজে। তার কাজ শেষ হয়েছে। হলঘরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে আরও কয়েকজন ক্লান্ত মানুষ। তাদেরও ছুটি হয়েছে। এবার তারাও বাড়ি যাবে। প্রত্যেকের মাথার পিছনে একটা করে উড়ন্ত পোকা। কেউ কারও সঙ্গে কথা বলল না, তাকাল না পর্যন্ত। বিষণ্ণ, উদাস মুখে তারা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল সারিবদ্ধভাবে। নিশ্চুপ। টাইম লক লাগানো দরজা ধীরে সরে গেল। তারপর চলন্ত করিডোর। দুশো মিটার দূরত্বে একটা স্থির প্ল্যাটফর্ম। নিঃশব্দে নেমে পড়ল সবাই। সামনেই এসকালেটার। ক্লান্ত কয়েকজন মানুষ আগু পিছু সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাদের মাথার পিছনে, দু—ফুট দূরত্বে সেই পোকা। দেখছে, জরিপ করছে।

দুশো মিটার উচ্চতায় মুক্তি। খোলা আকাশের নীচে পৃথিবী। চারদিকে গাছপালা। প্রথম শীতের হিমেল বাতাস বইছে। অন্ধকার নামছে মিহি ঝরোখার মতো।

পোকাগুলো কখনো শব্দ করে না। শুধু পিছু নাও, শুধু চেয়ে থাকে, শুধু জরিপ করে। কখনো একা হতে পারে না রিক্তা, কখনো নিশ্চিত হতে পারে না। সারাক্ষণ ওই পোকা তাকে দেখছে আর দেখছে। তার প্রতিটি পদক্ষেপ, নড়াচড়া, তার হার্টবিট, রক্তচাপ সবকিছুর খবর পাঠাচ্ছে একটা স্টোর হাউসে। চব্বিশঘণ্টার মনিটরিং। সে শুনেছে, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কলকবজায় তৈরি এই সব পোকারা মানুষের ইচ্ছাশক্তি, ক্ষুদ্র পিপাসা এবং এমনকী ঘুমের মধ্যে দেখা স্বপ্ন অবধি টের পায়। টের পায় বিষণ্ণতা, আনন্দ, উদ্দীপনা। মাথার পিছনে সবসময়েই উড়ছে, অনুসরণ করছে, এক পলকের জন্যও তাকে এড়ানোর জো নেই।

বাইরে গাছপালার ভিতর দিয়ে সরু একটা রাস্তা। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলে গেছে। এই রাস্তায় কোনো লোক চলাচল নেই। কোনো গাড়িও চলে না। আলো নেই, পথ ঢেকে যাচ্ছে ঘাসে, আগাছায়। রিক্তা বাঁ দিকে মস্ত গ্যারাজে ঢুকল। ভিতরে ঢুকবার দরকার নেই। দরজার মুখেই একটা প্যানেল। তাতে নম্বরের চাবি। সবাই সার দিয়ে দাঁড়িয়ে নিজের নিজের পালার অপেক্ষা করছে। ক্লান্ত হাতে নিজের নিজের কোড নম্বর স্পর্শ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। আর একটা দরজা দিয়ে গ্যারাজ থেকে বেরিয়ে আসছে গাড়ি। আপনা থেকেই।

রিক্তার গাড়িটা আর সকলের মতোই। ছোট, পলকা, গাড়ি চালানোর দরকার হয় না। কোড টিপলেই ছোট গাড়িটা টুক করে উপরে উঠে গন্তব্যের দিকে ভোঁ করে উড়ে যায়। শব্দ নেই, কাঁপুনি নেই, অন্ধকার, শূন্য ভেদ করে রিক্তার গাড়ি যখন ছুটছে, তখনও বড় অবসাদ আচ্ছন্ন করে আছে তাকে। সে একবার পিছু ফিরে পোকাটাকে দেখল। দু—ফুট দূরত্বে পোকাটা স্থির হয়ে আছে। দেখছে, জরিপ করছে।

আশেপাশে তার মতো আরও অনেক গাড়ি বিভিন্ন দিকে উড়ে যাচ্ছে। এ সব গাড়িতে কোনো জ্বালানি নেই। আছে খুব ছোট পরমাণু ইঞ্জিন। আছে আশ্চর্য বুয়োয়েনসি স্ট্যাবিলাইজার। আছে অতি ক্ষুদ্র কম্পিউটার। আছে অত্যাধুনিক যন্ত্র মস্তিষ্ক। আছে শীতাতপনিয়ন্ত্রণ। আছে মিউজিক সিস্টেম, টেলিফোন, টিভি এবং অতি আরামদায়ক আসন। এই গাড়ি কখনো দুর্ঘটনায় পড়বে না। এর যন্ত্র কখনো খারাপ হয় না। আর পরস্পরকে কখনো ধাক্কা মারে না গাড়িরা, বিনীতভাবে কাটিয়ে যায় এ ওকে, ও একে।

রিক্তার কিছু করার নেই। সে চোখ বুজে এসে রইল।

রিক্তা তার বাঁ হাঁটুর কাছে একটা সুরসুরি টের পাচ্ছিল। চোখ চেয়ে যা দেখল, তা আতঙ্কিত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। একটা কাঁকড়াবিছে হাঁটুর উপর উঠে এসেছে পাতলুন বেয়ে। রিক্তা সভয়ে চেয়েছিল। এ ঘটনা আগে কখনো ঘটেনি। কোথা থেকে এল বিছেটা? আচমকাই পোকাটা ছুটে এল সামনে। রিক্তা দেখতে পেল পোকাটার মুখে ঝকঝক করছে একটা সরু ছুঁচের মতো কিছু। চোখের পলকে বিছেটার উপর গিয়ে পড়ল

পোকাটা। তারপর ছুঁচে বিঁধে সেটাকে নিয়ে গেল রিক্তার পিছনে, মাথার দু—ফুট দূরত্বে। রিক্তা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, পোকার মুখে বিছেটা ছটফট করছে। তারপর। ধীরে ধীরে বিছেটা নির্জীব হয়ে গেল। স্থির হয়ে গেল। তারপর রিক্তা দেখল, বিছের নিথর দেহটা যেন এক তীব্র তাপে কুঁকড়ে ছোটো হয়ে যাচ্ছে। অঙ্গার হয়ে যাচ্ছে। ছাইগুলো খসে পড়ল নীচে। একটা সাকশন যন্ত্র চালু হল পায়ের তলায়।

ছাইগুলো উধাও হয়ে গেল। ঘটনাটার আর কোনো চিহ্ন রইল না।

রিক্তা চোখ মেলে বসে রইল। জঙ্গলের উপর দিয়ে গাড়িটা উড়ে যাচ্ছে। নীচে ঘনায়মান অন্ধকার। জঙ্গল বাড়ছে। পৃথিবী সবুজ হচ্ছে ক্রমে। জনসংখ্যা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। পৃথিবীতে খাদ্য ও সম্পদের আর কোনো অভাব নেই। অভাব নেই স্বাধীনতারও।

রিক্তা কি স্বাধীন? সে একবার পোকাটার দিকে ফিরে চাইল। মাথার দু—ফুট পিছনে স্থির হয়ে ভেসে আছে। রক্ষক? না, গত দশ বছরেও রিক্তা ঠিক বুঝতে পারল না পোকাটার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক তৈরি হয়েছে কি না। এক হাজার মিটার নীচে গাছপালায় ঘেরা একটা বাড়ি হঠাৎ ঝলমল করে উঠল। বাড়ির ছাদের উপর সবুজ আলোয় লেখা, সেক্টর থ্রি। এটাই রিক্তার বাড়ি। একটা আশিতলা স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাস। ছাদে গাড়ি নামা আর রাখার জায়গা। নীচে হাজারো ফ্ল্যাট। নীচের তলায় বাজার, হাসপাতাল, পোস্ট অফিস, সুইমিং পুল ইত্যাদি।

মানুষ একা থাকে। কারও সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রচিত হয় না। বিয়ে নেই। তবে নরনারীর মিলন অবাধ ও ইচ্ছাধীন। প্রয়োজনে সন্তান হয় বটে, কিন্তু সন্তানের সঙ্গে মায়ের কোনো সম্পর্ক নেই। সন্তান বড় হয় ক্রেশে এবং পরবর্তীকালে শিশু নিকেতনে। মা বা বাবার পরিচয় বলে তার কিছু থাকে না। রিক্তার গাড়ি ছাদে নেমে এল। দরজা খুলে গেল। অবসন্ন রিক্তা নেমে এল। পাশেই আর একটা গাড়ি থেকে দুটি মানুষ নেমেছে। একজন পুরুষ, অন্যজন মেয়ে। তারা কথা বলছে না। নেমে সিঁড়ির দিকে হেঁটে চলে গেল। ওরা হয়তো রাতে একসঙ্গে থাকবে। কেউ কারও নাম বা পরিচয়ও হয়তো জানতে চাইবে না। সকালেই যে যার নিজের জায়গায় চলে যাবে। জীবনে হয়তো আর দেখাও হবে না।

বাড়িটার গঠন সাধারণ। যেমনটা হয় আজকাল। একটা চত্বর ঘিরে বাড়িটা চৌকোনা গড়ে ওঠে। মাঝখানটা ফাঁকা। অনেকখানি জায়গা মাঝখানে। উপর থেকে নীচ অবধি দেখা যায়। এই ফাঁকা জায়গাটার মাঝখানে কয়েকটা লিফট বিদ্যুৎগতিতে ওঠানামা করছে। লিফট পর্যন্ত যাওয়ার জন্য আছে সরু ক্যাটওয়ে। ক্যাটওয়েগুলো কাচের টিউবের মতো, উপর—নীচ আশপাশ সব স্পষ্ট দেখা যায়। আশিতলা থেকে নীচের দিকে তাকালে একটু ভয়—ভয় করে রিক্তার। হাতে সময় থাকলে সে চলন্ত সিঁড়ি দিয়েই নামে। আজ তার শরীরে বড় অবসাদ। সে ক্যাটওয়ে দিয়ে হেঁটে লিফটের কাছে এল। কাচের স্বচ্ছ লিফট। রিক্তার ভয়—ভয় করে।

লিফট জানে সে পঁচিশ তলায় যাবে। তার বশংবদ পোকাটা সম্পূর্ণ কোডেড। ওই পোকার কোড বুঝে নিয়ে লিফট নামতে লাগল অনেকটা পতনের মতো দ্রুতবেগে।

তারপর থামল। ক্যাটওয়ে ধরে এসে চলন্ত করিডোরে পা রাখল সে। নিজের ফ্ল্যাটের সামনে এসে করিডোর থেকে প্ল্যাটফর্মে উঠল।

দরজার তালা চাবি কিছু নেই। এখানেও কোড। সে দরজার সামনে দাঁড়াতেই দরজা খুলে গেল।

একখানা ছোট বসবার ঘর। একখানা আরও ছোট শোওয়ার ঘর। খেলাঘরের মতো ছোট একটু রান্নার জায়গা। টয়লেট। কাচের শার্সি দিয়ে একটা দেওয়াল তৈরি হয়েছে। পর্দার ব্যবস্থা নেই, কিন্তু সুইচ টিপলেই স্বচ্ছ কাচ সম্পূর্ণ অস্বচ্ছ হয়ে যায়। ঘরে ঢুকতেই একটা রোবট এগিয়ে এসে তার পোশাক খুলে দিল। পরিয়ে দিল ঘরের সংক্ষিপ্ত পোশাক। চায়ের জল চড়িয়ে দিল রান্নাঘরের আগুনবিহীন উনুনে। আজকাল আগুনের চল নেই। রান্না হয় একটা ইথারিয় কম্পনে।

রিক্তা দু চুমুক চা খেল। রোবট বাথরুমে গিয়ে টাবে তার জন্য সঠিক তাপমাত্রায় স্নানের জল তৈরি করল। চালু করল গানের ক্যাসেট। তারপর তার গা ম্যাসাজ করে দিতে লাগল। রোবটের হাতে প্যাড লাগানো। ম্যাসাজটা চমৎকার। ম্যাসাজ নানারকম হয়। সেইভাবে প্রোগ্র্যাম করে দিতে হয় রোবটকে।

ম্যাসাজের মাঝপথে হঠাৎ প্রোজেক্ট কোনো সংকেত দিল, টুং, দেওয়ালের গায়ে হঠাৎ একটা চৌখুপি আলোকিত হল। একটা মেয়ের মুখ। একে চেনে না রিক্তা।

মেয়েটা তার দিকে চেয়ে হঠাৎ ধমকের স্বরে বলল, আমি কে?

রিক্তা বলল, তার আমি কী জানি! আই ডি—কে জিজ্ঞেস করো।

আই ডি হল আইডেন্টিটি ডিপার্টমেন্ট। মানুষ একা থাকতে থাকতে মাঝে মাঝে একটু নিজেকে হারিয়ে ফেলে। আজকাল প্রায়ই এটা হয়। আই ডি তখন তার পরিচয় ধরিয়ে দেয়।

মেয়েটা রাগের গলায় বলল, ওরা ভুল।

বলছে।

কী বলছে?

বলছে আমি জবা।

তা হলে তাই।

না। আমি জবা নই। আমি পূর্ণা। আমার সেক্টর ফোর। আই ডি বলছে থ্রি। ওরা ভুল বলছে।

ওরা যা বলছে তাই ঠিক। মেনে নাও।

কী করে মানব? আমি তো পূর্ণা।

না, তুমি জবা।

কিছুতেই না। তুমি দেখতে বেশ সুন্দর তো!

রিক্তা ভ্রূ কোঁচকাল, সুন্দর! সুন্দর দিয়ে আজকাল কিছু হয় না।

কেন হবে না? তুমি সুন্দর।

তুমিও সুন্দর। আজকাল সবাই সুন্দর। যারা সুন্দর নয়, তারাও কসমেটিক সার্জারি করে সুন্দর হয়ে যায়।

না, তুমি অন্যরকম সুন্দর। আমার ঘরে আসবে? একাত্তর তলায়, ফ্ল্যাট বি ফোর।

চার নম্বর ক্যাটওয়ে।

আমি খুব টায়ার্ড।

আমি যে জবা নই। কী মুশকিল!

না হলেই বা। যা—ই হও, কিছু যায় আসে না।

তুমি কে?

আমি রিক্তা।

আমি তোমার কাছে একটু আসতে পারি?

না। আমি ক্লান্ত। আমি এখন স্নান করব।

তারপর ঘুমোবো।

ঘুমোবে? কী আশ্চর্য, আমি ঘুমোতে পারি না।

ঘুমোনো তো সোজা। স্বপ্ন পালঙ্কে শুয়ে পড়লেই ঘুম আসবে। কত শুয়েছি, তবু ঘুমোতে পারি না।

হতেই পারে না। স্বপ্ন পালঙ্ক অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি। ঘুম হবেই।

আমার হয় না।

তা হলে হাসপাতালে যাও।

ভয় করে।

ভয়! ভয় কীসের?

মন্দিরা তো হাসপাতালে গিয়েছিল। ওরা ওকে পাঁচশো বছরের জন্য ঘুম পাড়িয়ে দিল। বলল, ওর যা সব নার্ভের কমপ্লিকেশন তা পাঁচশো বছর ঘুমোলে তবে ঠিক হবে।

আমাকেও যদি তাই করে?

করুক না। ভালোই তো।

আমি অতদিন ঘুমোতে চাই না। ওটা তো মৃত্যু। পাঁচশো বছর পর কি আমার মনে থাকবে আমি কে?

তোমার তো এখনও মনে নেই তুমি কে।

আমি পূর্ণা।

আই ডি তো তা বলছে না।

ওরা ভুল বলছে।

রিক্তা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রোবটকে বলল, ফোটটা অফ করে দাও।

ফোনটা অফ হয়ে গেল।

মাঝে মাঝে সমস্যাটা রিক্তারও হয়। দিনের পর দিন কেউ তার নাম ধরে ডাকে না। কেউ কথা বলে না। মুখের দিকে তাকায় না।

তখন মাঝে মাঝে হঠাৎ মনে হয়, আরে, আমি কে?

রিক্তা স্নান করল। রোবট তার খাবার তৈরি করে সাজিয়ে দিল টেবিলে। একটু স্যুপ, একটু সবজি সেদ্ধ। খাওয়ার পর রিক্তা তার স্বপ্ন পালঙ্কে শুয়ে পড়ল। ঘুমের আগে দেখে নিল, পোকাটা তার ব্রহ্মতালুর ঠিক দু—ফুট পিছনে ভেসে আছে।

স্বপ্ন পালঙ্ক এক আশ্চর্য প্রযুক্তি হল। এই পালঙ্কে শুলেই একটা মৃদু কম্পন, শব্দ, সুর ও আবেশ মানুষকে আচ্ছন্ন আর শিথিল করে দেয়। তবু মেয়েটার ঘুম আসছে না কেন? রিক্তা ঘুমিয়ে অনেকক্ষণ ধরে একটা স্বপ্ন দেখল। পৃথিবীতে কেউ নেই। সে একা বেঁচে আছে। একদম একা। সে একটা নদীর ধারে মৃদু পায়ে পায়চারি করছে। তার মাথার পিছনে পোকাটা। দেখছে, জরিপ করছে।

হঠাৎ রিক্তা পোকাটার দিকে চেয়ে বলল, এখনও কেন আমাকে অনুসরণ করছ? কার জন্য? আমি তো একা...একা...একা... পোকাটা তবু বিচলিত হল না।

রিক্তা তখন মিনতি করে বলল, এ বার ছাড়ো আমাকে। একবারটি ছাড়ো। আমাকে সত্যিকারের একা হতে দাও। একবারটি... পোকাটা নড়ল না।

রাত দুটোয় ঘুমের চটকাটা ভেঙে গেল রিক্তার। সে উঠে বসল। রোবট এগিয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে।

রিক্তা বলল, শোনো, জবা নামে মেয়েটিকে ট্র্যাকে করো। আমাকে ওর ঘরে প্রোজেক্ট করো।

দেওয়ালে ছবি ভেসে উঠল। জবা চুপ করে একটা চেয়ারে বসে আছে।

জবা! এই জবা!

আমি পূর্ণা।

আমি তোমার ঘরে একটু আসতে পারি?

এসো। আমার খুব অদ্ভুত লাগছে। আমি কি দুজন? জবা এবং পূর্ণা!

জবার ঘরে পৌঁছোতে বেশি সময় লাগল তার। অবিকল তারই মতো একটা ফ্ল্যাটে থাকে জবা। সব কিছুই এরকম। দরজা খুলে দিল রোবট, কারণ এই দরজা তো রিক্তার কোডে খুলবে না।

আমি রিক্তা।

তুমি বেশ সুন্দর।

তোমার ঘুম আসছে না?

না। আজ ঘুম আসছে না। আজ আমার আইডেন্টিটির প্রবলেম হচ্ছে। জানো, আমি পোকাটাকে মেরে ফেলেছি?

রিক্তা স্তম্ভিত হয়ে বলল, মেরে ফেলেছো? কী করে?

আমার কাছে একটা রে গান আছে। তাই দিয়ে।

ও মা! কেন মারলে?

আমাকে একটুও একা হতে দেয় না যে!

সর্বনাশ! এর শাস্তি কী জানো?

জানি। ওরা আমাকে বদলে দেবে তো! দিক না। আমার আর এ রকম থাকতে ভালো লাগছে না।

ওরা তোমাকে হাফ মেকানিক্যাল হাফ হিউমান ফর্ম দিয়ে পাঠাবে কায়িক শ্রমের জায়গায়। সেখানে অবিশ্রান্ত কাজ আর কাজ।

জানি। তাও ভালো।

রিক্তা হঠাৎ চুপ করে গেল। তার সব কথা ও প্রতিক্রিয়া রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে। কাজটা ভালো হচ্ছে না। সে হঠাৎ বলল, তোমার অস্ত্রটা কোথায়?

ওই যে। টেবিলে পড়ে আছে।

রিক্তা হঠাৎ কিছু না ভেবে—চিন্তে অস্ত্রটা তুলে নিল হাতে। তারপর ঘুরে হঠাৎ ট্রিগার টিপে দিল।

একটা ঝলকানি। নীলচে বিদ্যুৎ। পর মুহূর্তেই পোকাটা যেন বিস্ফোরিত হয়ে গেল।

রিক্তা অবাক হয়ে দেখল, পোকাটা আর নেই। কোথাও নেই। দশ বছর ধরে ছিল। এখন নেই।

রিক্তা জবার দিকে চেয়ে হঠাৎ একটু হাসল।

জবাও হাসল।

তারপর দুজনেই বহু বহু বছর পর খুব হাসতে লাগল। ভীষণভাবে।

# সুভাষিণী

আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না তো। আমি আপনাকে চিনতে পারছি না।

একদম না?

আমার আপনাকে চেনার কথা?

হ্যাঁ।

তাহলে চিনতে পারছি না কেন?

মানুষ যদি কিছু ভুলে যেতে চায়, তাহলে সে নিজের মস্তিষ্ক থেকে ওই অনভিপ্রেত স্মৃতি মুছে ফেলতে পারে।

তাই যদি হয় তাহলে কি এটাও সম্ভব যে, মানুষ তার কিছু প্রিয় ভুলে যাওয়া স্মৃতিকে ফের জাগিয়েও তুলতে পারে?

সেটা আমি জানি না। আমি সাইকিয়াট্রিস্ট নই।

নন?

না।

মানুষের মনের অনেক সমস্যা, সবটাই কি সাইকিয়াট্রিস্টরা জানে? মন বা স্মৃতি কোনোটাই মানুষের বশীভূত তো নয়। সাইকিয়াট্রিস্টেরও মানসিক সমস্যা হতে পারে।

সেসব আমার জানা নেই। আমি আপনাকে একটা কথা বলার জন্য এসেছি।

বলুন। কিন্তু তার আগে বলুন, আপনাকে আমি যদি চিনতামই ভুলতে চাইবার কি কোনো বিশেষ কারণ আছে?

হয়তো আছে।

আমি সম্প্রতি একটা লস অফ মেমরি থেকে ভুগছি। ডাক্তার বলেছে ইট ওয়াজ এ মেন্টাল শক। কী জানি, হতেও পারে। কিন্তু ভাইরাল অ্যাটাকে যেমন কম্পিউটারের মেমরি উড়ে যায়, আমারও ঠিক সেরকমই কিছু হয়েছে। আপনি যদি একটু খুলে বলেন, তাহলে আমি আমার হারানো স্মৃতি ফিরিয়ে আনার একটা চেষ্টা করতে পারি। ইন ফ্যাক্ট, আমি এখন সারা দিন এই বারান্দায় বসে সেই চেষ্টাই করে যাচ্ছি রোজ।

আপনার চাকরিটা কি গেছে?

চাকরিটা এখনও যায়নি বটে, তবে যাবে। আমি লম্বা ছুটিতে আছি। অসুখের ছুটি। কোম্পানি কতদিন ছুটি বহাল রাখবে বলা মুশকিল। আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন, চেয়ার তো খালি রয়েছে। বসুন। এবং একটু ডিটেলসে বলুন, আমি আপনাকে কীভাবে চিনতাম।

তখন আমি ফ্রক পরি, স্কুলে যাই, তেরো বছর বয়স। আপনার বয়স হয়তো তখন বাইশ—তেইশ। তেজি, টগবগে, প্রাণবন্ত একজন যুবক। খুব যে হ্যান্ডসাম ছিলেন তা নয়, তবে ফিগারটা দারুণ ছিল। আমাদের শহরের মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন আপনার বাবা। আপনাদের ট্রাকের ব্যবসা ছিল। ষাট—সত্তরখানা ট্রাক। এসব নিশ্চয়ই আপনি ভুলে যাননি!

ঠিক ভুলে যাইনি! তবে একটু আবছা। যেন পূর্বজন্মের কথা।

সেই তখন আপনাকে আমি প্রথম দেখি, দশ বছর আগে।

দশ বছর! দশ বছর তো অনেকটা সময়!

তেরো বছর বয়সে আমার না ছিল রূপ, না কোনো গুণ।

দাঁড়ান, দাঁড়ান! কোথাও একটা গন্ডগোল হয়েছে।

কীসের গন্ডগোল?

আপনি বরং একটু ধীরে ধীরে বলুন। আমি বুঝতে পারছি না।

না বোঝার মতো কিছু বলিনি তো! রূপহীনা, গুণহীনা এক ত্রয়োদশীর কথাই তো বলছি।

আপনার গুণের কথা আমি জানি না। কিন্তু আপনাকে রূপহীনা বলে মনে হচ্ছে না তো! আপনি কি দেখতে খারাপ? আজকাল হয়তো সুন্দর কুচ্ছিতের সংজ্ঞাও আমি গুলিয়ে ফেলেছি।

আমি আমার তেরো বছর বয়সের কথা বলছি। কালো, রোগা, গাল—বসা কোটরগত চোখের একটা মেয়ে, যার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করলেও চলে। আপনি তখন আমাদের সেই শহরের বেশ একজন চোখটানা পুরুষ। ফুটবল খেলেন, পাহাড়ে চড়েন, লোকের উপকার করে বেড়ান, আবার তেমনই লাফাঙ্গা, বদমাশ, মেয়েবাজ ছেলে। মনে পড়ে?

একটু একটু মনে পড়ে। তবে বড্ড কুয়াশায় ঢাকা। আমি খুব খারাপ ছিলাম, না?

সেটা বললে অন্যায় হবে। খারাপ ছিলেন, আবার ভালো কাজও তো করেছেন। সেই ভয়ংকর বন্যার বছরে যখন শহর চার—পাঁচ ফুট জলের তলায় ডুবে গিয়েছিল, তখন আপনি নাওয়া—খাওয়া ভুলে কত লোককে এনে স্কুলবাড়ি আর ইনস্টিটিউটে পৌঁছে দিয়েছেন, রিলিফের জোগাড় করেছেন। এমনকী মার্চেন্টদের কাছ থেকে চাল ডাল কেড়ে এনেছেন।

হবে হয়তো।

মফস্সলে আপনার গ্রুপ থিয়েটারের খুব নাম ছিল। আপনি অভিনয়ও বেশ ভালোই করতেন। শুনেছি আপনি সিনেমায় নামবার চেষ্টা করছেন।

তাই নাকি? কিন্তু আপনার সঙ্গে কি তখনই দেখা হয়েছিল?

আমাকে আপনি রাস্তায়—ঘাটে, ফাংশনে বা আরও অনেক জায়গায় অনেকবার দেখেছেন, কিন্তু কখনো লক্ষ করেননি। করারও কথাও নয়। লক্ষ করার মতো তো ছিলাম না।

তা হবে।

আপনি দেবযানীদির সঙ্গে প্রেম করতেন। আবার রুচিরার সঙ্গেও। এবং নন্দিনীও ছিল আপনার প্রেমিকা। এই নন্দিনী ছিল আমার দিদি। আপনার মনে নেই?

বড় লজ্জায় ফেললেন। দেবযানীর কথা খুব সামান্য মনে পড়ছে। তার বাঁ গালে জড়ুল বা আঁচিল গোছের কিছু একটা ছিল বোধহয়। তাই না?

ছিলই তো।

ব্যস, ওইটুকু মনে আছে, বাকিটা নয়। আপনার দিদি—কী নাম বললেন যেন!

দু—বার। প্রথমবারের বিয়ে ভেঙে যায়। দ্বিতীয়বার বিয়ে করে এখন জার্মানিতে আছে।

না, তাকে আমার একদমই মনে পড়ছে না।

দিদিকে মনে না—পড়াটা আশ্চর্যের কথা। দিদি শুধু সুন্দরীই ছিল না, দারুণ গান গাইত। শহরে এবং অন্যান্য জায়গায় ফাংশনের মধ্যমণি ছিল। পরে রেডিও আর টিভিতে অনেক প্রোগ্রাম করেছিল।

আপনি আর বলবেন না। খুব বেশি রেফারেন্স দিলে আমার মাথার ভিতরে একটা ওলটপালট হতে পারে। মেমরি আরও গুলিয়ে যায়। খুব হতাশ লাগে তখন।

কিন্তু আপনিই তো বললেন, কথা বললে মেমরি রিচার্জ হতে পারে।

হ্যাঁ, সেও ঠিক। তবে খুব উপর্যুপরি রেফারেন্স দিলে আমি সূত্র হারিয়ে ফেলি।

সরি, আমি বুঝতে পারিনি।

আপনার তো দোষ নেই। আমিই কীরকম যেন হয়ে গেছি।

আমি কিন্তু দিদির কথা বলতে আসিনি।

তাহলে বরং তার কথা থাক। তাকে বোধহয় আমার মনে পড়বে না। সুন্দরী বা গায়িকা যাই হোক। বরং কালো, রোগা, ইনসিগনিফিক্যান্ট যে, মেয়েটির কথা বলতে চাইছেন—অর্থাৎ আপনার কথা বলুন।

আমার কথা! না আমাকে আপনার মনে পড়ার কোনো কারণই নেই। রূপবতী, গুণবতীদেরই যখন মনে নেই, তখন আমাকে তো মনে পড়ার কথাই নয়।

কী জানেন, অনেক কথাই মনে পড়ে না বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে খুব তুচ্ছ, সামান্য অর্থহীন ছোট ছোট ছবির মতো দৃশ্য মনে পড়ে। কেন মনে পড়ে তা বুঝতে পারি না। যেমন ধরুন, একটা বৃষ্টির দিনের কথা মনে আছে। স্কুলবাড়ির গাছতলায় সবুজ জামা গায়ে একটা ছেলে একটা ছাগলকে কাঁঠালপাতা খাওয়াচ্ছে আর গলা জড়িয়ে ধরে আদর করছে, এই দৃশ্যটা কেন মনে পড়ে বলুন তো। কিংবা ধরুন, সেই যে যেবার আকাশে একটা বিরল ধূমকেতু দেখা গিয়েছিল। আমরা ভোররাতে প্রচণ্ড শীতে ছাদে সেই ধূমকেতু দেখতে উঠতাম। একটা ভোরে কে একজন পাশের ছাদে ভরাট গলায় একটা রবীন্দ্রসংগীত গাইছিল, আর আমার কেন যেন গান শুনে খুব মৃত্যুর কথা মনে হয়েছিল।

আর কিছু মনে পড়ে না?

হ্যাঁ, এইরকমই ছোট ছোট চৌখুপির মতো দৃশ্য বা শব্দ। ঠিক যেন একটা অন্ধকার খামের গায়ে এলোমেলো সংগতিহীন কয়েকটা ডাকটিকিট সাঁটা। একটার সঙ্গে আর একটার কোনো পারম্পর্য নেই। তবু যে মনে পড়ে, তার কারণ হয়তো এইসব স্মৃতি বোধহয় উপেক্ষা করার মতো নয়। মনে পড়ার কারণ আছে।

সেটা বোধহয় সব মানুষেরই আছে। আমারও এমন সব কথা মনে পড়ে যার কোনো মানেই হয় না। আমাদের বাড়িতে লাঠিতে ভর দিয়ে একটা বুড়ো ভিখিরি আসত। কেন কে জানে, ওই লাঠিটার কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে। সাধারণ বাঁশেরই লাঠি, তবে গাঁটে গাঁটে আঁকাবাঁকা। তিরিক্ষি ছিরির একটা লাঠি। সব ছেড়ে ওই লাঠিটাকেই কেন মনে পড়বে বলুন। অমন অবাক হয়ে চেয়ে আছেন কেন বলুন তো!

আমি পরের যে—ঘটনাটা আপনাকে বলতে যাচ্ছিলাম তা ওই লাঠিকা নিয়েই।

সে কী?

ওই বুড়ো ভিখিরিটার নাম ছিল দেলু। মা ওকে খুব ভালোবাসত। বহুদিন বসিয়ে ভাই খাইয়েছে। লোকটার ভালো একটা নামও ছিল। বোধহয় দিলদার সিং। সেই বাঁশের বাঁকা লাঠিকার কথা আমার যখনই মনে পড়ে, তখনই দিলদারকেও যেন দেখতে পাই। কাঁচামিঠে আমগাছটার তলায়, পাশে লাঠিখানা রেখে উবু হয়ে বসে কলাইকরা থালায় ভাত খাচ্ছে।

আশ্চর্য তো! ওই লাঠিটার কথা আপনারও মনে আছে?

হ্যাঁ। খুবই অবাক কাণ্ড! দেলুর লাঠির কথা মনে রেখেছে এমন লোক বোধহয় পৃথিবীতে খুবই বিরল।

আর কী মনে আছে আপনার?

উমমম! দাঁড়ান, ভাবতে দিন। মুশকিল কি জানেন, চেষ্টা করলে তেমন মনে পড়ে না। কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ এক একটা ছবি যেন অন্ধকারে ভেসে ওঠে। মস্তিষ্ককে বেশি তাড়না করলে একটা যন্ত্রণা হয়। ভয় হয় গোটা মেমরি ডিস্কটাই না শেলেটের মতো মুছে যায়। কিন্তু আপনি আমার কাছে কেন এসেছেন তা এখনও জানি না।

ধরুন, এমনিই। আমরা এক শহরে বাস করতাম, ছেলেবেলায় আপনি আমার কাছে খানিকটা হিরোও তো ছিলেন। মনে করুন সেই হিরোকেই একটু দেখতে আসা।

ভালো, খুব ভালো। আজকাল কেউ বড় একটা আসে না। এখানে খুব হাওয়া বয়, বেশ শীত। সারা দিন এই খোলা বারান্দায় বসে থাকি। শালগাছে বাতাসের যে শব্দটা হয় সেটা অনেকটা হাহাকারের মতো, মন খারাপ লাগে। আর এ বাড়িটার অনেক গাছ। এত বড় বড় গাছ থাকায়, আমি বাইরেটা খুব ভালো দেখতে পাই না।

এ বাড়িটা বুঝি আপনারা কিনেছেন?

হ্যাঁ। বাবাকে ডাক্তার বুঝিয়েছে, নির্জন স্বাস্থ্যকর জায়গায় আমাকে রাখতে। তাই এ বাড়িটা কেনা হয়েছে।

আপনি বেড়াতে যান না!

মর্নিং ওয়াক? না। আমার ওসব ভালো লাগে না। সন্ধেবেলা ছাদে অনেকক্ষণ পায়চারি করি। এখানে খুব ঠান্ডা পড়ে। সন্ধের পর আমাদের ছাদটায় খুব হিম বাতাস বয়ে যায়। আর ভীষণ অন্ধকার। খুব কুয়াশা না হলে আকাশভরা তারা দেখা যায়। বেশ লাগে তখন পায়চারি করতে। হাসছেন কেন?

এমনিই। ভাবছিলাম বড়লোক হওয়ার কত সুবিধে। আপনার ডিমেনশিয়া হয়েছে বলে আপনার বাবা ঝাড়গ্রামে আস্ত একটা শালবনসুদ্ধু দোতলা বাড়িই কিনে ফেললেন আপনার দেহমন ভালো রাখার জন্য। আমাদের মতো গরিবদের এর চেয়ে অনেক বেশি শক্ত রোগ হলেও কিছু করার থাকে না।

ঝাড়গ্রাম! হ্যাঁ, ঝাড়গ্রামই তো বললেন! এই নামটা দিনের মধ্যে আমি আমি যে কতবার ভুলে যাই! আপনার বাড়ি বুঝি এখানেই?

না। আমি কাছাকাছি একটা কলেজে পড়াই। খুব সম্প্রতি, মাত্র মাস ছয়েক আগে জয়েন করেছি।

গরিব আর বড়লোকের ব্যাপারটা আপনি ঠিকই বলেছেন। বড়লোক হওয়ার কিছু অন্যায্য সুবিধে আছে। কিন্তু তার জন্য শুধু বড়লোকদের দোষ দিয়ে বা মুন্ডুপাত করে লাভ নেই। বড়লোকেরা এই সামাজিক সিস্টেমটা তৈরি করেনি। আমি অনেক ভেবে দেখেছি, এ দেশের সিস্টেমটাই এরকম। তবে আমাদের অবস্থা কিন্তু আগের মতো ভালো নেই।

জানি। আপনার বাবার নামে অনেকগুলো মামলা ঝুলছে। ট্রাকের ব্যবসা মার খেয়েছে। আপনার দাদা দীপঙ্কর জেল খাটছেন।

হ্যাঁ। আপনি তো সবই জানেন। চিরকাল তো কারও সমান যায় না। বেশ একটা দুঃসময় চলছে আমাদের।

এসব কথা তো আপনার বেশ মনে আছে দেখছি।

ইমিডিয়েট পাস্ট, অর্থাৎ অনতি অতীত বেশ মনে করতে পারি, কিন্তু তার বেশি অতীতটাই কুয়াশা ঢাকা। আবার একটু একটু করে এই অনতি অতীতও যে মুছে যাচ্ছে তাও টের পাই। তখন খুব ভয় করে। এক বছর আগে আমাদের বাড়িতে একটা গ্যাস সিলিন্ডার লিকেজ হয়ে আগুন লেগে যায় এবং তাতে আমার বোন টিকলি ভীষণভাবে পুড়ে যায়। পরে সে মারাও গেছে। এই ঘটনাটা আমি কি করে যে ভুলে গিয়েছিলাম কে জানে। সেদিন সুবল আমাকে ঘটনাটা মনে করিয়ে দিয়েছিল।

টিকলিদির জন্য আমরা সবাই খুব দুঃখ পেয়েছি। খুব ভালো ছিলেন টিকলিদি। জামাইষষ্ঠীতে বাপের বাড়িতে এসেছিলেন। ভাগ্য খারাপ থাকলে কত কী হয়। সেদিনই নতুন সিলিন্ডার লাগানো হয়েছিল আর টিকলিদি গিয়েছিলেন বিরিয়ানি রাঁধতে।

অত ডিটেলস আমার মনে নেই। টিকলির মুখটাও স্পষ্ট মনে পড়ে না।

ওঁর একটা মেয়ে আছে, না?

আছে বোধহয়। হ্যাঁ, আছে।

আপনি সুবলের কথা বললেন, সুবল কে?

আমার দেখাশোনা করে। পুরোনো লোক।

আপনি ভালো ব্যাডমিন্টন খেলতেন, মনে আছে?

ব্যাডমিন্টন! হয়তো খেলতাম।

মনে নেই আপনার?

না। খেলাটা ভালো নয়।

কেন, ব্যাডমিন্টন তো বেশ একটা খেলা।

শাটল কক কী দিয়ে তৈরি হয় জানেন?

পাখির পালক।

হাজার হাজার শাটল কক তৈরি করার জন্য এত পালক ওরা পায় কোথায়? ওরা কি পাখি মেরে পালক উপড়ে নেয়?

আমি তা জানি না।

আমার সন্দেহ, শাটল ককের জন্য পাখি মারা হয়।

হতেও পারে।

পাখির মতো এমন সুন্দর আর আশ্চর্য প্রাণী আর হয় না, না? আমি আজকাল চারদিকে অনেক পাখি দেখতে পাই। তাদের ডাক শুনি। আজকাল আমার কাকের ডাকও ভালো লাগে। হাসছেন যে!

ভাবছি আপনি মুরগি খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন কিনা। আপনার মা খুব শুদ্ধাচারী মহিলা ছিলেন বলে হেঁসেলে মুরগি ঢুকতে দিতেন না। আপনি আর আপনার বন্ধুরা বাড়ির পিছনের উঠোনে মুরগি কেটে রান্না করে খেতেন, মনে নেই? ও কী, অমন সাদা হয়ে গেলেন কেন?

না, না, ও কিছু নয়। আমার মনে হয় অস্বচ্ছ অতীতে আমি এমন সব কাজ করেছি যা মনে না পড়াই বোধহয় ভালো। না, এখন আমি মুরগি খাই না। মাছমাংস কিছুই খাই না।

বৈরাগ্য এল বুঝি!

ঠাট্টা করছেন! বৈরাগ্য তো সহজ ব্যাপার নয়! তবে সহনশীলতা বলে একটা কথা আছে না? বোধহয় সেইটে এসেছে। নাকি, কে জানে, আমি হয়তো ধীরে ধীরে কাঠ বা পাথরের মতো হয়ে যাচ্ছি।

ও কথা বলছেন কেন?

কিছুদিন আগে আমাকে একটা কাঁকড়াবিছে হুল দিয়েছিল। ডান পায়ের বুড়ো আঙুল। সে যে কী অসহ্য যন্ত্রণা, মনে হচ্ছিল হার্ট ফেল হয়ে মরে যাব। সুবল একটা হাতুড়ি নিয়ে বিচেটাকে মারতে এসেছিল। ও নাকি তুক জানে, কাঁকড়াবিছের রস লাগালে ব্যথা কমে যায়। আমি ওকে মারতে দিইনি। মেরে কী হবে বলুন। বেচারা তো নিজেই জানে না যে, ওর বিষ এতটা মারাত্মক। মানুষের কত অস্ত্রশস্ত্র আছে, ওদের তো ওই হুল বা দাঁত বা নখ বা হিং—ই ভরসা।

গাঁধীবাদী হতে বারণ করছি না। তবে পেস্ট কন্ট্রোল এজেন্সিকে খবর দিয়ে বাড়ি থেকে পোকামাকড় তাড়িয়ে দেওয়াই ভালো। দাঁত নখ হুলের সঙ্গে সহাবস্থান মোটেই নিরাপদ নয়। আমি জুলজিস্ট, পোকামাকড় সম্পর্কে আপনার চেয়ে একটু বেশি জানি। কাঁকড়াবিছের বিষে মানুষ মারাও যায়। আপনি ডাক্তার ডাকেননি?

না।

খুব অন্যায় করেছেন।

একটা অদ্ভুত ব্যাপার হল যে।

কী হল?

খবর পেয়ে একটা লম্বাপানা লোক এল। এ পাড়াতেই থাকে। সেই লোকটা আমাকে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে মাথায় মগের পর মগ জল ঢালতে লাগল। বিড়বিড় করে কী একটা মন্ত্রও পড়ছিল। জল ঢালতে ঢালতে আমার সর্বাঙ্গ ঠান্ডা হয়ে কাঁপুনি ধরে গিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, জল ঢালার পর আমার ব্যথাও একদম কমে গেল।

যাঃ! ওই বিষের ব্যথা উইদাউট মেডিকেশন চব্বিশ ঘণ্টা থাকার কথা। শুধু জল ঢাললে ব্যথা কমার কথাই নয়।

কিন্তু কমল যে!

আপনি এখানে থাকতে থাকতে অন্ধ বিশ্বাস বা বুজরুকিও মানতে শুরু করেছেন।

তাই হয়তো হবে, কিন্তু ব্যথাটা সত্যিই ছিল না আর।

ঠিক আছে, আপনার কথাই মানছি।

আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে আপনি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না। ঠোঁটে একটু চাপা হাসি, চোখে একটু বিদ্রুপের চাউনি। আজকাল আমি অবশ্য কাউকেই কিছু বোঝাতে পারি না। এমন কী, সুবল অবধি আমার অনেক কথা সিরিয়াসলি নেয় না।

আমি ভাবছি মানুষ অনেক সময়ে যা বিশ্বাস করতে চায় সেটাই ঘটে যায়। আপনি হয়তো খুব জোরের সঙ্গে লোকটার অলৌকিক ক্ষমতাকে বিশ্বাস করেছিলেন, আর সেই জোরেই হয়তো ব্যথাও কমেছে। মানুষ মন দিয়ে কত কী করতে পারে। কিংবা লোকটা হয়তো আপনাকে হিপনোটাইজ করেছিল।

আপনি পারেন?

কী?

হিপনোটাইজ করতে?

না। আমার পারার কথাও নয়।

কেউ যদি আমাকে বাকি জীবনটা হিপটোটাইজ করে রেখে দিত তাহলে বড্ড ভালো হত।

বাস্তব থেকে পালাতে চান তো! আমার সবাই কমবেশি পালাতেই তো চাই। কিন্তু পালিয়ে লাভ হয় না, ফের বাস্তবের মুখোমুখি হতে হয়। নিস্তার নেই। একটা সময় ছিল যখন আপনি পালানোর মানুষ ছিলেন না। হাসপাতালের মোড়ে সেই যে ভীষণ হাঙ্গামাটা হয়েছিল তার কথা আপনার মনে আছে? বাবুপাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মেছোবাজারের গুন্ডাদের কী ভয়ংকর মারপিট! কত বোমা পড়েছিল, গুলি চলেছিল, পুলিশ অবধি এগোতে সাহস পায়নি। একটা মোটরবাইক নিয়ে এগোতে সেই হাঙ্গামার মধ্যে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। খুব পপুলার ছিলেন বলেই বোধহয় সেই হাঙ্গামা থামাতে পেরেছিলেন আপনি। আমি অবশ্য ডিটেলস জানি না, তবে তখন লোকের মুখে মুখে আপনার নাম ফিরত। মনে আছে?

না। কিছু মনে নেই।

কিংবা রুচিরা আর পল্লুর সেই ভালোবাসার বিয়ে! মনে আছে?

নাম দুটো প্রথম শুনছি।

বদমাশ, জুয়াড়ি, জোচ্চোর, মিথ্যেবাদী বলে পল্লুকে সবাই চিনত। তবু রুচিরা যে কী করে ওর প্রেমে পড়ল কে জানে! শান্ত, শিষ্ট, ভারী ভালো মেয়ে। ক্লাসের ফার্স্ট গার্ল। তবু পল্লুর প্রেমে পাগল হয়ে প্রেগন্যান্ট হয়ে পড়ল। কেলেঙ্কারির একশেষ। পল্লু দায় এড়ানোর চেষ্টা করেছিল। রুচিরার বাবা পল্লুর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে গিয়ে গুণ্ডাদের মার খেয়ে এলেন। পুলিশ অবধি পল্লুকে আড়াল করেছিল, কারণ ওর মামা ছিল ডি এস পি। রুচিরাকে আত্মহত্যা করতে হত আপনি না থাকলে।

পল্লু! রুচিরা! এসব শব্দ শুনছি আর আমার মাথার ভিতরে গভীর কালো জলে টুপটাপ করে পড়ে তলিয়ে যাচ্ছে। কোনো ঝংকারও নেই, টংকারও নেই। পল্লুকে কি আমি মেরেছিলাম?

না। বরং তাকে প্রবল মারের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। রুচিরা যখন বিষ খেয়ে হাসপাতালে, তখন ওদের পাড়ার লোকজন লাঠিসোঁটা নিয়ে তেড়ে এসে পল্লুকে পাকড়াও করে। সেদিন আপনি গিয়ে আড়াল না করলে ও মরেই যেত। শুনেছিলাম, কিছুদিন আপনি ওকে বন—বাংলোয় নিয়ে লুকিয়ে রেখেছিলেন। আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়ার জন্য পুলিশ ওকে খুঁজছিল। খুব গন্ডগোল চলেছিল কিছুদিন। আপনাকেও পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। কিছুদিন পরে অবশ্য রুচিরা আর পল্লুর বেশ মিলমিশ হয়ে যায়। পল্লু কিন্তু আর আগের মতো ছিল না, পালটে গিয়েছিল। কী করে সেটা হয়েছিল তা আজও জানি না।

আচ্ছা এই ঘটনাটা শুনে আমাকে তো বেশ ভালো লোক বলেই মনে হচ্ছে তাই না?

খারাপ তো বলতে চাইছি না।

কিন্তু একটু আগে আপনিই না বলেছিলেন যে, আমি ছিলাম লাফাঙ্গা, বদমাশ, মেয়েবাজ! একই সঙ্গে একটা লোক ভাল আর খারাপ কী করে হতে পারে?

সেই জন্যই তো আপনাকে একদম বুঝতে পারতাম না। কখনো মনে হত ভীষণ ভালো, ডাকাবুকো, সাদা মনের মানুষ। আবার কখনো মনে হত ভীষণ পাজি, ভীষণ দুষ্টু, ভীষণ অ্যাগ্রেসিভ।

খুব মুশকিলে ফেলেছেন আমাকে।

মুশকিল শুধু আপনার নয়, আমারও। মনে মনে আপনার যে পোর্ট্রেটটা আঁকার চেষ্টা করেছি, সেটা বারবার বদলে গেছে। কখনও আপনাকে মনে হয় ইভান দি টেরিবল, কখনো বা সন্ত জন। আপনি এমন অদ্ভুত ছিলেন বলেই আমার কিশোরী বয়সে আপনাকে নিয়ে আমি মনে মনে ভারি জ্বালাতন হতাম।

আমাকে নিয়ে আপনার প্রবলেমটা কী ছিল বলবেন?

অনেক সময়ে কেউ কেউ নিজের অজান্তেই অন্য কারও প্রবলেম হয়ে দাঁড়ায়। তা ছাড়া আমার একটা ধারণা হয়েছিল যে, আপনি আমার দিদিকে বিয়ে করবেন এবং একদিন আপনাকে জামাইবাবু বলে ডাকতে হবে।

ও হ্যাঁ, এ কথাটা বলেছিলেন বটে। আপনার দিদির সঙ্গে আমার—

ঠিক তাই

তখন আপনার বয়স কত যেন?

তেরো—চোদ্দো।

কালো ছিলেন, রোগা ছিলেন, আর যেন কী?

কালো, রোগা, আনঅ্যাট্রাকটিভ, শুধু পাখির মতো সরু গলায় গান গাইতে পারতাম।

এখন গান না?

না। এখন জুলজি পড়াই।

হ্যাঁ, সেকথা আমার মনে আছে।

গানের কথায় একটা মেঘলা দিনের কথা মনে পড়ল। বলব?

কি জানি কেন, আজ এই শীতের সকালে আপনার কথা শুনতে আমার বেশ ভালো লাগছে। আপনি আমার সেই ছোট্ট শহরের মেয়ে। কত ছোট ছোট কথা মনে আছে আপনার। শুনে ফের সেই ছেলেবেলায় ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে।

ইচ্ছে করছে?

হ্যাঁ। ভীষণ।

আপনার ইচ্ছের আরও জোর হোক।

সেই যে মেঘলা দিনের কথা বলবেন বলছিলেন! বলুন।

হ্যাঁ, সেটা এক আশ্চর্য দিন। আমাদের শহরের এক পলিটিক্যাল লিডার তার আগের দিন কদমতলার মোড়ে খুন হয়েছিলেন। বিমলাংশু সেন। পরদিন সকাল থেকেই দোকানপাট বাজার সব বন্ধ। গাড়িঘোড়া কিচ্ছু চলছে না। অথচ সেদিন জেলা শহরে আমার গানের কমপিটিশনের ফাইনাল পরীক্ষা। না গেলেই নয়। শহর প্রায় পঁচিশ মাইল দূর। সকালে এসব খবর পেয়ে মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। রাগ—অভিমান—হতাশায় খাওয়া—দাওয়া বন্ধ করে বিছানায় পড়ে পড়ে কেবল কাঁদছি, তখন দিদি এসে বলল, কাঁদিস না। ঠিক একটা উপায় হবে, দেখিস। কিন্তু ওসব যে ছেলে ভোলানো কথা তা জানা ছিল বলে একটুও বিশ্বাস হয়নি। কিন্তু উপায় সত্যিই হয়েছিল। দিদি আপনাকে খবর দিয়েছিল।

আমাকে! কেন?

সেটাই তো গল্প। আপনি আমাকে জেলা শহরে নিয়ে যেতে রাজি হয়েছিলেন। ছ—টায় পরীক্ষা, আপনি ঠিক সাড়ে চারটের একটা বিরাট মোটরবাইক নিয়ে এসে হাজির। এক মুখ হাসি নিয়ে বললেন, চলো খুকি, তোমাকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি।

দাঁড়ান, দাঁড়ান! কী নাম যেন বললেন! বিমলাংশু সেন?

হ্যাঁ তো!

লম্বা, ফরসা, কোঁকড়া চুল, চোখে ভারী চশমা?

হ্যাঁ।

বিমলাংশু সেনকে পেটে আর বুকে ছুরি মারা হয়েছিল, তাই না?

হ্যাঁ।

তাকে আমার বেশ মনে পড়ে যাচ্ছে।

সত্যি?

তারপর বলুন।

আমি তৈরি হয়েই ছিলাম। আপনি আমাকে কীভাবে মোটরবাইকের ক্যারিয়ারে বসতে হবে তা শিখিয়েছিলেন। বলেছিলেন আপনার কাঁধ বা কোমর জড়িয়ে ধরে শক্ত হয়ে বসে থাকতে হবে। জীবনে সেই প্রথম মোটরবাইকে চড়া আমার। যা ভয় করছিল! আর সেইসঙ্গে লজ্জায় মরে যাচ্ছিলাম।

লজ্জা কীসের?

ওমা! লজ্জা নয়! তখন যে মনে মনে আপনাকে নিয়ে সারাক্ষণ গবেষণা করি! তখন, বালিকা বয়সে আপনার চেয়ে রহস্যময় পুরুষ আর কেউ ছিল না আমার।

রহস্যময়! রহস্যময় ছিলাম বুঝি আমি?

ভীষণ। আপনার কাঁধে হাত রেখে পিছনের সিটে আমি কাঁটা হয়ে বসেছিলাম। সারা শরীর বারবার শিউরে শিউরে উঠেছিল। আপনি অবশ্য পাত্তা দেননি আমাকে। আর তেরো বছরের কালো, রোগা একটা পেতনি মেয়েকে কেনই বা পাত্তা দেবেন আপনি!

সেটা ছিল বুলেট।

তার মানে?

মোটরবাইকটার কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

আপনার মোটরবাইকটা ছিল ভীষণ বিচ্ছিরি। একে তো দৈত্যের মতো চেহারা, তার ওপর যা জোরে ছুটত। শব্দে কানে তালা লেগে যাওয়ার জোগাড়।

আপনার অভিজ্ঞতা নেই বলে বলছেন। নইলে বুলেট একটি চমৎকার বাইক। যে কোনো রাস্তায় চলতে পারে, একনকী পাহাড়ি রাস্তায়ও।

আপনি এমন উদাসীনভাবে চালাচ্ছিলেন যে, আপনার পিছনে যে একটা তেরো বছরের ভিতু মেয়ে বসে আছে সেটা আপনার খেয়ালই ছিল না।

না, না, ভুল ভেবেছেন। নিশ্চয়ই খেয়াল ছিল, কাউকে ক্যারি করার সময় আমি তো সাবধানেই চালাতাম।

সেটা বুঝি মনে আছে আপনার?

অ্যাঁ! তাই তো, মনে আছে দেখছি! ভারী আশ্চর্যের ব্যাপার!

সেদিন কিন্তু মোটেই সাবধানে চালাননি। ভয়ে আমি বারবার দু—হাতে আপনাকে আঁকড়ে ধরেছি আর লজ্জায় মরে গেছি।

আপনি খুব লাজুক ছিলেন তো?

হ্যাঁ। এখনও তাই। খুব আনস্মার্ট, ঘরকুনো। ভিতুও।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক মেয়েদের যেমন হওয়া উচিত!

তার মানে! মেয়েদের আনস্মার্ট, ঘরকুনো আর ভিতু হওয়া ভালো বুঝি?

ভালো নয়? তাহলে কি অন্যরকম হওয়া উচিত?

যদি তাই হবে তাহলে আপনি আমাকে পাত্তা দেননি কেন?

তেরো বছর বয়সের মেয়েরা তো ইজের পরে!

আমি সেদিন সালোয়ার—কামিজ পরেছিলাম। অ্যান্ড ফর ইওর ইনফরমেশন, যথেষ্ট সেজেওছিলাম।

হাঃ হাঃ! তাই বুঝি! তাহলে তো আপনাকে আমার সমীহ করাই উচিত ছিল! কিন্তু ঠিক কীরকম ব্যবহার করেছিলাম আপনার সঙ্গে, একটু বলবেন?

একটু নাক সিঁটকোনোর ভাব তো ছিলই। আর ছল অ্যান অ্যাটিটিউড অফ রিজেকশন। ভাবটা যেন, তুমি যতই সাজো, কিচ্ছু যায় আসে না আমার।

আজ আমি সেদিনের ব্যবহারের জন্য যদি ক্ষমা চাই?

যাঃ, ঠাট্টা করছিলাম। আমার ওই বয়সে কি কারও কাছে পাত্তা পাওয়ার কথা!

দাঁড়ান, দাঁড়ান, একটা গন্ধ পাচ্ছেন?

পাচ্ছি তো। পাতাপোড়ার গন্ধ। কেউ কাছে পিঠে শুকনো শালপাতা জড়ো করে আগুন দিয়েছে বোধহয়।

না, না, সে গন্ধ নয়।

তবে?

ক্যা—ক্যালিফোর্নিয়ান পপি!

ক্যানিফোর্নিয়ান পপি!

ক্যানিফোর্নিয়ান পপির গন্ধ!

আমি তো পাচ্ছি না! তবে আমরা একসময়ে ওই নামের একটা তেল চুলে মাখতাম। কিন্তু সে তো ছেলেবেলায়!

কিন্তু আমি গন্ধটা পাচ্ছি যে! আর একটা বাসন্তী রঙের ওড়না—হ্যাঁ, বাসন্তী রঙের ওড়না ঝোড়ো বাতাসে খুব উড়ছে, রিয়ার ভিউ মিররে আমি যেন এখনও দেখতে পাই। ভয় করছিল আমার।

উঃ।

কী হল?

সেটা তো বাসন্তী রঙেরই ওড়না ছিল! আমিই ভুলে গিয়েছিলাম! আপনি বাইক থামিয়ে আমাকে বললেন ওড়নাটা কোমরে জড়িয়ে নিতে। নইলে নাকি চাকায় ওড়না জড়িয়ে অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে। এটা কী করে মনে পড়ল আপনার?

না, মনে পড়েনি। একটা নিরেট নিশ্চিদ্র অন্ধকারে একটা—দুটো বিচ্ছিন্ন তারা ফুটে উঠছে মাত্র। পূর্বাপর সম্পর্ক নেই। ওই বাসন্তী রঙের ওড়না আর ক্যালিফোর্নিয়ান পপির গন্ধ। কিন্তু দুটোকে মেলাতে পারি পারি না যে? কোথা থেকে এক একটা স্মৃতি। পাখি, প্রজাপতি বা মৌমাছির মতো উড়ে আসে, তারপর আবার উড়ে কোথায় হারিয়ে যায়। সারাদিন আমার মাথায় এইসব দৃশ্য, গন্ধ, শব্দের পারম্পর্যহীন যাতায়াত। আপনি কী বলছিলেন যেন!

ভাবছি, বলে লাভ আছে কিনা।

কিন্তু শুনতে আমার ভালোই লাগছে। আপনার কথাগুলো যেন আমার বন্ধ দরজায় মৃদু টোকার শব্দ। দরজাটা আমি খুলে দিতে চাই, কিন্তু ইচ্ছে করলেও যেন পারি না। তবু শব্দটাও তো একটা সংকেত। কে জানে দরজাটা ওই সংকেতে আপনা থেকেই খুলে যাবে কিনা। প্লিজ, থামবেন না, বলুন।

শুনতে আপনার ভালো লাগছে কি? বোর হচ্ছেন না তো!

না, বরং আমার ভিতরে যেন শুকনো মাটিতে বৃষ্টির ফোঁটার মতো কিছু পড়ছে। বলুন, প্লিজ!

বলছি। সেই পঁচিশ মাইলের ভয়, লজ্জা, শিহরণ সব এখনও পুরোনো বইয়ের মতো সাজিয়ে রেখেছি মনের মধ্যে। কিন্তু পথ তো একসময়ে শেষ হয়। আপনি আমাকে ঠিক জায়গায় নামিয়ে দিয়ে বললেন, তোমার ফাংশন হয়ে গেলে আমি এসে তোমাকে নিয়ে যাব। চিন্তা কোরো না। সেদিন আমি কোকিলকে হার মানিয়ে গান গেয়েছিলাম। ফেরার সময় আমার হাতে একগাদা প্রাইজ দেখে আপনি অবাক হয়ে বলেছিলেন, ও বাবা, তুমি তো সাঙ্ঘাতিক মেয়ে! সব প্রাইজ লুট করে এনেছ দেখছি! বাইকে সেইসব প্রাইজ নিয়ে আসা

কত শক্তি ছিল বলুন। আপনিই গিয়ে একটা বিগ শপার ব্যাগ কিনে আনলেন, তারপর সেটা যত্ন করে ক্যারিয়ারে বাঁধা হয়েছিল।

কত মনে আছে আপনার! আপনি ভাগ্যবতী। আমার যে কেন কিছুই মনে পড়ে না! কী জানি কেন, এখন হঠাৎ আমার একটা ভাঙা কাচের বোল—এর কথা মনে পড়ছে। সবুজ রং ছিল বোলটার, ভারী সুন্দর দেখতে।

আপনি একটা বিচ্ছু।

কেন ওকথা বলছেন?

আপনার সব মনে আছে, কিছুই ভোলেননি। আমার চেয়েও বেশি মনে আছে আপনার। কারণ প্রাইজে আমি এক সেট বোলও পেয়েছিলাম। মোটরবাইকের ঝাঁকুনিতেই বোধহয় একটা বোল ভেঙে গিয়েছিল। বোলগুলো ছিল সবুজ রঙের। আমিই ভুলে গিয়েছিলাম, আপনার কী করে মনে আছে?

না, না, কিছু মনে নেই। কিছুই মনে নেই। কীসের একটা আড়াল বলুন তো! কে আমার অতীতকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে রয়েছে?

কেউ নয়। ওটা আপনার অটো সাজেশন।

আপনিই না একটু আগে বলেছিলেন, আমি কিছু একটা ভুলতে চাইছি বলেই ভুলে যাচ্ছি। কিন্তু কী ভুলতে চাইছি সেটাই তো আর মনে নেই আমার।

মনে পড়লে হয়তো আপনার ভালো লাগবে না।

তা হোক, তবু তো এই আধখানা হয়ে বেঁচে থাকার হাত থেকে রেহাই পাব। আপনি জানেন?

না তো?

কিন্তু আপনার মুখ দেখে আমার কেন মনে হচ্ছে যে, আপনি জানেন!

অনুমানটা ভুল।

তাই হবে হয়তো।

আজ আমি আসি!

যাবেন! তাই তো, আপনার তো চলে যাওয়ারই কথা! আবার আসবেন?

বলতে পারি না।

দাঁড়ান, দাঁড়ান। না, নড়বেন না, ওই রোদ আর ছায়ার ঠিক মাঝখানে যেমনটি দাঁড়িয়ে আছেন, তেমনই থাকুন তো! আপনার ডান দিকে রোদ, বাঁ দিকে ছায়া...

দাঁড়ালাম তো!

সুভাষিণী...সুভাষিণী... আশ্চর্য! কেন এ নামটা মনে পড়ল!

মনে পড়ল তাহলে!

পড়ল। কিন্তু আপনি কে বলুন তো?

আমাকে ভুলতে গিয়ে কত কী ভুলতে হল আপনাকে!

একটু দাঁড়ান, আশ্চর্য, আমার আদিগন্ত সব মনে পড়ে যাচ্ছে যে? উঃ, ভীষণ মনে পড়ে যাচ্ছে সব!... রেপ চার্জ, পাবলিকের মার, মামলা, কয়েদখানা, নাবালিকা ধর্ষণের জন্য... ওঃ!

সব ঠিক। কিন্তু আপনি বোকা, ভীষণ বোকা। যদি সব উপেক্ষা করে জোর করে এসে আমার হাত ধরতেন, তাহলে আমিও ভয় ঝেড়ে ফেলে সবাইকে মুখের ওপর বলতে পারতাম, উনি আমাকে রেপ করেননি, আমিই ওঁকে বাধ্য করেছিলাম।

কিন্তু কেন করেছিলে? কেন বাধ্য করেছিলেন আমায়?

তখন আমার পনেরো বছর বয়স। গুটিপোকার খোলস ছেড়ে একটি প্রজাপতি বেরিয়ে এসেছে। কেউ ফিরেও দেখত না যাকে তার দিকে সকলেরই অবাক চোখের চাউনি। অহংকারে মক মক করে বুকের

ভিতরটা। তখন আমার ট্রফি চাই, মুগ্ধতা চাই, স্তাবকতা চাই, পুরুষদের হাঁটু গেড়ে বসা দেখতে চাই। কিন্তু একচোখো অন্ধ আবেগ একটা পুরুষকেই শুধু খুঁজে বেড়ায় তখনও। ওই একটা পুরুষের শিলমোহর না হলে তার জীবন—যৌবন বৃথা। বুঝেছেন? ওই পঁচিশ মাইলের উজান—ভাঁটায় মাথাটা চিবিয়ে খেয়ে রেখেছিলেন আপনি। কিন্তু সবাই যখন আমাকে লক্ষ করে, আপনি ফিরেও তাকান না। নাবালিকা বলেই হয়তো, সুন্দরী প্রেমিকার এক ফোঁটা একটা রোগা প্যাংলা বোন বলেই হয়তো। কী দিয়ে আপনাকে আমার দিকে ফেরাই? আমার পাগলিনী মন তখন ওই একটা পথই খুঁজে পেয়েছিল। এক নিরালা দুপুরে সেজেগুজে আপনার নির্জন একটেরে ঘরটায় হানা দিয়েছিলাম। মাথার ঠিক ছিল না, বশে ছিলাম না। নিজের শ্বাসেই আগুনের হলকা টের পেয়েছিলাম। আপনি অবাক হয়েছিলেন, ঠেকাতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মানুষ কি পারে নিজের শরীর—মনকে রাশ টেনে রাখতে। ভেসে গিয়েছিলেন, ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম আমি। দুই মাতাল আর পাগলের খেয়ালই ছিল না কিছু। বীরু নামে সেই মিস্তিরি ছেলেটা আপনাদের বাইরের দেওয়ালে রং করেছিল, যে লোক ডেকে এনেছিল... উঃ, তারপর পৃথিবীটা উলটেপালটে গেল একেবারে। কোন অন্ধকারে ঠেলে দিলাম আপনাকে, আর এক অন্ধকারে ডুবে গেলাম আমিও। সত্যি কথাটা যতবার বলতে গেছি, আমার মুখ চেপে ধরা হয়েছিল। অঝোরে চোখের জল ঝেরে গিয়েছিল শুধু। কত কষ্ট পেতে হল আপনাকে!

কী চাও সুভাষিণী? আজ আমার কাছে আর কী চাও?

আপনি কি ভেবেছিলেন সেই দিনের সেই কিশোরী সুভাষিণী ওই দিনের ওই গন্ডগোলে ভয় পেয়ে বোবা হয়ে থাকবে চিরকাল? দুই বাড়ির মধ্যে সম্পর্ক তেতো হয়ে গেল, যাতায়াত বন্ধ, আপনাকে নিয়ে কী বিচ্ছিরি টানাহ্যাঁচড়া—মামলা মোকদ্দমা! ভয় হয়েছিল ঠিকই, তবু মনস্থির ছিল। কত কষ্ট করে, কত কাঠখড় পুড়িয়ে এখানে এসে ঘাঁটি গেড়েছি জানেন?

সুভাষিণী, আমাকে বরং আমার সব ভুলিয়ে দাও। বিস্মৃতিই তো ভালো ছিল এক চেয়ে। এত যন্ত্রণা ছিল না! আধখানা হয়েই থেকে যাই না কেন সুভাষিণী!

বাকি আধখানা খুঁজে দিতেই তো এত কষ্ট করে এত দূর আসা।

বাকি আধখানা! ও!

এখন আসুন তো, আমার হাতখানা ধরুন। চলুন, ওই শালবনের ছায়ায় দুজনে একটু হাঁটি।

চলো সুভাষিণী।

# জন্ম

কানাইয়ের খুব বিশ্বাস ছিল যে ভবেন বিশ্বেষই তার বাপ। তা বলে আইন মোতাবেক নয়। ওই যেমন হয় আর কি। তার মা শেফালী ভবেন বিশ্বেসের বাড়িতে দাসী হয়ে আছে কম করেও পঁচিশ—ছাব্বিশ বছর। এখনও খাটে, ভবেনের বিশাল বাড়ি, ময়দানের মতো তিনটে উঠোন, লাগোয়া মস্ত আম আর লিচু বাগান, মেলা নারকোল গাছ, সবজির খেত, পনেরোটা গরু নিয়ে বিরাট পাকা গোয়াল, সার সার মন চালের গোলা, চালকল, আটাচাকি, তেলকল মিলিয়ে ডাইনে বাঁয়ে মা লক্ষ্মী। আইন মোতাবেক ভবেনের চার ছেলে, তিন মেয়ে। না, কানাইকে তাদের মধ্যে ধরা হয় না। ধরতে নেই। তবে ভবেনের জনের দরকার, নইলে এত দিক সামাল দেবে কে? সুতরাং কানাইও মাস মাইনে আর খোরাকি পায়, গতরে খাটে। বিশ বছর বয়সও হল তার। লেখাপড়াও শিখেছিল একটু। টেনেমেনে মাধ্যমিক পাশ করার পর সে ভবেনের খাজাঞ্চি হরিপদর লাগোয়া হল। ভবেনই তাকে ডেকে বলে দিল, হিসেবের কাজটা শিখে রাখ, পরে কাজে দেবে।

হিসেবের কাজ সব বিকেলবেলায় হয়, সারা দিনের আদায় উসুলের পর। আর দিনমানে ফাইফরমাসের অভাব নেই। তারই ফাঁকে ফাঁকে সে ভবেনের ছড়ানো ঐশ্বর্যের দিকে চেয়ে থাকে। তার মনে হল, এ সবের একটা হিসেব তারও ছিল। না, আইন মোতাবেক নয়।

শেফালী সোজা সরল মানুষ। তার পেটে কথা থাকে না। তার ওপর ভবেন বিশ্বেসের মতো তালেবর লোকের সঙ্গ করার একটা বড়াইত তো আছে। একদিন বর নয়ন দাসের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটির পর ছেলেকে বলেই ফেলেছিল, তুই কি ওর মতো হেঁজিপেঁজির ছেলে? তোর আসল বাপ হল ভবেন বিশ্বেস।

কলঙ্কের ব্যাপার একটা আছে বটে, কিন্তু গৌরবও তো কম নেই। শুনে এরকম খুশিই হয়েছিল কানাই। আর তার পর থেকেই সে রোজ মিলিয়ে মিলিয়ে দেখেছে, ভবেন বিশ্বেসের সঙ্গে তার মিল কতটা। তা তার মা শেফালী দাসী মিছে বলেনি। কানাই হল লম্বাই চওড়াই সা জোয়ান ছেলে, আর তার আইন মোতাবেক বাপ নয়ন দাস হল খেঁজুড়ে চেহারার একরত্তি মানুষ। মেলে না। কিন্তু ভবেন বিশ্বেসের মেলাও। খাপে খাপে মিলে যায়। ভবনে বিশ্বেস লম্বাই চওড়াই বিরাট মানুষ। রংটাও ফরসার দিকেই। কানাইয়েরও অবিকল তাই। মিল খুঁজে পেয়ে নিশ্চিন্ত হল কানাই। দুঃখের কথা, বাপকে জ্যাঠা ডাকতে হয়, এই যা। তবে মনে মনে সে ভবেন বিশ্বেসকে বাবা বলেই ডাকে।

মনে মনে বাপ আর মুখে জ্যাঠা বলে ডাকাটা হল দু নৌকোয় পা রেখে চলার মতো। সামাল দেওয়া মুশকিল। বাপ আর জ্যাঠা এমন গুলিয়ে যায় যে মাঝেমধ্যে বিপত্তি দেখা দেয়।

মুনশির হাটের রজব আলি এসেছিল সেদিন পাখি নিয়ে। ভবেন বিশ্বেসের ছোট মেয়ে বিনীর খুব পাখি পোষার শখ। দরদালানে বিস্তর পাখির কাঁচা ঝোলানো। সারাদিন কিচিরমিচির, হেগেমুতে একশা করে। দুর্গন্ধে তেষ্টানো যায় না। তার মা শেফালীই সব পায়খানা পরিষ্কার করে। বাবুর মেয়ে পুষেই খালাস, ভোগান্তি অন্যের। তা বিনী একটা কথা—বলা ময়নার কথা বলে রেখেছিল। রজব আলি নিয়ে এসেছে সেদিন। কথায় কথায় রজব তাকে বলল, তুই তো শুনি সব কাজের কাজি। ইলেকট্রিকের কাজ জানিস, পাম্পসেট সারাতে পারিস, কাঠের কাজ জানিস, তা এত গুণ নিয়ে পড়ে আছিস কেন? মুনশির হাটের মহাজন মহাদেব পোড়েল লোক খুঁজছে। কাজের লোক পেলে হাজার দু—হাজার বেতন দেবে। যাবি?

কথাটা মিথ্যে নয়। লেখাপড়ায় তেমন দল না হলেও কানাই হাতের কাজে খুব পাকা। পাম্পসেট, জেনারেটার থেকে শুরু করে এ বাড়ির যাবতীয় যন্ত্রপাতিই সে টুকটাক সারিয়ে দেয়। ভবেন বিশ্বেসের মেজো ছেলে গোবিন্দ ছাদে মস্ত ডিশ অ্যান্টেনা লাগিয়ে ঘরে ঘরে কেবল কানেকশন দিয়েছে সে কাজও কানাইকেই

করতে হয়। এ সবের জন্য বাড়তি পয়সাও পায় না সে। তার জন্য দুঃখও বিশেষ নেই তারা। ভাবে, নিজের বাড়িরই তো কাজ।

রজব আলির প্রস্তাব শুনে সে উদাস মুখে বলে ফেলেছিল, বাপ পিতেমোর ভিটে ছেড়ে কোথায় যার রজব ভাই!

শুনে রজব হাঁ, বলল, এ আবার কবে থেকে তোর বাপ পিতেমোর ভিটে হল রে? তোর বাপ তো নয়াগঞ্জের লোক! বাপের ভিটে এখানে দেখলি কোথায়?

বেফাঁস কথা। বুঝতে পেরে কানাই কথা ঘোরাতে লাবল।

রজব বলল, ভালো করে ভেবে দেখিস। মহাদেব বুড়ো হয়েছে। ভবেন বিশ্বেসের চেয়েও তার ভালো অবস্থা। দুগুণ তিনগুণ হবে, ম্যানেজার গোছের লোক খুঁজছে। চাপাচাপি করলে দুই কেন, তিন হাজারেও রাজি হয়ে যাবে। আর বতন ছাড়াও রোজগার আছে মেলা। সাত মেয়ের পর তার একটা মাত্র ছেলে। তা সে ছেলেও লায়েক হয়নি।

প্রস্তাব খুবই লোভনীয়। কিন্তু কানাইয়ের হল দু নৌকোয় পা। আইন মোতাবেক সে ভবেন বিশ্বেসের ওয়ারিশান নয় বটে, কিন্তু ধর্মত ন্যায্যত এই যে বিরাট বাড়ি, চাষের জমি, নানা কারবার এ সবের একটা অংশ তারও। এইটে ভেবে একটা সুখ আছে। সেই সুখ কি অন্য কোথাও পাওয়া যাবে?

কুমোরপাড়ার হিমি পিসির জাঁতির খিল খুলে গিয়েছিল। কানাইকে ধরে পড়ল, দে বাবা লাগিয়ে। ত্রিশ বছরের পুরোনো জিনিস। এমনটি আর পাওয়া যায় না। বকশিশ দেবোখন।

এ কথায় দেমাকে একটু লাগল কানাইয়ের। বলল, বকশিসের কথা কেন বলেন পিসি? ওসব দিতে হবে না। গায়ে ভদ্রলোকের রক্তটা তো আছে।

পিসি চোখ বড় বড় করে বলে, ওটা! তাই বুঝি?

জাঁতিটায় রিপিট এঁটে যখন পৌঁছে দিল কানাই তখন পিসি তাকে আদর করে বসিয়ে একথা—সেকথার পর হঠাৎ বলল, হ্যাঁ রে, তুই তো ভদ্রলোকের ছেলে। তা অমন চাকরবাকরের মতো খেটে মরিস কেন?

কথাটার প্যাঁচ ধরতে পারেনি কানাই। ভালোমানুষের মতো বলে ফেলল, নিজের বাড়ির কাজ, লজ্জার কী আছে বলুন!

পিসি মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বলল, তাও তো বটে। আমরাও তো বলাবলি করি, কানাইয়ের চেহারাখানা দেখে কে বলবে ভদ্রলোকের ছেলে নয়? তেমনই লম্বা—চওড়া, তেমনই ফরসাটে রং, তেমনই হাত পায়ের গড়ন।

কানাই তবু প্যাঁচ ধরতে না পেরে প্রশংসা মনে করেই মিটি মিটি হাসছিল।

হিমি পিসি নাড়ু আর জল খাইয়ে হঠাৎ আলটপকা বলে ফেলল, বুড়ো টসকাবার আগে একটু বুঝেসুঝে নিস বাবা। তোর ন্যায্য দাবি আছে কিন্তু।

এ কথায় একটু থমকায় কানাই। তবে কি সবাই জানে নাকি? কথাটা তো সেদিকেই ইশারা করছে।

লজ্জারই কথা। কানাইয়ের লজ্জাও করছিল। কিন্তু একটু আনন্দও যে না হচ্ছিল তা নয়। জানাজানি হওয়ায় অন্তত ব্যাপারটা নির্যস সত্যি বলেই প্রমাণ হচ্ছে।

হিমি পিসি ভালোমানুষের মতো বলল, বুড়োকে ভাঙিয়ে কত লোক করেকর্মে খাচ্ছে, আর তুই আঁটি চুষছিস। আমরা তো বলি, অত ভালো ছেলে...

নাড়ু খেয়ে কানাই উঠে পড়ল।

দাবিদাওয়ার কথাটা অবশ্য সে ভাবে না। ও সব করতে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে। মনে মনে এটুকু জেনেই সে খুশি যে, সে একটা তালেবর লোকের ছেলে। জানা বাপটা নয়, ছুপা বাপটাকেই তার পছন্দ।

গায়েগতরে আলিসান হয়ে ওঠার পর সে একদিন মেপে দেখেছে, ভবেন বিশ্বেসের চেয়েও সে দু—ইঞ্চি লম্বা। মাপজোখ করার সহজ উপায় তো ছিল না। তবে ভবেন বিশ্বেস যখন বারান্দার থামের পাশে দাঁড়িয়ে উঠোনে মুনিশদের ধান ঝাড়াই দেখে তখন মাথাটা থামের একটা চাপড়া—খসা জায়গায় পৌঁছয়। ওই মাপটা ধরে সে মেপে দেখেছে।

ইদানীং সন্ধের পর খাজাঞ্চির সঙ্গে তারও ডাক পড়ে ভবেনের ঘরে। মেঝের ওপর বিভিন্ন খাতে আসা টাকাপয়সার স্তূপ। গোনাগাঁথা, খাতায় হিসেব তোলা এসব ভবেনের চোখের সামনেই হয়। বুড়ো হরিপদর চেয়ে সে অনেক বেশি চটপটে বলে ভবেনের যেন একটু পক্ষপাত দেখা দিচ্ছে তার প্রতি।

একদিন সন্ধেবেলা খাজাঞ্চি চলে যাওয়ার পর ইশারায় তাকে বসতে বলেছিল ভবেন।

ভবেন গম্ভীর গলায় বলল, কত মাইনে পাস যেন?

তিনশো টাকা। আর খোরাকি।

কম নয় তো! নয়ন কত পায় জানিস?

আজ্ঞে, রোজ কুড়ি টাকা করে। খোরাকি আছে।

ও বাবা, সে তো পাঁচ—সাতশো টাকার ধাক্কা! আর তোর মা?

দেড়শো টাকা আর খোরাকি।

তা হলে একুনে কত হল?

হাজার খানেক হবে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভবেন বলে, কত টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে রে বাপ! তাই তো তেমন জমছে না আমার তবিলে।

কথাটা ঠিক নয়। তার ভবেন বাবা কত কামায় তার হিসেব কানাই ভালোই জানে। দিনে খরচখরচা বাদ দিয়ে আড়াই থেকে তিন হাজার। ফসলের সময়ে এর পাঁচ থেকে সাত গুণ বেশি।

ভবেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, যা যায় যাক। তবু তো গরিবেরা খেয়েপরে বাঁচছে। কী বলিস?

যে আজ্ঞে।

আমার বাঁ হাঁটুতে আজকাল বড্ড ব্যথা হয়। বাতে ধরেছে। গনাকে একটু তামাক সাজতে বলে আয় তো। তারপর হাঁটুটা দাবিয়ে দে একটু।

পা দাবানোর হুকুমে খুশি হল কানাই। বাপ হলে কী হয়, চাকর আর মনিবের দূরত্ব তো আছেই। পা দাবানোর সুবাদে তবু একটু কাছাকাছি হওয়া গেল।

তামাকের সুন্দর গন্ধ ছাড়তে ছাড়তে ভবেনবাবু বলল, তোর মা এসেছিল কাল, তোর হয়ে দরবার করতে। অনেক ধানাইপানাই করল। তা তুই কিছু খারাপ আছি বাপু? এর চেয়ে বেশি কেউ দেবে গ্রামদেশে?

কথাটা বলার ইচ্ছে ছিল না, তবু কেমন যেন ফস করে বেরিয়ে গেল মুখ থেকে, একজন তিন হাজার টাকায় সাধছে আমাকে।

অ্যাঁ, বলে বড় করে চোখ মেলল ভবেন। কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে থেকে বলে, তিন হাজার! তা কাজটা কিসের?

ম্যানেজারি।

বলিস কী? কে সাধছে?

মুনশির হাটের মহাদেব মহাজন।

কে বটে লোকটা? কিসের কারবার?

তা জানি না। তবে মেলাই নাকি ব্যবসাপত্তর। জমিজিরেত।

সে তোকে ম্যানেজারি দিতে চায় কেন?

তার একজন চৌখস লোক চাই।

তোকে চৌখস ঠাউরেছে বুঝি?
এখনও ঠাওরায়নি। বাজিয়ে দেবে।
তোর কী ইচ্ছে? যাবি?
কথাটা বলার ইচ্ছে ছিল না। তবু কে যেন ভিতর থেকে জোর করে কথাগুলো ঠেলে বের করে দিল, আজ্ঞে বাপ পিতোমোর ভিটে ছেড়ে কার যেতে ইচ্ছে হয় বলুন। তবে আতান্তরে পড়লে যেতে হবে।
কথাটা বলে ফেলে সে কর্তার দিক থেকে যেমনটা আশা করেছিল তেমনটা ঘটল না দেখে অবাক হল।
কথাটার মধ্যে যে প্যাঁচটা আছে সেটা হয় ধরতে পারল না, নয়তো এড়িয়ে গিয়ে ভবেন কিছুক্ষণ গুড়ুক গুড়ুক করে তামাক খেয়ে গেল। তারপর হঠাৎ বলল, তোর তো আর ভাইবোন নেই।
না, আমি একা।
হুঁ।
আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ।
তারীপর ভবেন নলটা সরিয়ে রেখে বলল, তুই তো গোবিন্দর সঙ্গে কাজ—টাজ করিস। সে তোকে কিছু দেয়—টেয়?
না, আমি চাইনি।
চাসনি যেন?
কাজটা শিখে রাখলাম। বড়দার তেমন হয়ও না কিছু। কিন্তু, যত বাড়িতে লাইন দিয়েছি তাদের অর্ধেকও ঠিকমতো পয়সা দেয় না। গত মাসেও তিন বাড়ির আইন কেটে দিতে হয়েছে।
অসন্তুষ্ট ভবেন বলে, এককাঁড়ি টাকা জলে গেল। তখনই বলেছিলুম গাঁ—গঞ্জে লোকের ভাতই জোটে না তো টিভি দেখবে।
ঠিকমতো করতে পারলে হয়। লোকে না খেয়েও ওসব দেখতে চায়।
কিছু হবে বলছিস?
ধীরে ধীরে হবে। কারেন্ট তাকে না বলে লোকে অর্ধেক দিনই দেখতে পায় না কিছু।
সেটাই তো বলছি। ওসব বিলাসিতা কি এখানে মানায়? দেখুক কিছুদিন। বেশিরভাগ ব্যবসাই তো ধারবাকিতেই ডোবে কিনা।
আজ্ঞে।
তা গোবিন্দ যা হোক কিছু করছে। আর তিনজন তো বসে বসে হেদিয়ে গেল। বটু কী পড়ছে যেন?
আজ্ঞে ক্লাস এইট হল।
একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভবেন বলল, গতবার ফেল মেরেছে। অবিশ্যি পড়েই বা কী হবে? কাজ কারবারে লাগলে কাজ হত। কিন্তু বাবুদের তো ইদিকে মনই নেই।
কথাটা জানে কানাই। দুঃখেরই কথা ভবেনের পক্ষে।
ভালো চোখে দেখেও না আমাকে।
বড় মানুষ হলেও ভবেন বিশ্বেসেরও দুঃখের দিক আছে। চার চারটে ছেলের কেউই বাপকে যে বিশেষ গ্রাহ্য করে না এ সবাই জানে। তারা একটু বাবু গোছের, একটু আলগোছ। চাষ—বাস, মুনিশ খাটানো, চালকল, তেলকল এসব নিয়ে এই যৌবন বয়সে মাথা ঘামাতে তারা নারাজ। যতদিন মাথার ওপর বাপ বাবাজীবন গ্যাঁট হয়ে বসে আছে ততদিন ঘামাবেও না।
ভয় কি জানিস, অন্ধি—সন্ধি চিনল না তো, আমি মরলে সব না উড়িয়ে—পুড়িয়ে দেয়। আমার তো শত্তুরের অভাব নেই, আমি মরলে তারা এসে নানা শলা—পরামর্শ দেবে, মাথায় হাত বুলিয়ে সব গাপ করে ফেলবে।

সব বাবারই এক রা। কথা কিছু নতুন নয়। কানাই খুব যত্নের সঙ্গে তার ছুপা বাবা আর প্রকট জ্যাঠার বাঁ পায়ের হাঁটু দাবাতে দাবাতে দার্শনিকের মতো বলল, অত ভাবেন কেন? কপালে যা আছে তা তো হবেই।

এ কথায় ভবেনের হাঁটু চমকে উঠল। ভবেন চোখ কপালে তুলে বলে, বলিস কি? একটা জীবন কম কষ্ট করেছি! বাপ তো রেখে গিয়েছিল লবডঙ্কা। খেয়ে না—খেয়ে, মাতার ঘাম পায়ে ফেলে এই যে এত সব করলুম সে কি ভূতভুজ্যিতে যাবে নাকি?

এসব কথার জুতসই জবাব কানাইয়ের জানা নেই। সে বুঝল, ভবেন একটু সান্ত্বনা চাইছে, একটু বল—ভরসা। তোয়াজি কথা বললে কাজ হয় এ সময়ে। কিন্তু তার মাথায় আজ বোধহয় ভূতেই ভর করেছে। যা বলার কথা নয়, যেসব কথা সে ঘূণাক্ষরেও ভাবে না, সেইসব কথাই যেন ভিতর থেকে অনিচ্ছেতেও ঠেলে বেরিয়ে আসছে। সে নির্বিকারভাবে বলে, তা ছেলেপুলে তো আরও আছে আপনার। তাদের ওপরেই ভরসা করে দেখুন না।

বাপ পিতেমোর ভিটে কথাটা ভবেন শুনেও শোনেনি। কিন্তু এ কথাটা জায়গামতোই লাগল বোধহয়। ভবেন সোজা হয়ে বসে বলে, কী বললি কথাটা? অ্যাঁ! কী বললি রে হনুমান?

তটস্থ হয়ে কানাই বলে, কিছু ভুল বললুম নাকি বাবা?

ওই! ফের ওই বাপ—জ্যাঠায় গন্ডগোল! মুখ ফসকে 'বাবা' ডাক বেরিয়ে গেছে।

ভবেন নিচু হয়ে নিজের এক পাটি চটি তুলে নিয়ে কটাস করে কানাইয়ের পিঠে বসিয়ে চাপা গর্জন করে ওঠে, যত বড় মুখ তত বড় কথা! বেরো হারামজাদা, বেরো! আজই তোকে করখাস্ত করলুম। ফের এ বাড়ির ছায়া মাড়ালে কেটে ফেলব। দুর হ সুমুখ থেকে।

পেট আর মুখের কথার তফাত রাখতে না জানলে মানুষের দুর্গতি হবেই। পেটে বাপ, মুখে জ্যাঠার বরাবর বজায় রাখতে পারলে টিকে থাকতে পারত। তা আর হল না। তার ওপর জুতোপেটাও হতে হল। মনিবের জুতো খেলেও আঁতে লাগে, ভাপের জুতো খেলেও আঁতে লাগে। তবে ভরসা এই যে, মনিবের জুতোয় ততটা নয়। মনকে এইটুকু বুঝিয়ে সে বেরিয়ে এল।

মা শেফালী দাসীকে কথাটা বলতে চায়নি সে। কিন্তু ভবেনের বাড়ি হচ্ছে খোলা হাট। ঘটনাটা দু—চারজনের চোখে পড়েই থাকবে। তাই রটে যেতে দেরি হয়নি।

রাতের শেফালী বলল, হ্যাঁ রে, কর্তা নাকি তোকে জুতোপেটা করেছে?

না, তেমন জোরে মারেনি। ওই একবারই—তা লাগেনি তেমন।

তা তুই করেছিলি কী? কর্তার টাকাপয়সা সরাসনি তো!

আরে না না, ওসব নয়। খামোখা ফস করে চটে গেল।

বুড়োর ভীমরতি ধরেছে। সারাদিন জান চুঁইয়ে খাটছিস, ক পয়সা ঠেকায় তোকে? কাল গিয়ে বিষ ঝেড়ে দিয়ে আসব খন।

আরে না, ওসব করতে যেও না।

তা বলে চটি দিয়ে মারবে?

আহা, বাপ বলেই ধরে নাও না কেন? তাহলে আর তত গায়ে লাগবে না।

বাপ তো সে বটেই, কিন্তু তার বলে অপমান করবে কোন মুখে?

কথাটা চাউর হল খুব। শুধু দেখা নয়, সেদিন বৈঠকখানায় যা কথাবার্তা হয়েছিল তা আড়ি পেতে শুনেছেও কেউ কেউ। কথাটা এমনভাবে রটল যে, কানাই ভবেনের কাছে সম্পত্তির ভাগ চেয়েছে ছেলে হিসেবে।

আড়ালে লোকে গা টেপাটেপি করে হাসছে আর ভবেনের বাড়িতে মেজাজ চড়ছে।

সন্ধেবেলা গিন্নিমা ডেকে পাঠাল।

কানাইয়ের তেমন ভয়ডর হচ্ছিল না। মাথা উঁচু করেই গিয়ে গিন্নিমার ঘরে ঢুকল। ভবেন বিশ্বেসের বউ রোগাভোগা মানুষ। মুখ গম্ভীর, চোখে খর দৃষ্টি।

তার দিকে চেয়ে বলল, কী সব শুনছি?

কানাই হেঁটমুন্ডু হয়ে বলল, খারাপ কিছু বলিনি। কথাটা ঘুরিয়ে ধরেছে লোকে।

গিন্নিমা উঠে ঘরের দোর দিয়ে এল। তারপর গলার স্বর নামিয়ে বলল, কতটা কী জানিস বল তো?

আজ্ঞে, আমি আর কী জানব? কিছু জানি না।

ঢং করতে হবে না। কর্তার কীর্তি কিছু কম নেই। কিন্তু বলি, তোর এত সাহস হয় কি করে? দাবিদাওয়া তুলেছিলি?

আজ্ঞে না।

তোর মা তোকে বুদ্ধি পরামর্শ দেয়নি তো! ও বোকা মেয়েছেলে, সব করতে পারে।

না, আমার মা এর মধ্যে নেই।

আগেকার দিনের বড়লোকদের ওরকম কত মেয়েছেলে থাকত। তা বলে তাদের ছেলেপুলেরা দাবিদাওয়া তুলবার মতো বুকের পাটা দেখায়নি। তোকে কে বুদ্ধি দিচ্ছে বল তো!

আজ্ঞে ওসব ব্যাপার নয়।

ব্যাপার নয় মানে? তুই কোন সুবাদে সেদিন কর্তাকে বাবা বলে ডেকেছিলি?

মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। অন্নদাতাও তো বাপেরই সমান।

এসব তোকে কেউ শেখাচ্ছে। এই আমি বলে দিচ্ছি, মুখ থেকে আর কোনো বেফাঁস কথা বেরোলে কিন্তু কালু হাঁসুয়াকে খবর দিয়ে খুন করাব, বুঝেছিস?

কালু হাঁসুয়া ভাড়াটে খুনি, সবাই জানে। অন্য সময় হলে নামটা শুনে ভয় পেত কানাই। আজ যেন তবু ভয় হল না। শুধু বলল, বুঝেছি।

বিষয়সম্পত্তির দিকে হাত বাড়ালে রক্ষে থাকবে না, এটা ভালো করে জেনে যা।

কানাই চুপচাপ চলে এল।

দুদিন ধরে কাজকর্ম নেই। ঘরে বসে বসে মাজায় ব্যথা। তিন দিনের দিন সে একটু বেরোল। তালবাগানে কপিখেতের পাশে শীতের রোদে বসে বিড়ি ফুঁকছিল নিতাই। তাকে দেখে ডাকল, ওরে ইদিকে আয়। তোকে নিয়ে তো হুলুস্থুলুস কাণ্ড। বোস এখেনে।

তা বসল কানাই।

নিতাই বলল, নতুন কথা তো কিছু নয় রে। ওসব আমরা সেই কবে থেকেই জানি। বোকার মতো বলে ফেলে অমন চাকরিটা খোয়ালি। মুখ বুজে থাকলে আখেরে লাভই হত। তেলকলের ম্যানেজার তপন, ট্রাকটরের ড্রাইভার মদনা কেউ কি মুখ খুলেছে বল?

অবাক হয়ে কানাই বলে, তাদের আবার কী বৃত্তান্ত?

তোর যা ওদেরও তাই।

তার মানে?

তোর কি ধারণা তুই একা ভবেন বিশ্বেসের বে—আইনি ছেলে?

খুব হাসছিল নিতাই। কানাইয়ের তাতে গা জ্বলে গেল। বলল, প্রমাণ আছে?

সে কি তোরই আছে?

কানাই এই প্রথম ভবেন বিশ্বেসের ছেলে হিসেবে তেমন গৌরব আর বোধ করছিল না। বলল, না, প্রমাণ নেই।

তবে? তপন আর মদনাও জানে তারা কোত্থেকে এসেছে। তবে রা কাড়ে না। তাতে সুবিধে একটাই। কর্তা তার এসব বে—আইনি ছেলেদের বিলিব্যবস্থা ঠিকই করে দেয়। তুই বাড়াবাড়ি করে ফেললি কিনা। চুপচাপ থাকলে দেখতিস পাকা বাড়ি হয়ে যেত, তলে তলে জমিজমাও করে দিত। কর্তা পাষণ্ড নয়। শত হলেও রক্তের সম্পর্ক তো!

কানাই একটু ভেবে দেখল, দুইয়ে দুইয়ে চারই বটে। তপন নামে মাত্র ম্যানেজার হলেও কুল্যে ছশো টাকা বেতন পায়। তা তারও পাকা বাড়ি হয়েছে গত বছর। মদনারও বাড়ি উঠছে গোয়ালপাড়ায়। ট্র্যাক্টর চালিয়ে সে হাজার টাকার বেশি পায় না। দুজনেই কানাইয়ের চেয়ে বড়।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কানাই উঠে পড়ল। মনটা বড্ড তেতো হয়ে গেল তার। সে ওদের মতো নয়। আদায় উশুলের পথে যায়নি কখনো। তার শুধু এই ভেবেই সুখ ছিল যে, আসলে সে ভবেন বিশ্বেসের ছেলে। সেই সুখটা হঠাৎ চড়াই পাখির মতো ফুরুত করে উড়ে গেছে কোথায় যেন।

তিনদিন বাদে মুনশির হাটে মহাদেবের কাজে লেগে পড়ল কানাই। মহাদেব সোজাসাপটা মানুষ। প্রথম হাজার টাকা মাইনে, কাজ পছন্দ হলে তিন মাস পর থেকে দু—হাজার। আরও কাজ দেখাতে পারলে বেতন যে আরও বাড়ানো হবে সেটাও সাফ জানিয়ে দিল মহাদেব।

কাজের ধরন একই রকম। কানাইয়ের কাছে কাজ একটা নেশার মতো। খাটতে তার ভালোই লাগে। কাজ দেখে মহাদেবও খুশি। পাঁচটা কারবারে তার মেলা টাকা খাটছে। আর এ কথাও সত্যি যে মহাদেব ভবেনের চেয়েও বড়লোক।

দিনরাত কোথা দিয়ে উড়ে যেতে লাগল তা ভালো করে টেরও পেল না কানাই। বছর খানেক বাদে মহাদেব একদিন তাকে ডেকে বলল, তোমার কাজ দেখে খুশি হয়েছি বাবা। এখন থেকে তিন হাজার করেই পাবে। পুজোয় পার্বণী, জামাটা কাপড়টা—এসব নিয়ে ভেব না।

কানাই ওসব নিয়ে ভাবে না। কাজে ডুবে থাকে। কালেভদ্রে গাঁয়ে গিয়ে চুপি চুপি মাকে দেখে আসে। তার বোকাসোকা মা পেটের দায়েই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক যে ভুলটা করেছিল তার জন্য আজকাল তার দুঃখই হয়। তার মনের মধ্যে এখন আর ভবেনকে নিয়ে বাপ—জ্যাঠার দ্বন্দ্ব নেই। সে ভবেনের কথা আর ভাবে না।

মহাদেবের ঠান্ডা লেগে জ্বর হওয়ায় একদিন সকালে তার গদি সামলাচ্ছিল কানাই। মহাদেবের কর্মচারীরা এখন তারই তদারকিতে থাকে। কাজও মেলা।

বেলা দশটা নাগাদ একজন বুড়ো রোগা মানুষ লাঠিতে ভর দিয়ে এসে গদিতে ঢুকল।

কানাই প্রথমে গ্রাহ্য করেনি। লোক তো মেলাই আসে।

লোকটা তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে হাঁ করে চেয়ে রইল তার দিকে।

কাকে খুঁজছেন? মহাদেববাবুর জ্বর, আজ আসেননি।

তোমাকেই খুঁজছি বাবা। আমি ভবেন বিশ্বেস। তোমার বাবা।

কানাই ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বসুন।

ভবেনকে চেনাই যায় না। বছর খানেকের মধ্যেই বুড়িয়ে খুনখুনে হয়ে গেছে। বসে একটু হাঁফ ছেড়ে বলল, নানা ব্যাধিতে শরীরটা শেষ হয়ে গেছে। তার ওপর মনের কষ্ট। বড় ছেলে ঝগড়া করে আলাদা হয়ে গেছে বউ নিয়ে। মেজো জন মায়ের গয়না চুরি করে বোম্বাই না কোথায় পালিয়ে গেছে। সেজো ব্যবসা করতে গিয়ে পথে বসেছে। ছোটটাও শুনছি মদটদ খায়। আমার অবস্থা বড় খারাপ।

খুব মন দিয়ে শুনল কানাই। তারপর বলল, তা এখন কী করবেন?

বিষয়সম্পত্তি যে যায় বাবা কানাই। চারদিকে ষড়যন্ত্র। চারদিক থেকে নানা ফন্দিফিকির নিয়ে লোক আসছে। শুনি, তুই মহাদেবের কাজকারবার নাকি ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে তুলেছিস। সবাই তোর সুখ্যাতি করে। তা

বাবা, আমাকে রক্ষে কর। এসে বিষয় সম্পত্তি সামাল দে। যা চাস দেব। শত হলেও তুই তো আমারই সন্তান।

কানাই একটু হাসল। বলল, একসময়ে আমারও কথাটা ভেবে খুব অহংকার হত। কিন্তু আজ আর হচ্ছে না কর্তাবাবু।

ভুলভ্রান্তি যা হয়েছে, মাপ করে দে। সত্যিই বলছি তোকে, ওরা আর আমার কেউ নয়। ফিরেও তাকায় না। আজ ভাবি, অবৈধ ছেলে হলেও তোর বরং একটু মায়াদয়া ছিল। বড্ড ভুল করে ফেলেছি বাবা।

কিন্তু আজ যে আর আপনাকে আমার বাবা বলে মনে হয় না কর্তাবাবু! একদিন এমন ছিল, আপনাকে বাবা বলে ডাকার জন্য প্রাণ আনচান করত। আজ যে সেই ইচ্ছেটা মরে গেছে।

না হয় না—ই ডাকবি। তবু ফিরে চল। মহাদেব যা দেয় তার চেয়ে আমি দু—চার হাজার বেশিই দেব।

বিষয়সম্পত্তির ভাগ দেবেন?

আইনে তো তা মানবে না, তবে পুষিয়ে দেব।

কানাই খুব হাসল, আপনার আইনের ছেলেরা যেমনই হোক, বাপকে যতই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করুক, বিষয় তারাই পাবে। আর এই আমরা যারা আপনাদের মতো লোকের কামকামনার অবৈধ সন্তান, যত ভালোই হই আমাদের কপালে ঢুঢু। দুনিয়াটা ভারী মজার জায়গা মশাই।

দুটো কাঁচা গালাগালও যদি দিস তো দে। বড্ড আতান্তরে পড়ে এসেছি রে বাবা, রক্ষে কর।

আপনি আমার কাছে কেন এসেছেন জানেন?

জানব না কেন? তোর সাহায্য চাইতেই আসা।

সে তো ঠিকই। পয়সা ছড়ালে ম্যানেজার আপনি অনেক পাবেন। কিন্তু কানাই দাসের মতো এমন বশংবদ পাবেন না। আপনি ভালোই জানেন, কানাই আপনার অবৈধ সন্তান, সে আপনাকে বাবা বলে ভাবত, আপনার বিষয়সম্পত্তি রক্ষা করতে দিনরাত বেগার খাটত, নামমাত্র মাইনে পেত, তবু অন্য কোথাও যেতে চাইত না। তাকে তাড়িয়ে ভুল করেছিলেন বটে। সেটা বুঝতে একটু দেরিও করে ফেলেছেন। আজ আবার তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন কেন জানেন?

কেন?

আপনার বিশ্বাস কানাই গিয়ে ফের বুক দিয়ে সব আগলাবে। বিষয়সম্পত্তি রক্ষা করবে যতদিন না আপনার বৈধ সন্তানেরা এসে ভার নিচ্ছে। ঠিক বলছি তো কর্তাবাবু?

না, না, ওরকম ভাবিসনি।

কর্তাবাবু, একসময়ে কানাইয়ের আপনার মতো একজন বাবার দরকার ছিল। আজ আর নেই।

ভবেন স্তূপাকার হয়ে বসে রইল।

# ভূতের গল্প

মল্লিকা সেন। মল্লিকা সেন!

অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর মজা খালের পাশে অত্যন্ত ঘন কাঁটাঝোপের ভিতরে অবস্থিত শ্যাওড়া গাছটি সামান্য দুলে উঠল। একটা বিদঘুটে হাওয়া দিল উত্তর দিক থেকে। সন্ধ্যার আবহাওয়া আরও গাঢ় হল। কুয়াশা জমাট বাঁধতে লাগল চারপাশে। আমি একা।

হাওয়ার শব্দের ভিতর থেকে একটা ফিসফিস শুনতে পাই, আপনি আমাকে ডাকছিলেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আমার গল্প কি সবাই শুনতে চাইছে?

চাইছে।

আমাকে খুন করেছিল আমার স্বামী। এ খবর তো সব কাগজে বেরিয়েছে। আপনি নতুন কী জানতে চাইছেন?

আজকাল স্বামীরা প্রায়ই স্ত্রীদের খুন করে থাকেন মল্লিকা সেন। গল্পটা বড্ড পুরোনো হয়ে গেছে। আমি একটু নতুন অ্যাঙ্গেল চাইছি।

এ গল্পের নতুন অ্যাঙ্গেল কিছু নেই। পুরুষশাসিত সমাজে এরকমই বারবার ঘটবে। আপনাদের কাগজে আমার খবরটা হেডিং কী ছিল বলুন তো!

মল্লিকা ঝরে গেল।

বাঃ! বেশ হেডিং। এরকম কত জুঁই, মল্লিকা, বেলি ঝরে যাবে তার কি হিসেব আছে।

অর্জুন সেন লোকটা সম্পর্কে আমরা খোঁজ নিয়ে জেনেছি, তেমন খারাপ লোক নয়। কোনো ক্রিমিনাল রেকর্ড নেই। অ্যাজ এ ইয়ংম্যান লোকটা ছিল দারুণ ব্রাইট, অত্যন্ত বন্ধুবৎসল এবং আড্ডাবাজ। লোকের উপকার—টুপকারও করত! এ সব কি সত্যি?

বাজে কথা। ও ছিল হৃদয়হীন নিষ্ঠুর, কর্তব্য—উদাসীন।

পাড়া—প্রতিবেশীরা অনেকেই বলেছে, আপনাদের সংসারে শান্তি ছিল না ঠিকই, কিন্তু সেইজন্য দায়ী অর্জুন সেন নন।

আপনারা কি পাড়া—প্রতিবেশীদের বিশ্বাস করছেন?

কাকে বিশ্বাস করব তা বুঝতে পারছি না। আমি যখন ভিকটিম তখন আমার চেয়ে সত্যি কথা আপনাকে কে বলবে?

তা অবশ্য ঠিক। তবে সেনবাবু যে বিবৃতি দিয়েছে তাতে সে বলেছে, আমি বিয়ের পর থেকেই সব স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলতে থাকি। প্রথমে আমার স্ত্রী বন্ধুদের কাছ থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করেন, আড্ডা বন্ধ করে দেন, বাইরে বেরোনোর ওপর নানারকম বিধিনিষেধ আরোপ করতে থাকেন। শেষপর্যন্ত আমাকে আমার যৌথ পরিবার থেকেও নানা প্ররোচনা দিয়ে উনি বের করে আনেন। যোধপুর পার্কের পৈতৃক বাড়ি থেকে আমি চলে যাই টালিগঞ্জের ভাড়াটে বাসায়। আমার একটি মেয়ে হয়। আমি তাকে আকণ্ঠ ভালোবেসে ফেলি। আমার সেই দুর্বলতা লক্ষ্য করে আমার স্ত্রী তার সব দায়—দায়িত্ব আমার ঘাড়ে গছাতে শুরু করেন অত্যন্ত সুকৌশলে। এমনকী রাত্রিবেলা আমার বাচ্চা বিছানায় পেচ্ছাপ করলেও কাঁথা বদলানোর জন্য উনি উঠতেন না। মেয়ে কাঁদত। সুতরাং আমাকেই সে কাজের ভার নিতে হয়। ক্রমে আমি মেয়েকে ঝিনুক বাটিতে দুধ খাওয়ানো পর্যন্ত শিখে যাই।

বাপেরা কি কিছুই করবে না ছেলেমেয়ের জন্য? শুধু মেয়েরাই করবে? বাচ্চা কি তার একার?

তা অবশ্য নয়।

শুনুন আমি সদ্য খুন হয়েছি। আমাকে খুন করেছে ওই বদমাশ, লম্পট, হৃদয়হীন লোকটা। বাংলার নারী সমাজ ওর ওপর ভীষণ ক্ষেপে আছে। আমার ভাবমূর্তি এখন খুবই উজ্জ্বল। এ সময়ে ওই লোকটার উলটো—পালটা বিবৃতিতে বেশি কভারেজ দিয়ে আপনারা আমার ভাবমূর্তিটা দয়া করে নষ্ট করবেন না।

ঠিক আছে। কিন্তু আমাকে নতুন একটা অ্যাঙ্গেল দিন।

বললাম তো, নতুন অ্যাঙ্গেল বলে কিছু নেই। তবে আমি স্বীকার করছি, অর্জুন সেন নামক ওই খুনি লোকটা তার মেয়েকে খুবই ভালোবাসত। এবং মেয়েটিও তাকে?

হ্যাঁ। আমার মেয়েও বাপের খুব ন্যাওটা ছিল। কিন্তু সে আমাকেও ভালোবাসত।

আপনাদের ছোট পরিবারে একটা লাভ ট্র্যাঙ্গল ছিল, একথা কি বলা যায়?

নাঃ নাঃ! তা ঠিক নয়। আমি হিংসে করতাম না।

কিন্তু অর্জুন সেন বলছে, মেয়ে একটু বড় হওয়ার পর আপনি নানা সময়ে তার কাছে স্বামী সম্পর্কে এমন সব কথা বলতেন যাতে ওই শিশুর মন তার বাপের ওপর বিষিয়ে যায়।

মিথ্যে কথা। এসব খবরদার লিখবেন না। আমি মেয়েকে যা বলতাম তা একটুও বানিয়ে বলতাম না। ওর বাপ সম্পর্কে ওর একটা ভুল ধরনের উঁচু ধারণা তৈরি হচ্ছিল। সত্যর খাতিরে আমি সেই ভুলটা ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করতাম মাত্র।

আপনি কি সে কাজে সফল হয়েছিলেন?

খানিকটা।

আমি একটু গলা খাঁকানি দিয়ে সংকোচের সঙ্গে বললাম, আপনাদের সেক্স লাইফ সম্পর্কে কিছু বলবেন?

মল্লিকা সেনের প্রেতাত্মা খিলখিল করে হেসে ওঠে, সেক্স বলে ওর কিছু ছিল নাকি?

ছিল না?

নপুংসক বলা যায়। সেইটেই আমাদের অশান্তির আর একটা কারণ। এ ব্যাপারটার জন্যও আপনি অর্জুন সেনকেই দায়ী করছেন তো?

পুরোপুরি।

আপনার কোনোরকম শীতলতাও ছিল না তো!

মোটেই নয়।

অর্জুন সেন বলেছে, সেক্সের সঙ্গে সাইকোলজির সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। কোনো পুরুষের পক্ষেই স্ত্রীর কাছে অপমানিত হওয়ার পর তাঁর সঙ্গে উপগমন সম্ভব নয়। আপনি কি ওকে প্রায়ই অপমান করতেন?

মোটেই নয়। অক্ষমরাই ওসব অজুহাত দেয়।

কিন্তু পাড়া—প্রতিবেশীরা বলছে, রোজ রাতে আপনাদের তুমুল ঝগড়া হত।

তাতে ওদের কী?

না, বলছিলাম ঝগড়ার ফলে অর্জুন সেন অপমানিত বোধ করত এবং তার ফিজিক্যাল আর্জ নষ্ট হয়ে যেত, এটা পাঠকরা কেমন খাবে?

প্লিজ ওসব পয়েন্ট তুলবেন না। অশ্লীল।

অশ্লীলতায় একটু আঁশটে গন্ধ থাকলে অ্যাঙ্কেলটা পালটে যাবে।

যাবে। কিন্তু তাতে আমার ভাবমূর্তি নষ্ট হবে। প্লিজ।

খুনটা তাহলে অর্জুন সেনই করে?

তবে আর কে?

না, মানে এ ব্যাপারটা অর্জুন স্বীকার করেনি। সে বলেছে, আপনি নিজের গায়ে নিজে আগুন লাগিয়েছেন।

তাকে কি? ও তো ছুটে এসে আগুন নেভাতে পারত।

বাথরুমের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। অর্জুন সেন দরজাটা ভাঙার চেষ্টা করে প্রথমটায় পারেনি। যখন ভাঙে তখন আপনি পুড়ে গেছেন।

সে না হয় হল, কিন্তু প্ররোচনা? নিষ্ঠুরতা? খুন কি শুধু নিজের হাতেই করতে হয়? মনস্তাত্ত্বিক চাপ নেই?

অর্জুন সেনও অনেকটা এইরকমই একটা কথা বলছে।

কী কথা?

বলছে, ফিজিক্যাল ডেথটা তেমন কিছু নয়। আপনি নিজের মরার অনেক আগেই নাকি অর্জুন সেনকে ওই যে কী বললেন, মনস্তাত্ত্বিক চাপে মেরে ফেলেছিলেন।

বলেছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আপনিও তাই লিখবেন?

ভাবছি। অ্যাঙ্গেলটা বেশ নতুন।

মোটেই তা নয়। ওর কথা বিশ্বাস করবেন না। আগুনটাও নিজের হাতে লাগায়নি ঠিকই, কিন্তু সারাজীবন আমি ওর জন্যই জ্বলে পুড়ে মরেছি। বিশ্বাস করুন। আমাকে ওই খুন করেছে। আমি চাই ওর ফাঁসি হোক।

হলে?

ওকে আমি কাছে পেতে চাই।

কেন?

মল্লিকা লাজুক গলায় বললেন, আহা, বোঝেন না যেন!

# শিউলি ও অপরূপা

ক্লান্তিকর দিনশেষে বাইরে শরতের সন্ধ্যা নেমে এল। সূর্যের শেষ আভাটুকু ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে আকাশ থেকে। আকাশ—দেবজিতের ল্যাবরেটরির কাচের শার্সি দিয়ে সেই আকাশই বা কতটুকু দেখা যায়? চারদিকে মহা মহা অট্টালিকা, তার ভিতর দিয়ে আকাশের সামান্য ভগ্নাংশমাত্র দেখা যায়। চারদিকে অজস্র কৃত্রিম আলোর বন্যায় তাও ভালো করে দেখার উপায় নেই।

দেবজিৎ অবশ্য আকাশ দেখছে না। একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে আনল সামনে—যেখানে একটি লম্বা সরু টেবিলে ফুটফুটে একটি মেয়ে শুয়ে আছে। মেয়েটির রং ঈষৎ তাম্রাভ গৌর। মুখ একটু গোলাকৃতি, চোখ অসম্ভব টানা ও সুন্দর। নাতিদীর্ঘ দেহটি ছিপছিপে। মাথার খুলিটা অবশ্য এখনও লাগানো হয়নি। মস্তিষ্কের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কাজটি প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। দুজন বায়োনিক যন্ত্রবিদ খুব সতর্কতার সঙ্গে মনিটরের দিকে চেয়ে আছেন। বারংবার ত্রিমাত্রিক ছবি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পর্যবেক্ষণ করছেন মস্তিষ্কের অনুপুঙ্খ অংশ। তাঁরা যখন সন্তুষ্ট হবেন তখনই মস্তিষ্কের সংযোজন ঘটাবে একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র। তার পরেও অবশ্য এই মানবীর আচার ব্যবহার ইত্যাদি সাত দিন ধরে পরীক্ষা করা হবে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে এই যন্ত্রমানবী হবে দেবজিতের সঙ্গিনী। ঠিক যেমনটি দেবজিতের সঙ্গে খাপ খাবে তেমনভাবেই তৈরি করা হয়েছে। সন্তানধারণ ছাড়া গৃহিণীসুলভ সবকিছুই অতি নিপুণতার সঙ্গে করতে পারবে এই কৃত্রিম মানবী। দেবজিৎ ছয় মাস যাবৎ এই মানবীটিকে সৃষ্টি হতে দেখছে। অপেক্ষা করছে।

এই যন্ত্রবিদের একজন তেওকিল অ্যাডামস মুখ ফিরিয়ে দেবজিতের দিকে চেয়ে একটু হাসল, ফিলিং ইমপেশেন্ট?

দেবজিৎ মাথা নেড়ে বলে, না।

অ্যাডামস ইংরিজিতে বলল, মেয়েটা দারুণ হয়েছে। তুমি গর্ব করতে পারো।

দেবজিতের গলায় তেমন কোনো উৎসাহ নেই। নিস্পৃহ গলাতেই বলল, এরকম আর কয়েক লক্ষ আছে, গর্ব করার কিছু আছে বলে তো মনে হয় না।

অ্যাডামস মৃদু হেসে মাথা নেড়ে বলল, আছে হে আছে। উই হ্যাভ মেড হার এ ফেথফুল ওয়াইফ। সাধারণ যন্ত্রমানবীরা ফেথফুল হয় না। যে কোনো পুরুষই তাদের ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু তোমার এটি —কী যেন নাম দিয়েছো এর?

শিউলি।

ইয়েস। এই শিউলি কখনো তোমাকে ছাড়া আর কাউকে গ্রহণ করবে না। সোজা কথায়, তোমার গায়ের গন্ধ, শরীরের কম্পন, গলার স্বর সব আইডেন্টিফাই করার ব্যবস্থা এর ভিতরে রয়েছে। সম্পূর্ণ লক সিস্টেম। অন্য পুরুষ কাছে এলে রি—অ্যাক্ট করবে। ভায়োলেন্ট রিঅ্যাকশন।

আমি যদি অন্য যন্ত্রমানবীতে আসক্ত হই তা হলে কি এর হিংসে হবে?

ওঃ নোঃ, দ্যাট ইজ ইমপসিবল। একজন যন্ত্রমানবীর কাছে কি সেটা কাম্য?

দ্বিতীয় ইঞ্জিনিয়ার জাপানি কোসিমোটো কম কথার মানুষ। এবার সে মনিটর থেকে চোখ না সরিয়েই বলল, শিউলির ভিতরে আমরা একটা গুণ যোগ করে দিয়েছি। সে চমৎকার গান গাইতে পারবে।

দেবজিৎ জানে এটাও খুব বিরল গুণ নয়। যারা গান ভালোবাসে তারা গান—গাওয়া পুতুলকেই সঙ্গিনী করে নেয়।

কম্পিউটার একটা ও—কে সিগন্যাল দিল।

কোসিমোটো একটা সুইচ টিপতেই কৃত্রিম মস্তিষ্কটা ধীরে এগিয়ে এসে মেয়েটির মাথায় সংযোজিত হয়ে গেল। অ্যাডামস আর একটা যন্ত্র চালু করল। ঠিক তিন মিনিট বাদে দীর্ঘ কেশদামে ভরা মাথার খুলিটা এসে বসে গেল মাথায়। শিউলি সম্পূর্ণ হল।

দেবজিৎ বলল, এবার?

অ্যাডামস বলল, অপেক্ষা করো। পাঁচ মিনিট।

পাঁচ মিনিট বাদে শিউলির শরীরে বেতারে কিছু কম্পন সঞ্চার করা হল। মাত্র কয়েক সেকেন্ড। কৃত্রিম মানবীর শরীরের সমগ্র যন্ত্রাংশের মধ্যে একটা সংহতি ও সমন্বয় ঘটতে লাগল। তারপর ধীরে ধীরে অবিকল মানুষের মতোই চোখ খুলল শিউলি।

কেসোমোটো বলল, ওকে প্রশ্ন করো দেবজিৎ।

দেবজিৎ শিউলির কালো চোখে চোখ রেখে বলল, তোমার নাম কী?

সুরেলা গলায় জবাব এল শিউলি।

তোমার বয়স?

একুশ বছর।

তুমি কার?

তোমার।

তুমি কি আমাকে ভালোবাস?

হ্যাঁ।

আমার ঘর করবে?

হ্যাঁ।

এটা কত সাল জানো?

দু—হাজার সাতশো চব্বিশ।

কত তারিখ।

চোদ্দোই জানুয়ারি।

আমার নাম কী?

দেবজিৎ চ্যাটার্জি।

তুমি গান গাইতে পারো?

পারি।

একটা গান গাও তো!

তুমি যে আমায় চাও আমি তা জা—আ—নি—

বাঃ। আমাকে তোমার কিছু বলার আছে?

হ্যাঁ। আমি তোমাকে ভালোবাসি।

ভালোবাসা মানে কী?

তোমার যাতে ভালো হয় তাই করাই হচ্ছে ভালোবাসা।

এ কথাটা কার?

ঠাকুরের।

আমার ভালো কি ভাবে হবে জানো?

জানি।

আমি কেমন লোক?

খুব—খুব ভালো।

আমি দেখতে কেমন?
সুন্দর।
মিথ্যে কথা। আমি দেখতে সুন্দর নই।
হ্যাঁ, সুন্দর। আমার চোখে সুন্দর।
কোসিমোটো দেখতে কেমন?
খ্যাঁদাবোঁচা, বিচ্ছিরি।
তিনজনেই হেসে ওঠে।
আর জয় অ্যাডামস?
বড্ড বড় বড়, গুন্ডার মতো।
তিনজনের মধ্যে কে সুন্দর?
তুমি। পৃথিবীর মধ্যে তুমি সবচেয়ে সুন্দর।
ঠিক আছে। এবার ঘুমোও।
বাধ্য মেয়ের মতো শুয়ে চোখ বুজল শিউলি।
অ্যাডামস বলল, ইজ শি ওকে?
ইয়া!
কোসিমোটো মৃদু স্বরে বলে, মেড ফর ইচ আদার।

তিনজন একসঙ্গে ল্যাবলেটরি থেকে বেরিয়ে এল। তারপর যে যার বোমযানে উঠে পড়ল। দেবজিতের বাড়ি খুব দূরে নয়। সে তার ছোট চেয়ার—কারটি নিয়ে উড়ে দু—মিনিটের মধ্যেই তার ফ্ল্যাটে এসে ঢুকল। একশো আশি তলায় তার ছোট ফ্ল্যাট। সে একাই থাকে। এবার থেকে শিউলিও থাকবে।

দেবজিৎ একটু জল খেয়ে কফি নিয়ে টিভি চালু করল। দেয়ালজোড়া ত্রিমাত্রিক টিভি। ছবি বলে মনেই হয় না, মনে হয় যেন ঘটনাস্থলেই রয়েছি। বিশ্ব সরকারের প্রজনন ও জনসংখ্যা বিষয়ক এক বিশেষজ্ঞ মৃদু স্বরে উদ্বেগের সঙ্গে বলছেন, নর ও নারীর মধ্যে পার্থক্য বেড়ে যাওয়ায় সংসর্গ ক্ষীয়মাণ। মানুষের জন্মহার সাংঘাতিক নিম্নমুখী।

কথাটা নতুন কিছু নয়। অনেক দিন ধরেই নানা মাধ্যমে এরকম প্রচার করা হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরেই মহিলা ও পুরুষদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি হয়েছে চাপা ঘৃণা ও অপ্রকাশিত শত্রুতার। বাইরে বাইরে পরস্পরের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করলেও স্বামী বা স্ত্রী হিসেবে সম্পর্ক নেই। উপরন্তু দীর্ঘকাল ঘরে সমকামিতা ও অন্যান্য বিকৃতির ফলে লোপ পেয়েছে পারস্পরিক যৌন আকর্ষণও। যদি বা সে আকর্ষণ কিছু মহিলা—পুরুষের মধ্যে রয়েছে, তা মেটাচ্ছে যন্ত্র—মানব ও যন্ত্র—মানবীরা। ভয়াবহ আর একটি তথ্য হল, ইদানীং পরিসংখ্যান বলছে পৃথিবীর প্রায় ষাট শতাংশ পুরুষ ও চল্লিশ শতাংশ নারী সন্তান উৎপাদনে অক্ষম। বন্ধ্যা নারী ও নির্বীজ পুরুষের সংখ্যা এইভাবে বেড়ে গেলে মানুষের অস্তিত্ব অচিরেই লোপ পাবে পৃথিবী থেকে।

দেবজিৎ এ সবই জানে। তবে সে এ দিয়ে আর ভাবতে চায় না। এই সমস্যার সমাধান কীভাবে হবে তাও তার মাথায় আসে না। এই যে সে নিজের জন্য একটি মেয়ে—পুতুল তৈরি করে নিল এও বাধ্য হয়েই। শিউলি বাধ্য হয়ে অনুগত স্ত্রীর ভূমিকা পালন করবে ঠিকই, কিন্তু তবু সেও এক পুতুলখেলাই। দেবজিৎ নিরীহ, কাজপাগল মানুষ। মহিলাঘটিত ব্যাপারে সে কোনো ঝঞ্ঝাটে আর যেতে চায় না। কেন্দ্রীয় ভোজনালয় থেকে একজন ফিটফাট যন্ত্রদানব রাত সাড়ে নটায় তার খাবারের ট্রে এনে একটা কনসোলে রেখে গেল। রাত দশটায় নৈশভোজ সেরে যখন দেবজিৎ শুতে যাচ্ছে তখনই হঠাৎ টেলিফোন।

একটি নারীকণ্ঠ বলল, আমি শিউলি। দেবজিৎ শিহরিত হল। শিউলিকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে, তার তো টেলিফোন করার কথা নয়।

দেবজিৎ অবাক হয়ে বলল, কোন শিউলি?

তোমার বউ শিউলি।
সে কী! তুমি অ্যাকটিভ হলে কী করে?
হলাম। আমার বড্ড একা লাগছে, ভয় করছে।
একা! ভয়! দেবজিৎ ভীষণ অবাক হল। যন্ত্রমানবীর একা লাগবে কেন? ভয়ই বা করবে কেন? তাহলে কি কোসিমোটো আর অ্যাডামস ওর ভিতরে অভিনব কোনো মাইক্রোচিপ ঢুকিয়ে দিয়েছে রসিকতা করে?
বিস্মিত দেবজিৎ মনের ভাব চেপে রেখে বলল, তোমার বাঁ পাশে কোমরের কাছে একটা ছোট্ট সুইচ আছে। ওটা টিপে দিলে তুমি ঘুমিয়ে পড়বে।
না। আমি ঘুমোতে চাই না।
কেন?
শুধু শুধু ঘুমোব কেন?
তা হলে কী চাও?
আমি তোমাকে চাই। এখনই।
ঈশ্বর। আমাকে চাও? কিন্তু কেন?
আমার যে নিঃসঙ্গ লাগছে!
দেবজিৎ একটু উষ্মার সঙ্গে বলল, শোনো শিউলি, তোমার আচরণ আমাকে অবাক করেছে। ভুলে যেও না, তুমি যন্ত্রমানবী। যন্ত্রমানবীর একা লাগবার কথা নয়, ভয় পাওয়াও সম্ভব নয়। তুমি কী করে অ্যাকটিভ হলে তাও আমি বুঝতে পারছি না।
শোনো, তুমি একবার আমার কাছে এসো।
কেন?
ভীষণ দরকার। এসো লক্ষ্মীটি।
দেবজিৎ খুবই বিভ্রান্ত বোধ করছিল। শিউলি যে আচরণ করছে তা ব্যাখ্যার অতীত। ব্যাপারটা দেখা দরকার। যন্ত্রমানবীর মধ্যে মনুষ্যোচিত মানসিক প্রতিক্রিয়া কেন হচ্ছে সেটা না জানলেই নয়। দেবজিৎ বলল, ঠিক আছে, আসছি।
সে পোশাক পরল। তারপর ফ্ল্যাটের কোণের দিকে তার ফ্লাই প্যাড—এ গিয়ে ঢুকল। ছোট ছোট নানা ধরনের উড়ুক্কু যানবাহন সাজিয়ে রাখা। সে একটা নৌকোর মতো গাড়িতে উঠে নিঃশব্দে শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল।
দু—মিনিট পরে নামল ল্যাবরেটরির ল্যাডিং প্যাডে। ঝলমল করছে আলো, কিন্তু জনমানবশূন্য ল্যাবরেটরির করিডোর ধরে এগোতে এগোতে সে ভ্রূ কুঁচকে সমস্যাটার কথা ভাবছিল। কী হচ্ছে এ সব? সংকেত এবং আইডেনটিটি কার্ডের বাধা পেরিয়ে সে যখন নিস্তব্ধ ঘরটায় ঢুকল তখন রাত এগারোটা। এ ঘর সম্পূর্ণ শব্দহীন। শিউলির দিকে চেয়ে সে অবাক। শিউলির নিষ্প্রাণ দেহটি আগের মতোই শোয়ানো। সে শিউলির কাছে গিয়ে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখল, শিউলি সম্পূর্ণ ঘুমন্ত। সেন্সর দিয়ে পরীক্ষা করে দেখল গত দু—ঘণ্টার মধ্যে শিউলি ক্রিয়াশীল হয়নি। তা হলে কী ব্যাপার? শব্দহীন ঘরে আচমকাই সে টের পেল, এ ঘরে একটা সত্তার উপস্থিতি রয়েছে। খুব মৃদু, প্রায় শ্রবণাতীত শ্বাসপ্রশ্বাসের একটা শব্দও সে পেল।
সে বলল, কে? কে এখানে?
আমি।
খুব মৃদু স্বরে কথাটা বলে একটি যন্ত্রের আড়াল থেকে একটি মেয়ে বেরিয়ে এল। পরনে শাড়ি। বিস্মিত দেবজিৎ দেখল, চার বছর আগে যে মেয়েটিকে সে সঙ্গিনী হিসেবে নিয়েছিল এবং তিন দিন বাদে বনিবনা না হওয়ায় যার সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় এ সেই অপরূপা গঙ্গোপাধ্যায়।

তুমি?

অপরূপার বিষণ্ণ মুখে কোনো হাসি নেই। মুখ গম্ভীর। চোখে টলটল করছে পতনোন্মুখ অশ্রু।

কী চাও অপরূপা?

আমি শিউলির ব্রেনটা খুলে শ্রেডারে দিয়ে নষ্ট করে ফেলেছি।

সে কী? কেন?

যন্ত্রমানব আর যন্ত্রমানবীদের আমি ধ্বংস করে দিতে চাই।

তাই বা কেন?

ভবিষ্যৎকে আর একটু আশাপ্রদ করার জন্য।

হতাশায় একটা চেয়ারে বসে পড়ল দেবজিৎ। তারপর বলল, তাতে লাভ কী? পৃথিবীর গতি কি অন্য মুখে ফেরানো যাবে?

তা জানি না। তবে ভাঙচুর দিয়েই গড়ার কাজ শুরু হয়।

দেবজিৎ অপরূপার দিকে চেয়ে বলল, কী গড়বে তুমি?

মানুষ দেবজিৎ, মানুষ।

চিন্তিত দেবজিৎ বলল, কীভাবে?

আমি তোমার স্ত্রী হতে চাই।

স্ত্রী?

হ্যাঁ। সঙ্গিনী নয়, স্ত্রী।

বিয়ের কথা বলছো?

হ্যাঁ।

কিন্তু—

শোনো, শিউলি তোমার জন্য যা যা করতে পারত, আমিও তোমার জন্য ঠিক তাই করব।

পারবে?

পারব। চেষ্টা করতেই হবে। শিউলি যা পারত না আমি তাও পারব। পৃথিবীকে আমি সন্তান দিতে পারব। শুধু তুমি যদি রাজি হও।

বিয়ে কীভাবে হয় তাই তো ভুলে গেছি। একজন বুড়ো ম্যারেজ রেজিস্ট্রার আমাদের জন্যই বসে আছেন পাশের ঘরে। চল। দেবজিৎ একটু হাসল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে দ্বিধাহীন গলায় বলল, চল।

# দোলনা

লেখাপড়া হল ভারী গোলমেলে ব্যাপার, বুঝলে খুকি? কেন লেখাপড়া গোলমেলে ব্যাপার কেন?

গোলমেলে নয়? ইস্কুলেই দশ বারো বছর ধরে লম্বা পড়াশুনো, তারপর ধরো আরও পাঁচ সাত বছর লেগে যায় ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার কিংবা স্কলার হতে। পরীক্ষার ফল নিয়ে সারাক্ষণ টেনশন, মুখ গুঁজে পড়া, মনে রাখা, পরীক্ষা দেওয়া। ওরে বাবা! আমার তো দম আটকে আসত।

কিন্তু আমি তো শুনেছি আপনার বাড়িতে সবাই খুব লেখাপড়া জানে!

ঠিকই শুনেছ। আমার দাদা দিদিরা বেশ লেখাপড়া করেছে বটে!

আর আপনি?

আমি! আমার কথা আর বোলো না। আমি তিনবার বাড়ি থেকে পালাই।

ওমা! কেন?

লেখাপড়ার ভয়ে। বই—খাতা দেখলেই যেন জ্বর আসত। বাবা শেষমেশ হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, তুই করবি কী? যা, চাষবাস করে খা গিয়ে।

সেই জন্যই বুঝি আপনি নিজে হাতে কোদাল নিয়ে লেগে পড়লেন।

ঠিক তা নয়। আসলে চাষবাস করার মতো আমাদের তো ভালো জমিই নেই। শুনেছিলাম এই মফস্সল শহরে আমাদের পুরোনো বাড়িটা পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে। এখানে আমাদের তিন পুরুষদের বাস ছিল বলে বাবা সেন্টিমেন্টাল কারণে বাড়িটা বিক্রি করেননি। বাড়ির লাগোয়া বাগান আর পুকুর আছে বলে জানা ছিল। তাই ভাবলাম...

কী ভাবলেন?

ভাবলাম, যদি বাগান—টাগান কিছু করা যায়।

আপনাদের বাড়িটার খুব বদনাম আছে, জানেন তো!

তাই নাকি! বদনাম কেন বলো তো?

লোকে বলে ওটা ভূতের বাড়ি। আর ভূতে আমার যা ভয়। আমি সন্ধের পর আর কখনো আপনাদের বাড়িটার দিকে তাকাতাম না। বাবাকে কতবার বলেছি, চলো আমরা অন্য কোথাও বাড়ি করে গিয়ে থাকি।

হ্যাঁ হ্যাঁ, কথাটা আমিও শুনেছি। অনেকদিন ধরে ফাঁকা পড়ে আছে, তারপর যত্ন হয় না বলে দেওয়াল টেওয়াল ফেটে অশ্বত্থের গাছ গজিয়ে যাচ্ছেতাই ব্যাপার! আমার তো সাতদিন সময় লেগেছে বাড়িটা সাফ—সুতরো করতে।

একা থাকতে ভয় লাগে না?

না তো! ভয় কিসের?

আপনার অবশ্য ভয়ডর খুব কম। নইলে কি গোখরো সাপ ধরতে পারতেন! মা গো! কী করে ধরেন বলুন তো? ঘেন্নাও লাগে না?

আমাদের ভয় আসে আননোন থেকে। যা জানি না, চিনি না তাকেই যত ভয়। কিন্তু সাপকে একটু কাছ থেকে স্টাডি করলে দেখতে, ভয় করবে না।

ও বাবা! আমি ভয়ে মরেই যাব। কিলবিলে জিনিস দেখলেই আমি ভয় পাই। আচ্ছা, গত পনেরো দিনে আপনি ক—টা সাপ ধরেছেন?

আমাদের বাড়িটাতেই অনেকগুলো ছিল। বোধহয় তেরোটা। আর তোমাদের বাড়ি থেকে দুটো।

সাপগুলো কী করলেন? মেরে ফেলেছেন?

পাগল! সাপ টাপ মারতে নেই, দুনিয়াজুড়ে এত সাপ মেরে ফেলা হয়েছে যে, বেচারিরা এখন এক্সটিংক্ট হওয়ার মুখে। যারা সাপের বিষ বিক্রি করে তাদের দিয়ে দিয়েছি।

আপনাদের বাড়ির সামনের বারান্দায় দেওয়ালের গায়ে একটা মস্ত ভিমরুলের চাক ছিল। ঠিক যেন একটা মেটে কলসি কেউ উপুড় করে দেওয়ালে লাগিয়ে রেখেছে। এ পাড়ায় সবাই খুব ভয় পেত। ভিমরুল কামড়ালে নাকি লোকে মরেও যায়। সেটা কী করে ভাঙলেন? আপনাকে কামড়ায়নি?

ভিমরুল কামড়ায় না, হুল দেয়। আমাকে দুটো ভিমরুল হুল দিয়েছিল বটে। তবে ধোঁয়াকে খুব ভয় পায়। ধোঁয়া দিয়ে তাড়িয়েছি। তারপর ভেঙেছি।

হুল দিয়েছিল। আপনার লাগেনি?

আমার তো তেমন কোনো গুণ নেই। দু—একটা গুণ যা আছে তার মধ্যে একটা হল, আমি খুব ব্যথা সহ্য করতে পারি। ভিমরুল তো তবু ভালো, পুরোনো বাড়িটার দেওয়ালের ফাটলে কয়েকটা তেঁতুল বিছে ছিল। দু—রাতে দু—বার হুল দিয়েছে।

ওমা! বলেননি তো?

বলার কী আছে! বললাম না, আমি খুব ব্যথা সহ্য করতে পারি।

বিছেগুলো মারলেন তো?

না আমি সহজে পোকামাকড় মারি না। চিমটে দিয়ে ধরে ধরে কৌটোয় পুড়ে জঙ্গলে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে এসেছি। মারব কেন বলো, পৃথিবীতে হয়তো ওদেরও প্রয়োজন আছে।

আপনি কিন্তু খুব অদ্ভুত লোক।

না খুকি, অদ্ভুত নয়, তবে একটু বোকা আছি ঠিকই।

আপনি বোকাই বা কেন বলুন তো?

সেইটেই তো বুঝতে পারি না। মাথায় কমা বলে আমার গায়ের জোর বেড়েছে। আমি ভাবি মাথায় যেটুকু কম আছে সেটুকু শরীরে খেটে পুষিয়ে দেব।

হিঃ হিঃ। আপনি একটা যাচ্ছেতাই লোক!

হ্যাঁ তো! আমার বাবা দাদারা আর দিদি সবাই ওকথা বলে। আমি নাকি ভদ্রসমাজের যোগ্য নই।

যাঃ, আমি কি তাই বললুম!

না। তুমি বলোনি। তুমি তো ভারী ভালো মেয়ে খুকি!

যাঃ! আমি আবার কিসের ভালো?

এই যে তুমি রোজ এসে তোমাদের বাগানের বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে কথা বলো, তাতে বুঝতে পারি তুমি মানুষকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করো না।

কিন্তু আমি আপনাকে একটুও পছন্দ করি না। আপনার ওপর আমার কিন্তু রাগ আছে।

ওই তো মুশকিল। আমাকে কেউই বিশেষ পছন্দ করে না। এই তো দেখলে না সেদিন অভয়বাবু আমাকে কেমন বকাঝকা করলেন সকলের সামনে! কিন্তু আমি তো কিছু করিনি। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলছিলাম। কিন্তু ওরা তো নিয়ম করেই দিয়েছে আমি ব্যাটও করতে পারব না, বলও করতে পারব না। শুধু ফিল্ডিং। আমি তো তাই করছিলাম। কুট্টুর মারা একটা বল গিয়ে অভয়বাবুর জানালার কাচ ভেঙেছিল। আর অভয়বাবু এসে আমাকেই কত কী বললেন। ধেড়ে ছেলে কাণ্ডজ্ঞান নেই, শিং ভেঙে বাছুরের দলে...

আপনি কুট্টুর নাম বলে দিলেন না কেন? কুট্টু তো অভয়জেঠুর ভাগনে।

না বাবা, নাম বললে ওরা আমাকে আর খেলায় নেবে না।

হিঃ হিঃ। কিন্তু আপনার ওপর আমার রাগ অন্য কারণে। অনেকে বলে আপনি নাকি টেররিস্ট ছিলেন। অনেক নিরীহ মানুষকে মেরেছেন। আর তাই পুলিশের খাতায় আপনার নাম আছে। এমনকী টেররিস্টদের

খতম তালিকাতেও আপনার নাম আছে ডেজার্টার বলে। আপনি মানুষ মেরেছেন ভাবলেই আমার রাগ হয়। হাসছেন কেন, এ কি হাসির কথা?

বোকাদের তো ওইটেই রাজলক্ষণ। যেখানে হাসির কথা হচ্ছে না সেখানেও বোকারা হাসে। কেন হাসছে তা না বুঝেই হাসে। এমনকী কারও মৃত্যুসংবাদ পেলেও দেখবে বোকা লোক দাঁত বের করে হাসছে।

জবাবটা কি এড়িয়ে যাচ্ছেন?

না খুকি। আসলে লম্বা কাহিনি তো!

আমি তো শুনতেই চাইছি।

বোরিং লাগবে কিন্তু। গুছিয়ে বলতে পারি না বলে মাঝে মাঝে কথার খেই হারিয়ে ফেইল কি না।

সেভাবেই বলুন না হয়।

আমার মেজদা একজন আইএএস অফিসার। বাড়ির আর কেউ আমার ওপর ভরসা না করলেও মেজদার আমার ওপর একটু মায়া আছে। ওই মেজদাই আমাকে খানিকটা শিখিয়ে পড়িয়ে প্রায় জোর জবরদস্তি করে একবার আইএএস পরীক্ষায় বসিয়েছিল। আমার বরাবর চাকরিকে ভীষণ ভয়। দশটা—পাঁচটা চাকরি করলে আমার ঠিক দম বন্ধ হয়ে আসবে। তবু মেজদার জোরাজুরিতে পরীক্ষা দিতে হল। তারপরই ভয় হল, যদি বাইচান্স আমার চাকরি হয় তাহলে তো ভীষণ মুশকিলে পড়ে যাব। তাই পরীক্ষার ফল বেরোবার আগেই আমি পালিয়ে জঙ্গলে চলে যাই।

পরীক্ষার ফল কী হয়েছিল?

অনেকদিন বাদে জানতে পারি খুব নীচে র‍্যাঙ্ক পেয়েছিলাম। কিন্তু তাতে আর কী লাভ হল! আমার ওসব পোষায় না। ওই জঙ্গলে গিয়েই আমি উগ্রবাদীদের দলে ভিড়ে যাই।

তারপর?

ওরা আমাকে সবরকম ট্রেনিং দিয়েছিল। জোট বেঁধে থাকতে বেশ লাগত কিন্তু। তারপর অ্যাকশন করতে যখন নামলাম তখনই বুঝতে পারলাম, আমি খুন টুন করতে পারছি না। একটা পুলিশের জিপে সাত—আটজন। পুলিশকে মারবার প্ল্যান ছিল। রাইফেল চালাতে গিয়ে নার্ভাস হয়ে আমি বমি করে ফেলেছিলাম। চোখের সামনে যখন আমার সঙ্গীরা গুলি চালিয়ে ওই সার্জেন্টকে মেরে দিল, তখন আমার অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। ফলে আমাকে ওরা আর অ্যাকশনে পাঠাত না। রান্নার কাজে লাগিয়ে দিল।

আপনি রাঁধতেন বুঝি?

হ্যাঁ। কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে আমি রাঁধতাম। কিন্তু রান্নার তো কিছুই জানি না। দ্বাদশী নামে একটা আদিবাসী মেয়ে একটু আধটু রাঁধতে জানত। সে—ই রাঁধত, আমি সাহায্য করতাম। জল ধরে আনা, মাংস কাটা, মশলা তৈরি করা, এইসব। বাজারহাটও করতে হত।

দ্বাদশীর বয়স কত?

কে জানে! আমার মতোই হবে হয়তো।

দেখতে কেমন, সুন্দর?

না। তেমন সুন্দর নয়। নাক থ্যাবড়া, কালো, পুরু ঠোঁট। তবে খুব খাটতে পারত।

খুব ভাব ছিল বুঝি তার সঙ্গে?

তা ছিল। সুখ—দুঃখের কথা হত। সংসারে বড্ড অভাব ছিল দ্বাদশীর। সেইসব কথা বলত। সেই আমাকে সাপ ধরতে শিখিয়েছিল। অবশ্য সাপ ধরে তখন সাপের মাংস খাওয়া হত। ছুঁচো, ইঁদুর, খরগোশ, সজারু, এমনকী বকের মাংস অবধি খেতে হয়েছে তখন।

এঃ মা গো! বমি আসত না?

খুব খিদে পেলে আর বমি টমি আসে না। বুঝলে খুকি? খিদে যে কী জিনিস তা তো জানো না!

দ্বাদশীর সঙ্গে কি আপনার কোনো সম্পর্ক হয়েছিল?

ও বাবা, তুমি খুব বিচ্ছু আছো তো!

বলুন না! হয়েছিল? অমন গম্ভীর হয়ে গেলেন কেন?

জঙ্গলের জীবনে কত কী হয়। সেসব মনে না রাখাই ভালো।

না না, বলুন।

মেয়েদের স্কোয়াড আর ছেলেদের স্কোয়াড তো পাশাপাশিই থাকত। তাই অনেক সময়ে ভাব ভালোবাসাও হত। তবে সে ঠিক স্বাভাবিক যুবক যুবতীদের মতো তো নয়। সব কমিটমেন্ট, ডিসিপ্লিন বজায় রাখতে হত তো। আর মৃত্যুর তো কোনো দিনক্ষণও ছিল না। হাওয়া—বাতাস, পাতা নড়ার শব্দ, পাখির ডাক, কুকুরের চিৎকার, সবকিছুর মধ্যেই থাকত নানা সংকেত, সতর্কবার্তা। এত অ্যালার্ট থাকতে হত যে, রোমান্স টোমান্স ছিল স্বপ্নের মতো। বুঝলে খুকি?

কিন্তু আপনার সঙ্গে দ্বাদশীর?

এই তো বললাম, ওই জীবনটাই ছিল অ্যান্টি রোমান্টিক, কমিটেড। দ্বাদশী শুধু একদিন আমাকে বলেছিল, তুই অমন ভিখারির মতো আমার দিকে চেয়ে থাকিস কেনে? লুটমার হয়ে যাবি। সাবোধান!

এ আবার কেমন কথা?

সেটা আমিও বুঝতে পারিনি। তবে ভেবে ভেবে পরে মনে হয়েছে এটার মধ্যে বোধহয় একটা ভালোবাসার বার্তা ছিল।

আপনি বুঝি দ্বাদশীর দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকতেন?

না খুকি। চেয়ে থাকা অন্য জিনিস। আর চাইব কখন, সারাক্ষণ তো কাজ করতে হত, চারদিকে নজর রাখতে হত। একসঙ্গে অতগুলো লোকের রান্নাও তো কম ব্যাপার নয়।

তবে দ্বাদশী বলল কেন?

কী জানি!

তারপর কী হল?

শুনলে আমার ওপর তোমার ঘেন্না হবে।

ওমা! কেন? কী করেছিলেন আপনি?

অনেক সময়ে কাছাকাছি পুলিশ আসত রেড করতে। আড়কাঠি খবর দিত পুলিশ অ্যালার্টের। তখন আমাদের রান্না বন্ধ রাখতে হত। কারণ আগুন জ্বাললে তার ধোঁয়া পুলিশকে সংকেত দেবে। অনেক সময়ে চেলা কাঠের উনুন নিবিয়ে ফেলতে হয়েছে। সেদিনও পুলিশ অ্যালার্ট দিল। আমরা উনুন জ্বালিনি। দুজনেই—আমি আর দ্বাদশী রাইফেল হাতে ডেরা আগলে আছি। বাকিরা এনকাউন্টারে গেছে। দূর থেকে গুলির আওয়াজও পাচ্ছিলাম। এমন সময় ঘুঘু পাখির ডাক জানান দিল পুলিশ ডেরার দিকে আসছে। আমাদের সামনে মাটি আর পাথর দিয়ে উঁচু ব্যারিকেড করাই ছিল। আমরা দুজন তার আড়ালে উপুড় হয়ে শুয়ে রাইফেল বাগিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। পুলিশ যদি সংখ্যায় বেশি হয় তাহলে আমাদের আশা নেই। মরতেই হবে।

পালালেন না কেন?

একেবারে আমার মনের কথা বলেছ? আমি চাপা গলায় দ্বাদশীকে বললাম, দ্বাদশী পালাবি? লড়ে তো লাভ হবে না, মরতে হবে। দ্বাদশীর চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে আসছিল। দাঁতে দাঁত পিষে বলল, পালাব কেনে?

আপনি কী করলেন?

আমি জন্মগতভাবে কাপুরুষ। হঠাৎ আমার মনে হল, আরে আমি তো এদের আইডিয়াকে তেমন বিশ্বাসও করি না। শুধু চাকরির হাত থেকে বাঁচার জন্য গা—ঢাকা দিয়ে থাকতে ভিড়ে গিয়েছিলাম। তাহলে আমি মরতে যাব কেন? এই লড়াই তো আমার লড়াই নয়। আমি কিসের জন্য প্রাণ দিতে যাচ্ছি? পুলিশ যে

আসছে তা গাছপালার নড়াচড়া থেকে টের পাচ্ছিলাম। একটু দ্বিধাও ছিল। পালাব? কাপুরুষ মনে হবে না নিজেকে? তবে আমি তো আসলে কাপুরুষই। পৃথিবীতে বেশিরভাগ লোকই তো কাপুরুষ। পুলিশ খুব কাছাকাছি এসে পড়েছিল। হঠাৎ দ্বাদশী গুলি চালাতে শুরু করে দিল। আর আমি হামাগুড়ি দিয়ে পিছু হটে গাছগাছালির আড়ালে গিয়ে প্রাণপণে ছুটতে লাগলাম। রাইফেলটা সঙ্গে ছিল কিছুক্ষণ। তারপর একটা ছোট নদী পেরোনোর সময় সেটা জলে ফেলে দিই। পালানোর সময় দূর থেকেও অনেকক্ষণ দু—পক্ষের গুলির আওয়াজ শুনেছি। দ্বাদশী সহজে হার মানেনি। অনেকক্ষণ লড়েছিল। পরদিন খবরের কাগজে তার মৃত্যুসংবাদ পড়ে মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল খুব।

আপনি দ্বাদশীকে নিশ্চয়ই ভালোবেসে ফেলেছিলেন!

ভালোবাসা যে কত রকমের আছে খুকি, তার তো হিসেব নেই। এটাও একরকম ভালোবাসাই ছিল বটে। তবে ঠিক কীরকম তা আজও বুঝে উঠতে পারিনি।

আমি কিন্তু বুঝতে পেরেছি।

বটে! এই চোদ্দো পনেরো বছর বয়সে কি আর ভালোবাসার রকম সকম বোঝা যায়।

চোদ্দো—পনেরো! আমার সতেরো প্লাস। আর তিন মাস পরে আমি ভোট দেব, তা জানেন? আর আপনিই কোন বুড়ো মানুষ? যতদূর জানি আপনার এখন সাতাশ।

আঠাশ।

তাহলে অমন বুড়োদের মতো হাবভাব কেন আপনার?

আসলে কি জানো খুকি, মানুষ তো শুধু বয়সেই বুড়ো হয় না, অভিজ্ঞতাতেও হয়।

আচ্ছা, পালানোর পর কী হল সেইটে বলুন।

জঙ্গল থেকে পালিয়ে দুটো বিপদ আমার পিছু নিল। বুঝলে! এক হল পুলিশ আর গোয়েন্দা। আর হল আমার দলের লোক। দলের লোকরা বুঝতে পারল, দ্বাদশীকে বাঁচানোর কোনো চেষ্টাই আমি করিনি। হাতে রাইফেল থাকা সত্ত্বেও গুলি চালাইনি এবং একজন কমরেডকে মরতে দিয়ে জান বাঁচাতে পালিয়ে গেছি। ওই এলাকায় থাকলে আড়কাঠি মারফত তারা ঠিকই আমার খবর পেয়ে যেত। তাই আমি পালিয়ে যাই অসমে। কোকরাঝাড়ে আমার এক বন্ধুর কাছে।

আর আপনার আইএএস—এর চাকরি?

হ্যাঁ, অ্যালায়েড সার্ভিসে আসার ভাগ্যে একটা ভদ্রস্থ চাকরিও জুটেছিল বটে, কিন্তু সেটা থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যই তো আমাকে এত কিছু করতে হয়েছিল। মেয়াদ পেরিয়ে যাওয়ার পর আমি বাড়িতে ফিরে আসি। বাবা আমাকে প্রায় ত্যাজ্যপুত্র করে দিয়েছিল।

আপনার টেরোরিস্ট কমরেডরা কি এখনও আপনাকে খতম তালিকায় রেখেছে?

কে জানে? তবে ওসব দল মাঝে মাঝে ভেঙে যায়, নতুন নতুন ফ্র্যাকশন তৈরি হয়। কর্মসূচিও পালটায়। তা ছাড়া এক জায়গায় বেশিদিন থাকে না কেউ। ঠিকানা বদলাতে হয়। অনেকে জঙ্গল ছেড়ে সাধারণ জীবনে ফিরেও যায়। ফলে চার পাঁচ বছর আগেকার খতম তালিকা আর এতদিন বহাল আছে বলে মনে হয় না। কমরেডরা অনেকেই মারাও গেছে এনকাউন্টারে। না খুকি, আমি বোধহয় নিরাপদ। কিন্তু এই নিরাপদে থাকাটা আমার ভালো লাগে না। একটা অপরাধবোধ কাজ করে। দ্বাদশীর বয়স তখন মাত্র তেইশ—চব্বিশ। শক্তপোক্ত মেয়ে তরতাজা। সেই মেয়েটি যেভাবে পুলিশের মুখোমুখি একা লড়ে গেল ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়। মাঝে মাঝে নিজেকে ঘেন্নাও হয়। কেন যে পালাতে গেলাম! না হয় মরতাম, সেটা আর এমন কী ব্যাপার!

আমার তো মনে হয় আপনি ঠিক কাজই করেছেন। আপনি একটু অদ্ভুত আছেন ঠিকই, তবে ওরকমভাবে মরাটাও কোনো কাজের কথা নয়।

ভাল করলাম, না খারাপ করলাম তাই নিয়ে আমার মনে একটা দ্বন্দ্ব কিন্তু এখনও আছে।

আপনি একটুও খারাপ কাজ করেননি।

দ্বাদশীর গায়ে ছত্রিশটা বুলেট ঢুকেছিল। একজনকে মারতে একটা গুলিই তো যথেষ্ট। বাকি পঁয়ত্রিশটা রাগ আর ঘেন্না থেকে করা।

দ্বাদশীর হাতেও তো নিশ্চয়ই কেউ মারা গিয়েছিল।

হ্যাঁ। দু'জন সেই এনকাউন্টারে। আগে আরও ডজন খানেক।

তাহলে ভাবুন, সেই লোকগুলোরই বা কী দোষ?

সেই তো। দোষ যে কার তা ভেবেই পাই না।

টেররিস্ট গ্রুপের কথা তুলে আমি বোধহয় আপনার মনটা খারাপ করে দিলাম।

আরে না। জীবনে কত কিছু হয়।

আচ্ছা, আপনি চাকরি করবেন না বুঝলাম। কিন্তু তাহলে আপনি করবেনটা কী? আমার দাদা বলছিল, আপনার নাকি ছেলেবেলা থেকেই পুরুত হওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল? সত্যি?

হাঃ হাঃ। হ্যাঁ সত্যি। আসলে আমাদের বাড়িতে বিরূপাক্ষ শাস্ত্রী নামে একজন পুরোহিত পুজো করতে মাঝে মাঝে আসতেন। খুব তেজী মানুষ। জীবনে মিথ্যে কথা নাকি উচ্চারণ করেননি। কিন্তু শাস্ত্রপাঠ করতেন। আর সব মন্ত্রই তাঁর ঠোঁটস্থ, কখনও বই পড়ে মন্ত্র উচ্চারণ করতেন না। তাঁকে দেখে খুব ওইরকম হওয়ার ইচ্ছে হত।

মাগো? চালকলার পুরুতঠাকুর!

কেন, খারাপ কী? হ্যাঁ, একটা কথা অবশ্য ঠিক যে, এই প্রফেশনটায় তেমন সচ্ছলতা নেই।

নেই—ই তো? তাহলে পুরুত হওয়া হয়নি তো আপনার?

একেবারে হয়নি তা কিন্তু নয়। আমি লক্ষ্মীপুজো, সরস্বতী পুজো দিব্যি করতে পারি। ভূত প্রেত বা হোর তাড়ানোর মন্ত্র জানি।

আপনি না ভীষণ বিচ্ছিরি একটা লোক!

তা তো ঠিকই। নানা অ্যাঙ্গেল থেকে আমিও নিজেকে ভেবে দেখেছি, আমি সত্যিই একটা বিচ্ছিরি লোক। আমার এক পিসি আছেন, খুব ভালোবাসেন আমাকে। মাঝে মাঝেই বাঙাল ভাষায় বলেন, ওরে পোড়াকাইল্যা, তুই এমন দামড়া হইলি কেমনে?

হিহি। দামড়া মানে কী?

যার বয়স হয়েছে কিন্তু বুদ্ধি পাকেনি।

তাহলে আপনি কী করবেন বলুন তো?

ওই তো দেখতে পাচ্ছ, আমাদের বাড়ির সঙ্গে এক বিঘারও বেশি একটা জমি আমি নিজের হাতে কোদাল দিয়ে কয়েকদিন ধরে কুপিয়ে মাটি চৌরস করেছি।

দেখলাম তো! কাজটা লোক লাগিয়েই করাতে পারতেন। আমরা তো বাগান কোপানোর জন্য লোক রেখেছি।

তাতে মাটির সঙ্গে ভাব হত না।

মাটির সঙ্গে ভাব! সে আবার কী?

লোক দিয়ে করালে কি ওই জমিটার সঙ্গে আমার ভাব ভালবাসা হত? আমি রোজ কোদাল চালাতে চালাতে মাটির সঙ্গে কত কথা বলতাম জানো?

কী বলতেন শুনি?

আগে হাতজোড় করে একটা পেন্নাম, তারপর কোদাল চালাচ্ছি বলে ক্ষমা চাওয়া, আর কোদাল চালাতে চালাতে নানারকম মন ভোলানো কথা।

মন্ত্র তন্ত্র নাকি?

আরে না। এমনি যা মনে আসে বলি। তোমরা যেমন বন্ধুদের সঙ্গে, মায়ের সঙ্গে, বাবার সঙ্গে কথা বলো তেমনই।

ওমা। কিন্তু তাতে কী হয়?

হয়তো কিছুই হয় না। কিন্তু আমার মনে হয় ফ্রেন্ডশিপ হয়। একটা আত্মীয়তা হয়। হাসছ। আমি জানি অনেকে আমাকে পাগলও বলে।

হিহি। আপনার বীরত্ব আমরা আড়াল থেকে রোজ দেখি। আমি আর মা। মা কী বলে জানেন? বলে, আহা রে, কী খাটুনিটাই না খাটছে! ওর নিশ্চয়ই খিদে পায়। কী ছাইভস্ম খায় কে জানে, একদিন ডেকে এনে ভালো করে খাওয়াতে ইচ্ছে করে।

পান্তাভাত কিন্তু ছাইভস্ম নয়। পান্তাভাতের দারুণ ক্ষমতা।

তাই বুঝি! ভাত তো শুধু কার্বোহাইড্রেট মশাই!

আমি অবশ্য সায়েন্স জানি না। তবে পান্তাভাত খাই বলে আমি গায়ে বেশ জোর পাই।

মাংস খেলে আরও জোর হবে।

কে খাওয়ায় বলো। সারাদিন মাটি কুপিয়ে আর রান্নার সময় পাওয়া যায় না। মাসিমা বুঝি সত্যিই একদিন খাওয়াবেন আমাকে?

আপনি বেশ পেটুক আছেন, না?

তা আছি।

আহা, অমন লজ্জা পাচ্ছেন কেন? আপনার পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের একটু লতাপাতায় আত্মীয়তাও তো আছে।

হ্যাঁ। তবে শেষ দিকে কী একটা গোলমালও হয়েছিল যেন।

হ্যাঁ, আপনাদের পরিবারের কে যেন আমার এক পিসিকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তাই নিয়ে অশান্তি।

হবে বোধহয়। আমাদের এক জ্যাঠা মধুসূদন ব্যানার্জি, তারা এখনও বেশ সুখেই আছেন। চার ছেলেমেয়ে। ওঁদের বিয়ে তো হতেই পারত। তা নিয়ে অশান্তি কেন?

কে জানে। ওসব নিয়ে এখন আর কোনও আলোচনা হয় না। লোকে ভুলেই গেছে।

যাক, বাঁচা গেল।

আপনি তাতে হাঁপ ছাড়লেন কেন?

ভাবছিলাম, পুরোনো ঝগড়ার জেরে মাসিমার নেমন্তন্নটা বাতিল হয়ে গেল নাকি।

উঃ, কী পেটুক রে বাবা! কে রোজ রোজ পান্তাভাত খেতে আপনাকে মাথার দিব্যি দিয়েছে বলুন তো? মা তো সেই প্রথম দিনেই আপনাকে বলেছিল, ও বাবা সত্যজিৎ, যে ক—দিন থাকবে এ বাড়িতেই খেয়ো। বলেনি বলুন তো!

হ্যাঁ, তখন ভারি লজ্জা হয়েছিল। রোজ কি কেউ কারও বাড়িতে খেতে পারে?

পেটে খিদে মুখে লাজ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেকটা তাই।

কী বোকা লোক রে বাবা, আবার স্বীকারও করে নিচ্ছেন যে, আপনার পেটে খিদে মুখে লাজ? এরকম হাসছেন কেন?

এই যে তুমি ধরে ফেললে যে, আমি একটু পেটুক আর হ্যাংলা তাতে আমার কিন্তু এখন সত্যিই একটু লজ্জা—লজ্জা করছে।

ওমা! তাই তো! আপনার মুখটা যে সত্যিই লজ্জায় বেশ রাঙা দেখাচ্ছে।

আমি সত্যিই খুব লজ্জিত ফিল করছি।

আহা রে! আচ্ছা আপনার আছেটা কী বলুন তো! রোজ দেখি একটা অ্যালুমিনিয়ামের কানা উঁচু গামলার মতো জিনিসে পান্তাভাত মেখে গাছতলায় বসে খাচ্ছেন। গাছতলায় বসে খাওয়া কি ভাল? ওপর থেকে যদি পাখিতে পটি করে দেয়?

হ্যাঁ সেটা তো হতেই পারে। তবে ওখানে বসে যখন খাই তখন দেখো অনেক পাখিটাখি চলে আসে, কাছাকাছি ঘুর ঘুর করে, দুটো নেড়ি কুকুরও এসে বসে থাকে। ভাগ বাটোয়াঁরা করে খেতে ভারী ভালো লাগে।

মা রোজ বলে, দ্যাখ ছেলেটা কেমন দীনদরিদ্রের মতো বসে খায়!

মাসিমার বড্ড মায়া, না?

মায়া আরও অনেকেরই আছে মশাই, শুনুন, আপনি তো বেলা দেড়টা থেকে দুটোর মধ্যে খান?

ওরকমই। আমি তো আর ঘড়ি ধরে খাই না। যখন খুব চনমনে খিদে পায় তখনই বসে যাই।

আপনার সারাদিনের রুটিন আমাদের মুখস্থ। আবার ভাববেন না যে, আপনার ওপর গোয়েন্দাগিরি করা হচ্ছে।

আরে না। আমাকে যে লক্ষ করা হচ্ছে এটাই তো আমার পক্ষে বিশাল একটা পাওনা। নইলে এ যুগে কে কাকে লক্ষ করে বলো তো।

বুঝলাম। বলছিলাম কি আমাদের কালিদাসীমাসিকে কি চেনেন?

চিনব না কেন? উনি তো আমাকে রোজ জিজ্ঞেস করতেন, ও দাদাবাবু আজ কী রাঁধলে গো! আমার জবাব শুনে মোটেই খুশি হতেন না। বলতেন, অত গতরপাত করছ, মেটুলি টেটুলি খেয়ো নইলে যে টিবি হবে।

এঃ মা, বলেছে ওই কথা।

আহা, ভালো ভেবেই তো বলেছে। কিন্তু হঠাৎ কালিদাসীমাসির কথা উঠল কেন?

ওর রান্না খুব খারাপ। কিন্তু মা তো বাতের ব্যথায় অচল, রাঁধতে পারে না, আমাদের ওই কালিদাসীমাসির হাতের অমৃতই খেতে হয়। তাই বলছিলাম, এখন মোটে এগারোটা বাজে, বেলা বেশি হয়নি। বারোটা নাগাদ আমি আপনাকে মাছের ঝোল পৌঁছে দিয়ে আসব। জিভ কাটলেন যে।

আরে না, ওসবের দরকার নেই।

এই জন্যই আপনাকে আমার একটুও পছন্দ হয় না। আপনি কেমন যেন একটা লোক।

আহা, তোমাদের ভাগে কম পড়বে না?

কম পড়বে। আমাদের বাজার কে করে জানেন? আমার মনাজ্যাঠা। কাঠ—বাঙাল লোক, খাওয়া ছাড়া কিছু বোঝে না। যেখানে আধকিলো মাছে আমাদের ভেসে যায় সেখানে জ্যাঠা দু—তিন কিলো নিয়ে আসে। ফেলে ছড়িয়ে খেয়েও বেশি হয়।

সে তো বুঝলুম। কিন্তু একদিন ভালমন্দ খেয়ে আর কী লাভ বলো। কাল থেকেই তো ফের লেবুপাতা, লঙ্কা আর নুন।

ও বাবা! বোকা হলেও সেয়ানা তো কম নন আপনি! রোজকার বন্দোবস্ত করতে চান বুঝি?

আরে না না, তুমি ভুল বুঝছ।

থাক আর সাফাই গাইতে হবে না। আপনি বলার ঢের আগেই মা ঠিক করে রেখেছে রোজ আপনার জন্য মাছ তরকারি পাঠাবে।

সেটা খুবই দৃষ্টিকটু হবে খুকি। ছিঃ ছিঃ, আমার আর মান সম্মান রইল না।

কেন শুনি! মান গেল কিসে?

ও তুমি বুঝবে না। এখন আমার ভারি অনুতাপ হচ্ছে খুকি!

অনুতাপ হচ্ছে তো হোক। পেট জুড়োলে অনুতাপও জুড়িয়ে যাবে। আচ্ছা আপনি কি জানেন যে, আপনাদের ওই মস্ত জামগাছটায় আগে একটা দোলনা টাঙানো ছিল।

জানি।

সেটা কী হল?

দড়ি ছিঁড়ে গেছে, তবে পিঁড়িটা আছে।

দোলনাটা আবার টাঙাবেন?

কেন বলো তো?

আমার খুব ইচ্ছে করছে আপনি যখন খেতে কাজ করবেন, ফসল যখন ফলবে, তখন দোলনায় দুলতে দুলতে আমি দেখব।

কী দেখবে খুকি?

একটা কিম্ভূত লোককে, আর তার ফলানো ফসলকে।

# চিহ্ন

অন্ধকারে ভেসে যাচ্ছে জ্বলন্ত মোমবাতি।

হলুদ আলোয় যেন জলের মধ্যে জেগে আছে ইভার মুখ। মুখখানা এখন ভৌতিক। একটু নিচুতে আলো, শিখাটা হেলছে, দুলছে, কাঁপছে। ইভার মুখে সেই আলো গালের গর্তে, চোখের গর্তে, কপালের ভাঁজে ছায়া। মুখখানা যেন বা এখন ইভার নয়। ইভার এ ঘর থেকে ও ঘরে যাচ্ছে। মাঝখানের পর্দা উড়ছে হাওয়ায়।

অমিল বলে—সাবধান। পরদায় আগুন না লাগে!

ইভা কিছু বলল না।। জলে ক্লান্ত সাঁতারু যেমন শ্লথ গতিতে ভেসে যায়, তেমনি এ ঘর থেকে ও ঘরে চলে গেল।

অন্ধকারে চৌকিতে বসে আছে অমিত। তার কোল ঘেঁষে পাঁচ বছরের ছেলে টুবলু আর তিন বছরের মেয়ে অনিতা। যখনই কারেন্ট চলে যায় তখনই অমিত তার দুই ছেলেমেয়েকে ডেকে নিয়ে বিছানায় বসে থাকে। বড্ড ভিতু অমিত।

অন্ধকারে কোথায় কোন পোকামাকড় কামড়ায় কিংবা আসবাবপত্রে হোঁচট লাগে। কিংবা খোলা, পড়ে—থাকা ব্লেড বা ইভার পেতে—রাখা অসাবধান বঁটিতে গিয়ে পড়ে। কিংবা এরকম আর কিছু হয় সেই ভয় তার। বুক ঘেঁষে ছেলেমেয়েরা বসে আছে বুকের দুই পাঁজরে দুজনের মাথা। অমিত ঘামছে।

—একটা মোমবাতি এ ঘরে দেবে না? অমিত চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে।

রান্নাঘর থেকে ইভার উত্তর আসে না! ইভা ওরকমই। আজকাল দু—তিনবার জিজ্ঞেস না করলে উত্তর দেয় না।

—কী গো? অমিত বলল।

ইভা আস্তে বলে—মোমবাতি দিয়ে কি হবে? তোমরা তো বসেই থাকবে এখন!

—অন্ধকারে কি ভালো লাগে?

—না লাগলেও কিছু করার নেই। মোমবাতি একটাই ছিল।

—ওঃ। অমিত সিগারেট ধরাল।

অনিতার মাথাটা বুক থেকে স্খলিত হয়ে কোলে নেমে গেল। তার দ্রুত শ্বাস—প্রশ্বাসের শব্দ হয়। ঘুমিয়ে পড়বে মেয়েটা।

অমিত নিচু হয়ে ডাকল—অনি, ও অনি!

—উঁ। ক্ষীণ পাখি—গলায় সাড়া দেয় অনিতা।

—এখনো ঘুমোয় না মা, ভাত খেয়ে ঘুমোবে।

—খাব না।

—খাব না কি? খেতে হয়। গল্পটা শোন।

ঘুমগলাতেই অনিতা বলে—বল তাহলে।

এইটুকু বয়সেই কি টনটনে উচ্চারণ মেয়েটার! পরিষ্কার কথা বলে, এতটুকু শিশুসুলভ আধো—কথার জড়তা নেই। অমিত মাঝে মাঝে ইভাকে বলে—আমরা ছেলেবয়সে এত পাকা কথা বলতে পারতামই না। এখনকার ছেলেমেয়েরা কীরকম অল্প বয়সেই পাকা হয়ে যায়।

ঘুমন্ত মেয়েটাকে টেনে বসায় অমিত। মাথাটা আবার পাঁজরে লাগে। অনেকক্ষণ চুপচাপ ব্যাপারটা লক্ষ করে টুবলু বলে—আমি ঘুমোই না। ঘুমোই বাবা?

—না তো। তুমি লক্ষ্মী ছেলে।

ছেলেটার জন্য কত মায়া অমিতের, ভারী ভিতু ছেলে, ঘরকুনো। এ বয়সে যেমন দুরন্ত হয় বাচ্চারা, তেমন নয়। রোগা দুর্বল ন্যাতানো। স্টেশন রোড—এর এক বুড়ো হোমিওপ্যাথ গত বছরখানেক যাবৎ ওষুধ দিচ্ছে। কিন্তু ছেলেটার তেমন বাড়ন নেই। খেতে চায় না, কখনো ওর তেষ্টা পায় না, খেলে না। ইভার ইচ্ছে একজন চাইল্ড—স্পেশালিস্টকে দেখায়। সেটা হয়তো ধারকর্জ করে দেখাতেও পারত অমিত। কিন্তু তার কলেজের একজন কলিগ ছেলেকে স্পেশালিস্ট দিয়ে দেখানোর পর যে খাওয়ার চার্ট আর ওষুধ—বিষুধের ফিরিস্তি দিয়েছিল তাতে অমিত ভড়কে যায়। তাই গত একবছর যাবৎ ইভা বিস্তর অনুযোগ করা সত্ত্বেও অমিত গা করেনি। যাক গে, কৃষ্ণের জীব, টিক টিক বেঁচে থাক। বড় হলে সব ঠিক হয়ে যাবে। ছেলে বয়সে অমিতও তো কত ভুগেছে, মাসেক ধরে রক্ত—আমাশা, চিকিৎসা ফিকিৎসা নিয়ে সেই মাথা ঘামত না। গ্যাঁদাল পাতা বাটা, থানকুনির ঝোল, পুরোনো আতপ চালের গলা ভাত, পাড়ার এল—এম—এফ ডাক্তারের দেওয়া ক্যাস্টর অয়েল ইমালশান, এই খেয়ে ফাঁড়া কাটিয়ে আজও বেঁচে আছে। তার ছেলেটাই বা তাহলে বাঁচবে না কেন?

সিগারেটের আগুন ফুলকি ছড়াচ্ছে। অন্ধকারে হাতড়ে অ্যাশট্রেটা ঠাহর করে অমিত। সাবধানে ছাই ঝাড়ে। বলে—একদিন একটা টিয়াপাখি উড়ে এল খরগোশের বাড়িতে, বলল—খরগোশ ভাই, আমি তোমার কাছে থাকব। খরগোশ—থাকবে তো। কিন্তু ঘর কোথায়! আমার তো ছোট্ট একটু খুপড়ি! টিয়াপাখি বলে—আমার বাসা পড়ে ভেঙে গেছে, এখন আমার ডিম পাড়বার সময়, তাহলে উপায়? তখন খরগোশটার দয়া হল, একটা ছোট্ট খুপরি বানিয়ে দিল টিয়াপাখিটাকে। টিয়াপাখি থাকে, ডিম পাড়ে, তা দেয় মনে ভারী আনন্দ, ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুবে। কত আদর করবে বাচ্চাকে, উড়তে শেখাবে, খেতে শেখাবে, শিকার করতে শেখাবে। খরগোশ একদিন খাবার আনতে বাইরে গেছে, এমন সময়ে এক মস্ত ইঁদুর এসে হাজির। বলল—এই টিয়াপাখি, দে তোর দুটো ডিম। টিয়া বলল, কেন দেব? ডিম ফুটে আমার বাচ্চা হবে, কত আদর করব, তোকে দেব কেন? ইঁদুর বলল—দিবি না তো। তবে রে বলে দাঁত বের করে কামড়াতে গেল... অনি ও অনি।

—উঁ।

—আবার ঘুমোচ্ছিস? বলে অমিত গলা ছেলে বলে—ইভা, ভাত হয়েছে? অনি ঘুমিয়ে পড়ছে যে।

—বাবা, তারপর? জিজ্ঞেস করে টুবলু।

—বলছি দাঁড়া। দ্যাখ না, বোন ঘুমিয়ে পড়ছে! ও অনি!

হঠাৎ অন্ধকারে ছায়ামূর্তির মতো আসে ইভা। কথা বলে না। নড়া ধরে হিঁচড়ে টেনে নেয় মেয়েটাকে। ছেলেটাকে টানতে হয় না। ভিতু ছেলে। অন্ধকারেই টের পায় মার মেজাজ ভালো নেই। সে রোগা পায়ে লাফ দিয়ে নামে চৌকি থেকে। মার পিছু পিছু বাধ্য ছেলের মতো যায়।

দু—ঘরের মাঝখানে পরদা উড়ছে। ওপাশেরটা আসলে ঘর নয়। রান্নাঘর। সেখানে মোমের আলোর আভা। অন্ধকারে বসে অমিত সেই মৃদু আভার দিকে চেয়ে থাকে। মেয়েটা খেতে চাইছে না। ইভা তার হাতের চুড়ির শব্দ তুলে দুটো চড় কষাল। মেয়েটা কাঁদছে। ইভা চাপা স্বরে মেয়েকে বকছে এবং মেয়েকে বকতে বকতেই বকার ঝাঁঝটা নিজের কপালের এবং ভাগ্যের প্রসঙ্গে বলে যাচ্ছে। অমিত চুপ করে বসে শোনে। ইচ্ছে করে উঠে গিয়ে একটা লাথিতে মেয়েমানুষটিকে চুপ করায়।

লাথি যে কখনো মারেনি অমিত তা নয়। লাথি বা চড় চাপড় কয়েকবারই মেরে দেখেছে। লাভ হয় না। সদ্য সদ্য একটু ফল হয় বটে কিন্তু ইভা দ্বিগুণ বেড়ে যায়।

অবিকল ছাগলের মতো একটা লোক গলা পরিষ্কার করছে কোথায় যেন। 'হ্যা—ক' 'হ্যা—ক' শব্দটা শুনলে নিজেরও যেন বমি তুলতে ইচ্ছে করে।

কান্না থামিয়ে ছেলেমেয়েরা এখন খাচ্ছে। গুন গুন করে এখন আবার সোহাগের গলায় গল্প শোনাচ্ছে ইভা। ইভাকে নিয়েই দিনের অধিকাংশ সময় ভাবে অমিত। বিয়ে করে তারা সুখী না অসুখী তা ঠিক বুঝতে পারে না। কেউই বোধ হয় পারে না। মেয়েমানুষ জাতটার মুখের সঙ্গে মনের মিল নেই। যখন তারা খুবই সুখে আছে তখনো পুরোনো দুঃখের কথা তুলে খোঁটা দেবেই।

খেয়ে দেয়ে ওরা এল। ইভা মশারি টাঙাল। ওরা গল্পের বাকি অর্ধেকটা না শুনেই ঘুমিয়ে পড়ল।

কারেন্ট এখনো আসেনি। পৃথিবী জোড়া অন্ধকার।

মোমবাতিটা মাঝখানে রেখে দুধারে নিঃশব্দে খেতে বসে ইভা আর অমিত, সম্পর্কটা সহজ নেই যেন। একধারে ছেলেমেয়েদের এঁটো থালা পড়ে আছে। তাতে ডাল—ঝোল মাখা কিছু ভাত। অমিত আড়চোখে চেয়ে দেখল। এখন দু—টাকা আশি কেজি যাচ্ছে চাল। তাদের রেশন কার্ড নেই। বলল—ভাত নষ্ট করো কেন!

—কী করব? শেষ কয়েকটা গরাস খেল না।

—কম করে নেবে। গুচ্ছের গেলাতে চাইলেই কি হয়। ওদের পেটে জায়গা কত।

—দুটো ভাতই তো, আর কি ভালোমন্দ খায়! ঘি মাখন মাছ মাংস কি যায় ওদের পেটে?

—গরিবের সন্তান, যা জোটে তাই খেয়ে বাঁচবে।

—মুরোদ না থাকলেই ওসব কথা বলে লোকে।

—চালের দাম জানো?

—জানতে চাই না।

মেয়েমানুষটা ঝগড়া পাকিয়ে তুলছে। রোগা, দুর্বল, রক্তহীন। তবু গলা এতটুকু ক্ষীণ নয়। সবচেয়ে আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি ইভার। বিয়ের সাত বছর ধরে প্রতিদিন অমিত যত অন্যায় করেছে, যত অবহেলা, অত অপমান সব হুবহু মুখস্থ বলে যায়। মেজাজ ভালো থাকলে, মাঝে মাঝে বলে—এরকম মেমারী নিয়ে লেখাপড়া করলে না ইভা, কেবল স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে বসে রইলে।

জ্বলন্ত মোমবাতির উপর দিয়ে বাঘের চোখে ইভার দিকে চেয়ে থাকে অমিত। ইভাও চেয়ে থাকে রাগী বনবেড়ালের মতো। একটুও ভয় পায় না। ভিতরটা হতাশায় ভরে যায় অমিতের। কী রকম করলে কীভাবে তাকালে সেও একটু ভয় পাবে। একটু সমীহ করবে তাকে। অমিত আবার পাতের উপর মুখ নামায়। লাল রুটিগুলো দেখে এবং ভাবতে থাকে সে হিপনোটিজম শিখবে। কিংবা আরও রাগী হয়ে যাবে! কিংবা একদিন কিছু না বলে কয়ে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে।

নিরুদ্দেশও একবার হয়েছিল অমিত এক রাতের জন্য। পরদিন ফিরে দেখে ইভার কি করুণ অবস্থা। পাড়াসুদ্ধ মেয়েপুরুষ ঘর ভরতি, মাঝখানে পাথর হয়ে ইভা বসে, দু—চোখে অবিরল ধারা। তাকে দেখে সাতজন্মের হারানো ধন ফিরে পাওয়ার মতো উড়ে এসেছিল। তারপরই অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। সেই দৃশ্য মনে পড়লে আজও বুক ব্যথা করে। ইভার ভালোবাসাও তো নিখাদ। অমিতও কি বাসে না? বাসে। ভীষণ। তেরাত্রি ইভাকে ছেড়ে থাকলে নিজেকে অনাথ বালকের মতো লাগে। সেই জন্যই ইভা বহুকাল বাপের বাড়ি যায় না। অমিতের জন্য।

চালওলা দুঃখিত মুখখানি তুলল। ভ্রাম্যমাণ পুরুত কপালে চন্দনের আর সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে গেছে, কানে গোঁজা বিল্বপত্র। শ্বাস ফেলে বলে—তিন টাকা দশ।

—বলো কি? অমিত চমকায়। তার মাস মাইনে একশো আশি প্লাস কলেজ ডি এ। রেশন কার্ড নেই।

করুণ একটু হাসে চালওলা—আজ তো এই দর। কাল আবার কি হবে কে জানে।

—গত সপ্তাহে দু—টাকা আশি করে নিয়েছি।

গত সপ্তাহ! সে তো বাবু গত সপ্তাহে। বলে পাল্লা তুলে বলে—কতটা দেব। দশ কেজি নেওয়ার কথা বলে দিয়েছিল ইভা। কিন্তু সাহস পেল না অমিত। বলল—চার কেজি।

—গত সপ্তাহে আপনাকে বলেছিলাম, কিছু বেশি করে নিয়ে রাখুন। এ সময়টায় দর চড়ে। চাল গুন করতে করতে চালওলা বলে। তারপর বিড়বিড় করতে থাকে—রাম .... রাম.... দুই.... তিন.... তিন....

ক—বছর আগেও চাল কিনলে এক আঁজলা কি এক মুঠো ফাউ দিত। এখন আঙুলের ডগায় গোনাগুনতি দশ কি বারোটা চাল বাড়তি দিল।

ঘামে পিছলে নেমে এসেছিল চশমাটা। অমিত ঠেলে সেটা সেট করল। ইভাকে ধমকে দিতে হবে। ছেলেমেয়েদের পাতে যেন আর ভাত না নষ্ট হয়। আর, এবার থেকে ইভা আর অমিতের মতো ওরাও রাতে রুটি খাবে। পেটে সহ্য হয় না বললে চলবে না। সকলের ছেলেমেয়ে রুটি খায় ওদের ছেলেমেয়ে খাবে না কেন? খেতে খেতে অভ্যাস হয়ে যাবে। ইভা হয়তো ঝগড়া করবে, তেড়ে আসবে, তবু বলতে ছাড়বে না অমিত।

বাজার আর চালের বোঝা দু—হাতে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অমিত ইভা কী বলবে এবং সে তার উত্তর দেবে তা ভাবতে ভাবতে যায়। এবং মনে মনে সে ঝগড়া করতে থাকে। প্রচণ্ড ঝগড়া। রাগে ফেটে পড়ে। ইভাকে লাথি মারে, চুলের ঝুঁটি করে হিঁচড়ে টেনে বের করে দেয় ঘর থেকে, বলে—ইঃ নবাবের মেয়ে!

কিন্তু সবই ঘটে মনে মনে। একটু অন্যমনস্কভাবে সে রাস্তার দূরত্ব অতিক্রম করতে থাকে। আজকাল ইভার কথা ভাবতেই তার মাথা আগুন হয়ে উঠে। মনে মনে সে যে কত গাল দেয় ইভাকে। ভালো কি বাসে না? বাসে। ভীষণ। এবং এই দুটি অনুভূতিই তাকে দু—ভাগে ভাগ করে খেয়ে নিচ্ছে।

ইভা রাগ করল না। মন দিয়ে অমিতের কাছে চালের দর, দেশের দুর্দিনের কথা শুনল! তারপর সংক্ষেপে বলে—দেখি।

—হ্যাঁ। দেখ। গাঁয়ে মাস্টারি করতাম, সে বরং ভালো ছিল। শহরে নতুন প্রফেসারি নিয়ে এসে ফেঁসে গেছি। চেনাজানা লোকও তেমন নেই যে টপ করে হাত পাতব, দোকানেও ধারবাকী আনার মতো চেনা হয়নি। বুঝলে?

ইভা বুঝেছে। মাথা নাড়ল। এবং একটু পরে এক কাপ অপ্রত্যাশিত চা—ও করে দিল।

ইকনমিক্স—এর সাহা বেঁটে এবং কালো, মুখখানা সব সময়েই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। সহজেই উত্তেজিত হয় লোকটা, সহজেই আনন্দিত হয় লোকটা, সহজেই আনন্দিত হয়! তার সঙ্গে মোটামুটি ভালোই ভাব হয়ে গেছে অমিতের। দ্বিতীয় পিরিয়ডের পর দেখা হতেই লোকটা খুব উত্তেজিতভাবে বলল—এ হচ্ছে অঘোষিত দুর্ভিক্ষ। ফেমিন ইন ফুল ফর্ম।

—তাহলে সেটা ওরা ডিক্লেয়ার করুক।

তাই করে? ইজ্জতের প্রশ্ন আছে না? আমি সেদিন ঠাট্টা করে একজন ছাত্রকে বোঝাচ্ছিলাম, ইনফ্লেশন কাকে বলে। বলছিলাম, এখন দেখছ বাবা পকেটে টাকা নিয়ে যায় আর থলি ভরে বাজার করে নিয়ে আসে। যখন দেখবে বাবা থলি ভরে টাকা নিয়ে যায় আর পকেট ভরে বাজার করে নিয়ে আসে তখনই বুঝবে ইনফ্লেশন। জারমানিতে বিশ্বযুদ্ধের পর ওরকমই হয়েছিল। এখন দেখছি ঠাট্টা নয়। ব্যাপারটা দিনকে দিন তাই দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। নাইনটিন সিকসটি ওয়ারনের তুলনায় টাকার ভ্যালু...

কিন্তু এও ঠিক, সকালে তিন টাকা দশ কিলো দর—এ চাল কিনলেও অমিত টেরিকটনের হাওয়াই শার্ট পরে কলেজে এসেছে। পরনে জলপাইরঙা টেরিনের প্যান্ট, পায়ে বাটার জুতো, গাল কামানো। এখনো অধ্যাপকদের পরনে এরকমই পোশাক; কিংবা মিহি আদ্দির পাঞ্জাবি আর ভালো তাঁতের ধুতি। কিছু ক্লেশের চিহ্ন নেই।

একজন অধ্যাপক বলে—দক্ষিণ ভারত থেকে এক সন্ন্যাসী ডিক্লেয়ার করেছে সেভেনটি ফোর ইজ দি ব্ল্যাকেস্ট ইয়ার ইন দি হিস্টোরি অফ ম্যানকাইন্ড—

এ সবই হচ্ছে হাই—তোলা কথা। গায়ে লাগে না কারও। অধিকাংশ অধ্যাপকই অধ্যাপকসুলভ গম্ভীর, বিদ্যাভারাক্রান্ত চিন্তাশীল। দু—চারজন ছোকরা প্রফেসর একটু কথা চালাচালি করে হাল্কাভাবে। সামান্য একটু অস্বস্তি বোধ করে অমিত এখনো। দশ বছর স্কুল মাস্টারি করার পর হটাৎ চাকরিটা পেয়েছে সে। অধ্যাপকদের মেলায় এখনো নিজেকে একটু ছোট লাগে তার। যেন বা দয়ার পাত্র সকলের। কিন্তু তা নয়। এখানে কেউ কাউকে তেমন লক্ষ্য করেই না। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গাঁয়ে থেকে নোনা বাতাসে অমিত একটু কালো হয়ে গেছে, একটু গ্রাম্যও। তাই বোধহয় সে একাই বসে বসে সকালে শোনা অবিশ্বাস্য চালের কথা ভাবে। সেই মহার্ঘ ভাত এখনো তার পেটে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে।

কলকাতায় এসেই রেশন কার্ডের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করে রেখেছিল। এখনো এনকোয়ারী হয়নি। কবে যে হবে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। রাইটার্স বিল্ডিংয়ের আশুতোষ মুরুব্বি গোছের লোক পলিটিকস করে, নেতাদের সঙ্গে ভালোবাসা আছে। সে অভয় দিয়েছিল।

কলেজের পর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অমিত গেল তার কাছে।

—একটু দেরি হতে পারে বুঝলে পেঁপে চোর। আশু বলে রিসেন্টলি একগাদা ভুয়া কার্ড ধরা পড়েছে। এনকোয়ারী না করে নতুন কার্ড ইসু করবে না।

—তুমি তো জানোই ভাই, আমার লুকোছাপা কিছুই নেই। আমরা স্বামী—স্ত্রী আর দুটো মাইনর—

—হয়ে যাবে। ভেবো না।

—চালের দর আজ—

—জানি, আমিও তো ভাত খাই।

—আর দু—চারদিন খোলা বাজারে চাল কিনলে আমার থ্রম্বসিস হয়ে যাবে।

আশু হাসল। বলল, তুমি তো তবু পেঁপেচোর। আমি যে কেন্নো!

আশু বোধহয় প্রফেসরিটাকে তেমন ভালো চোখে দেখে না। অমিত চাকরিটা পাওয়ার পর থেকেই আশু তাকে প্রফেসরের বদলে পেঁপেচোর বলে ডেকে আসছে। কেরানি হল গে কেন্নো।

—দেখো ভাই। বলে অমিত।

আশু তাকে খাতির করল। ক্যান্টিনে নিয়ে ফ্রুট স্যালাড খাওয়াল। কফিও খাওয়াতে খাওয়াতে বলল—দুর্দিনের জন্য তৈরি হও। সারা দুনিয়ায় এবার ফলন কম। রাশিয়া, চীন সবাই ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে বেরিয়েছে।

পিওর ম্যাথেম্যাটিক্সের প্রফেসর অমিত এত খোঁজ রাখে না। তার বাড়িতে খবরের কাগজ নেই। উদ্বেগের সঙ্গে বলে—সে কী?

—বলছি কী! কেবল ওই মার্কিন মুলুকেই যা ফলার ফলেছে। কিন্তু বাংলাদেশ ইস্যুতে আমেরিকার সঙ্গে বাম্বু হয়ে গেছে আমাদের।

—দুনিয়ার মাটি কি শুকিয়ে যাচ্ছে আশু?

—শুকোবে না? যুবতীও তো বুড়ি হয় ভাই।

যুবতী ও বুড়ির কথায় তৎক্ষণাৎ অমিতের ইভার কথা মনে পড়ে। বাস্তবিক যুবতী যে কী বুড়ি হয় তা অমিতের চেয়ে বেশি কে আর জানে! দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সেই গাঁয়ের কিশোরী মেয়েটি কত চট করে বুড়ি হয়ে গেল! ব্রোঞ্জের চুড়িগুলো এত ঢল ঢল করে হাতে যে মনে হয় হঠাৎ বুঝি খসে পড়ে যাবে। হাতে টাতে শিরা উপশিরা জেগে আছে। ভেজাল তেলের জন্যই কিনা কে জানে, মাথার চুলও উঠে শেষ হয়ে এসেছে। মুখের ডৌল দেখে অমিতের চেয়েও বেশি বয়সি মনে হয়।

কত লোকের কত থাকে, কিন্তু অমিতের ওই একটা বই মেয়েমানুষ নেই। রাগ সোহাগ সব ওই একজনের উপর। যুবতী বলো যুবতী, বুড়ি বলো বুড়ি, অমিতের ওই একটাই মেয়েমানুষ। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ অমিত মনে মনে ঠিক করে, আজ ফিরে গিয়েই ছেলেমেয়ে দুটোকে শোওয়ার ঘরে কপাট আটকে

রেখে রান্নাঘরে ইভাকে জাপটে ধরে হামলে আদর করবে। ভাবতে ভাবতে তার শরীর চনমন করে ওঠে। সারাদিনের নানা ক্লীবত্ব ভেদ করে পৌরুষ জেগে ওঠে।

চাঁদ নয়, হেমা মালিনী। অনেক ওপরে ধর্মতলার মোড়ে বড় বাড়িটার গায়ে লটকানো হোর্ডিং। হোর্ডিং জুড়ে যেন চাঁদ উঠেছে। জ্যোৎস্নার মতো ঝরে ঝরে পড়ছে হেমা মালিনীর হাসি। অবিরল। এবং স্থির সেই হাসি। কে. সি. দাসের দোকানের উলটো দিকে যেখানে ট্রাম লাইনের কাটাকুটি সেইখানে একটু মেটে জায়গায় কে যেন জল ছিটিয়ে ভিজিয়ে রেখেছে। সেই ভেজা মাটির উপর পড়ে আছে একটি যুবতী মেয়ে। ভিখিরি শ্রেণির। মাটির রঙেরই একখানা শাড়ি জড়ানো। কিন্তু সর্বাঙ্গ ঢাকা পড়েনি। বুকে পাছায় কিছু মাংস এখনো আছে। একটি স্তন কাৎ হয়ে ঝুলে মাটি স্পর্শ করেছে। আশেপাশে অমিত গুনে দেখল ঠিক চারটে বাচ্চা। সবচেয়ে ছোটটা বোধহয় বছর দুয়েকের। পুঁটো পুঁটো সেই সব বাচ্চারা উদোম ন্যাংটো। সবাই মরার মতো শুয়ে আছে। চোখ বোজা, কেউ নড়ছে না। শ্বাস ফেলার ওঠানামা লক্ষ করা যায় না। তাদের চারধারে মেলা দুই নয়া তিন নয়া ছড়িয়ে আছে! তারা কুড়িয়ে নেয়নি। কেউ কুড়িয়ে নেয়নি। দয়ালু মানুষেরাই পয়সা ফেলে গেছে। আবার এও হতে পারে ওই সব হাসি ঝরে পড়েছে হেমা মালিনীর হাসি থেকেই! কে জানে! অমিত চোখ তুলে দেখল, ভুল নয়, দশমী পুজোর দিন দুর্গামূর্তির হাস্যময় মুখে যেমন কান্নার চোখ ফুটে ওঠে তেমনিই হেমা মালিনীর চিত্রার্পিত মুখে দেবীসুলভ কারুণ্য।

দুর্ভিক্ষ? অমিত চমকে ওঠে। বড় হওয়ার পর সে আর দুর্ভিক্ষের কথা ভাবেনি। ধারণা ছিল, দুর্ভিক্ষ এখন আর হয় না। ভারতবর্ষে গম চাল না হলে আমেরিকায় হবে, থাইল্যান্ড, বার্মায়, অস্ট্রেলিয়ায় হবে। পৃথিবী থেকে মানুষ দুর্ভিক্ষ তাড়িয়ে দিয়েছে। নতুন করে আবার বুক খামচে ধরছে একটা ভুলে যাওয়া ভয়।

পর মুহূর্তেই ঝেড়ে ফেলে দিতে পারে সে। ওই তো মেট্রোর আলো জ্বলছে! দপদপিয়ে উঠছে নানা বিজ্ঞাপনের নিওন সাইন! কত দামি দামি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। চারিদিকে দামাল, উত্তেজিত, আনন্দিত কলকাতা! ভিখিরির তুলনায় ভদ্রলোক বহু গুণ বেশি।

জায়গাটা পেরিয়ে যায় অমিত দুটি নয়া ছুঁড়ে দিয়ে। কুড়িয়ে নেবে তো! না কি মরে গেছে ওরা? আত্মহত্যা করে নি তো? না, না, তা করেনি ঠিকই। ভিখিরিরা কতরকম অভিনয় করে তার কি শেষ আছে। এটাও একটা কায়দা!

একটু দোটানার মধ্যে থেকে ভারি মনে অমিত বাস স্টপে এসে দাঁড়ায়। বড্ড ভিড়। সে ঠিক এইসব ভিড়ে এখনো অভ্যস্ত নয়। দাঁড়িয়েই থাকে।

দুটো বাড়ন্ত যুবা কথা বলে বাসস্টপে। অমিত শোনে। একজন বলে—কলকাতায় এই যে লোকে বাসে উঠতে পারে না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে অফিস টাইমে, কিংবা ঝুলে ঝুলে যায়; ঠিক সময়ে কোথাও পৌঁছতে পারে না; এর জন্যই দেখিস একদিন বিপ্লব শুরু হয়ে যাবে। দুমদাম ভদ্রলোকের প্যান্ট গুটিয়ে কাছা মেরে ইট পাটকেল ছুঁড়তে লাগবে বেমক্কা, ভাঙচুর করে সব উলটেপালটে দেবে একদিন।

অন্যজন হাসে।

অমিত হাসে না। তার মনে একটা ভয়ে প্রলেপ পড়ে। চারিদিকে কি যেন একটা ধনুকের টান—টান ছিলার মতো ছিঁড়বার অপেক্ষায় আছে। যেন এক্ষুনি ছিঁড়বে এবং হুড়মুড় করে পৃথিবীটা ভেঙে পড়বে।

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ? নাকি পৃথিবী জোড়া খরা, দুর্ভিক্ষ? নাকি মহাপ্লাবন আবার? কিংবা ছুটে আসবে অন্য একটি গ্রহ পৃথিবীর দিকে যেরকম একটা গল্প সে পড়েছিল ইন্টারমিডিয়েটের ইংরিজি র‍্যাপিডে।

রাতে শোওয়ার পর নিজস্ব মেয়ে মানুষটাকে হাঁটকায় অমিত, হাঁটকায় কিন্তু যা ভুলতে চায় ভুলতে পারে না। কিছুই ভুলতে পারে না। ইভা তার বুক থেকে অমিতের হাত সরিয়ে দিয়ে বলে, সারাদিন কত খাটুনি যায় বোঝ না তো, ঘুমোতে দাও।

পাশ ফিরে শোয় ইভা।

একটামাত্র মেয়েমানুষ থাকার ওই একটি দোষ। সে দিলে দিল, না দিলে উপোস থাকো! অমিত এর বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া যায় ভেবে পেল না। লাথি মারবে? মেরে দেখেছে অমিত, লাভ হয় না। লাভ নেই। খুব রাগ হয় অমিতের, কিন্তু রাগ চেপে শুয়ে থাকে। কিন্তু তখন বুকে একটা চাপা—বাঁধা কষ্ট হতে পারে। পৃথিবীর মাটি শুকিয়ে গেছে খরায়। বুড়িয়ে গেছে ফলনের পর ফলনে, এবার কালো এক দুর্ভিক্ষ এসে যাবে।

সে স্বপ্নে দেখতে পায়, কাৎ হয়ে শুয়ে থাকা মরা মেয়েমানুষের স্তন ঝুলে সেই মরা মাটি ছুঁয়ে আছে। আতঙ্কে চিৎকার করতে থাকে সে। আকাশ থেকে পয়সা বৃষ্টি হচ্ছে। শুকনো পয়সা ঠন ঠন শব্দে ছড়িয়ে পড়ছে চারধারে। কেউ কুড়িয়ে নিচ্ছে না।

তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে জাগাল ইভা। বলল—ফিরে শোও। বোবায় ধরেছে।

অমিত ফিরে শুল। আর তখন হঠাৎ রোগা দু—খানা হাতে তাকে কাছে টানল ইভা। চুমু খেল। বলল—এসো।

চালওলার কপালে আজও ভ্রাম্যমাণ কোনো পুরুত চন্দনের ফোঁটা দিয়ে গেছে, কানে বিল্বপত্র। মুখে তুলে হাসল চালওলা।

অমিত ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করে—দর কী হে?

—কমেছে। পুরো তিন। একটু নীচে দু—টাকা আশি। বলে চালওলা পাল্লা হাতে নেয়—কত দেব?

কমেছে! কমেছে! ঠিক বিশ্বাস হয় না অমিতের।

—দশ কেজি। বলে অমিত।

চালওলা মায়া মমতা ভরে চেয়ে হাসে। বলে—এখন কমতির দিকে।

ভারী ফুর্তি লাগে অমিতের। না না, বাজে কথা ওসব। পৃথিবী জুড়ে দুর্ভিক্ষ আসছে এ কখনো হয়? চালের দাম কমে যাবে ঠিক।

অমিত হাঁটে। দু—হাতে বোঝা। কিন্তু ভারী লাগে না। আজ ইভা বেশি চাল দেখে খুশি হবে। খুব খুশি হবে।

চারদিকে কতকরকম চিহ্ন ছড়ানো দুর্ভিক্ষের আবার প্রাচুর্যেরও। মানুষ কখন কোনটা দেখে ভয় পায় কোনটা দেখে খুশি হয় তার তো কিছু ঠিক নেই।

# দৈত্যের বাগানে শিশু

যৌবনকালটা লালুর কেটেছে মামদোবজিতে। মামদোভূতের ধড় আছে, মুড়ো নেই। লালুরও ছিল না। ধড় ছিল। সেটা দশাসই। ছেলেবেলা থেকেই তার চেহারাখানা বিশাল, দু—খানা বিপুল কাঁধের মধ্যে তার মুণ্ডটা নিতান্তই ছোট দেখতে। মুখখানা ভালো নয়, কিন্তু সেই মুখে খুব সরলতা ছিল। ছিল নিষ্ঠুরতাও। মাথায় বুদ্ধি ছিল না। পনেরো ষোলো বছর বয়সেও ক্লাস এইট—এর ছাত্র সে, তখন মদ খেতে শিখেছিল, খেলত জুয়া। পাড়ার লোক সেই বয়সের লালুকে অল্পস্বল্প ভয় করতে শুরু করেছিল।

বাজারের মধ্যে স্টোভ সারাইয়ের দোকান করত হীরেন। রাতে দোকানের ঝাঁপ ফেলে ভিতরে জুয়ার বোর্ড বসাতো। লালু ছিল সেই বোর্ডের মেম্বার। পাড়ার এবং এলাকার বিখ্যাত গুন্ডা ছিল ননী। ননীর মাকে ছিল দেখার মতো। সে ট্যাক্সিওয়ালাদের লুঠ করত, পার্ক স্ট্রিট, এসপ্লানেডের বিখ্যাত বার থেকে মাতালদের ভুলিয়েভালিয়ে নিয়ে যেত ময়দানে—পরনের অন্তর্বাস ছাড়া সব কেড়ে নিত, পকেটমারদের কাছ থেকে নিত কমিশন। ননী জীবনে টাকাটা খুব চিনেছিল। মাঝেমধ্যে সে হীরেনের দোকানের জুয়ার বোর্ডটা লুঠ করত। খুব টাকার দরকার হলেই এটা করত সে। হীরেনরা বরাবর ননীগুন্ডাকে দেখলেই বোর্ড ছেড়ে দিত।

একদিন লালু থাকতে না পেরে বলল—রোজ রোজ বোর্ডটা ভেঙে দিয়ে যাও ননীদা, আমরা ঝুটঝামেলা কিছু করি না—কিন্তু কাজটা কি পুরুষের মতো হচ্ছে?

ননী একপলক তাকে দেখে বলল—শরীর বানিয়েছিস, না রে শালা? কিন্তু তুই খারাপ হয়ে যাবি লালু।

লালু ভয় খেয়ে বলল—কিন্তু আমরা তো তোমাকে কিছু বলি না কখনো। খেলাটা ভেঙে গেলে রোজ রোজ ভালো লাগে না, তাই—

ননী কেবল ঠান্ডা গলায় আবার বলল—তুই খারাপ হয়ে যাবি লালু। বিলা হয়ে যাবি—

টাকাপয়সা তুলে নিয়ে ননী হাত বাড়িয়ে লালুর কাঁধের জামাটা ধরে বলল—আয়।

ননী ডাকলে বেশির ভাগ লোকেই প্রতিরোধের কথা ভুলে সম্মোহিতের মতো তার সঙ্গে যায়। অতবড় শরীর নিয়ে লালুও তার অর্ধেক মাপের ননীর সঙ্গে উঠল।

বাজারের পিছন দিকে একটা চাতাল, মফসসলের মেয়ে আর শিশুরা এখানে আনাজ নিয়ে বসে। রাতে জায়গাটা ভারী নির্জন, শুনশান। অদূরে একটা পশ্চিমাদের ঝোপড়া আছে, তাতে ঝাঁকামুটে মজুরদের বাস। কিন্তু তারাও নির্জনতারই অংশবিশেষ। ননীকে দেখলে তারা পাথর হয়ে যায়।

খুব জ্যোৎস্না সেদিন। সেই জ্যোৎস্নায় চাতালে এনে লালুকে দাঁড় করিয়ে ননী ঠান্ডা গলায় বলল—যদি বিশ্বাস থাকে তো ভগবানের নাম নে শুয়োরের বাচ্চা।

এতক্ষণ পর্যন্ত সব ঠিকই ছিল। ননী বেড়াল—ইঁদুরের খেলাটা ঠিকই খেলতে পারত। ভয়ে নেংটি ইঁদুরের মতোই কাঁপছিল লালু। কিন্তু ননী ভুল করল গালটা দিয়ে।

লালুর বাপ নিরীহ মানুষ ছিলেন। কাজ করতেন সরকারি অফিসে। কেরানি ছোটখাটো মানুষ ছেলে—বউয়ের ওপর কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। লালু যখন বড় হতে হতে বিশাল চেহারা বিশিষ্ট হয়ে উঠল, ছেলের বাড় দেখে তিনি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাঁর ছেলে এরকম বিরাট আকৃতির হয় কী করে তা তিনি খুব ভাবতেন। মাঝেমধ্যে স্ত্রীকে তাঁর সন্দেহ হত। তিনি বলতেন, এ ছেলে আমার না নিশ্চয়ই।

লালুর মা ভারী অবাক হয়ে বলতেন—'তবে কার?'

আমতা আমতা করে লালুর বাবা বলতেন—হাসপাতালে অদল—বদল হয়নি তো। মনে হয় আমার বাচ্চা নিয়ে অন্য কেউ তার বিকট ছেলেটা পাচার করে গেছে।

এরকম অলক্ষুনে কথা শুনে লালুর মা ভীষণ চেঁচামেচি শুরু করতেন। পাড়ায় জানাজানি হত। লোকে হাসত। পাড়ার বউঝিরা তাদের দুপুরের কূটকচালির আসরে লালুর মায়ের চরিত্র বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ প্রকাশ করত—ওটুকু মানুষের ওরকম দানবের মতো ছেলে হয় কখনো?

সেসব কথা লালুরও কানে আসত। সে স্পষ্টই বুঝতে পারত যে তার বাপ তাকে একটুও পছন্দ করে না। উপরন্তু তার জন্ম এবং পিতৃপরিচয় বিষয়ে নানা লোকের নানা সন্দেহ। কিন্তু কেন যেন নিজের বাপ এবং মার প্রতি লালুর একটা পাগলাটে ভালোবাসা ছিল। সে তার রোগা খিটখিটে সন্দেহপ্রবণ বাপকে ভালোবাসত খুব। মাঝেমধ্যে বাব অফিস থেকে ফিরলে সে গিয়ে সন্ধেবেলা তার দানবীয় হাতে বাপের গা হাত পা টিপে দিতে দিতে বলত,....আমি তোমার ভালো ছেলে, না বাবা?

বাপ সতর্ক হয়ে ক্ষীণ গলায় বলত—আরও ভালো হ লালু। তোকে দেখে যে ভয় লাগে আমার।

—ভয় কি বাবা। আমি ঠিক আছি।

লালুর বাবা ক্ষীণ গলায় বলতেন—অত জোরে দাবাস না—লাগে। চরিত্রটা একটু ঠিক রাখিস। বেড়ে উঠলেই হল না, বাড়ের সঙ্গে আবার সংযম চাই।

লালু সে সব বুঝত না। তার শরীর সব সময়ে ছটফট করে—সে করবে কী? কাজেই সে বাবার কথায় আমল দিত না, কিন্তু লোকটাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত।

কাজেই জ্যোৎস্না রাতে বাজারে পিছনের নির্জন চাতালে যখন তাকে মারবার আগে 'শুয়োরের বাচ্চা' বলে গাল দিল ননী তখনই একটা মারাত্মক ভুল করল। ওই গালাগালে হঠাৎ নিজের নিরীহ ছোটখাটো বাবার চেহারাটা লালুর মনে পড়ল। পলকে গরম হয়ে গেল গা। সরে গেল সমস্ত জড়তা। সে ঘুরে তার হোঁৎকা হাতে বুলেটের মতো একখানা ঘুষি ঝাড়ল ননীর মুখে।

তৈরি থাকলে এসব ঘুষি ননী সহজেই এড়াতে পারে। কিন্তু লালু সম্পর্কে সতর্ক হওয়ার কোনো কারণ ছিল না। হোঁৎকাটা ভয়ে কাঁপছে দেখে নিশ্চিন্ত মনে ননী একতরফা মারের জন্য তৈরি হচ্ছিল। আচমকা ঘুষিটা লাগল সেই সময়ে। একটা কোলবালিশের মতো চাতালে পড়ে গেল ননী।

'বাপ তুলে গালাগাল! অ্যাঁ? বাপ তুলে?' বিড়বিড় করে বলতে বলতে লালু ননীর লাশ টেনে তুলল এক হাতে, অন্য হাত মোটরগাড়ির পিস্টনের মতো চালাতে লাগল। কোঁক কোঁক করে কয়েকটা শব্দ করল ননী, তারপর চুপ হয়ে গেল। কিন্তু লালুর রাগ তখনো শেষ হয়নি। সে দু—হাতে ননীর গলা টিপে ধরে বলছে তখনো—'আর বলবি? আর বলবি কখনো?

লালু তখনো জানত না, তার হাতের চাপে ননীর গলার মেরুদণ্ডের দুটো হাড় ভেঙে গেছে, জিভ বেরিয়ে ঝুলছে, এবং অনেকক্ষণ ননী শ্বাস নিচ্ছে না।

বাজারের বন্ধ দোকানঘরের আড়াল আবডাল থেকে দৃশ্যটা দেখে হীরেন আর তার দলবল এসে জ্যান্ত লালু আর ননীকে আলাদা করল। হীরেনরা খুব খুশি। কিন্তু লালুর বিপদ বুঝে বলল—তুই পালা। বাড়িতে গিয়ে শুয়ে থাক, কোথাও বেরোসনি। আবডাল দিয়ে বাড়িতে ঢুকবি, পাড়ার লোকে যেন দেখতে না পায়।

লালুর ভয় ঢুকল আবার। নেংটি ইঁদুরের মতো পালাল সে। ঘরে শুয়ে শুনল, পুলিশভ্যান আসছে যাচ্ছে। একটু রাতে বাজারের দিকটায় ননীর দলবল হুজ্জত শুরু করল। ঘরে শুয়ে কাঁপতে লাগল লালু।

কিন্তু ননী মরেই গেছে। কোনো ভয়ংকর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সে আর ফিরবে না। তার দলবলও খুব একটা ছিল না। দু—চারদিন হামলা হল, খোঁজাখুঁজিও হল, কিন্তু লালুর গায়ে হাত পড়ল না। বাজারের হীরেন আর তার দলবল লালুকে আড়াল দিল কিছুটা। জুয়ার বোর্ডটা নিরাপদ করেছে লালু, কাজেই তার জন্য কিছু করতেই হয়।

লালু আবার রাস্তায় বেরোয়, হীরেনের আড্ডায় গিয়ে বসে, চোলাই খায়। তখন তার বিশ বছর বয়স।

পটাকে দেখে এখন আর বুঝবার উপায়ও নেই যে সে এক সময়ে কে বা কী ছিল। কিন্তু লোকে তখনো বলে—পটা মাস্তানের মতো অমন ওস্তাদ আর হয় না। কিন্তু কোন এক লীলারানীর কাছে ঘা খেয়ে পটা সব

ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে যায় কিছুদিন। লাইনের ওপারে ছোট্ট কালী মন্দির বানিয়ে রক্তবর্ণ পোশাক পরে পটা কিছুদিন খুব সাধনভজন করে। সামাজিক দুষ্কর্ম সবই ছেড়ে দেয়। পটার দাপটে যার ম্লান হয়েছিল এতদিন —এই ফাঁকে তারা উন্নতি করে ফেলল। পটা কালী সাধনা করতে করতে আড়চোখে দেখল সবই। কালীর মুখের ওপর লীলারানীর মুখটা মাঝে মাঝে ফুটে ওঠে। পটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চুপ করে থাকে। মনটা খুব ছটফট করলে মাঠ থেকে যার তার পাঁঠা ধরে এনে বলি দেয়। এইরকমভাবেই জীবনটা কাটিয়ে দিচ্ছিল পটা। এখন বয়স হয়ে গেছে। কালীমন্দিরটা নিয়েই পড়ে আছে সে। তবু একটা চোখ তার সব সময়েই খোলা, পাড়ার দিকে নজর রাখে। কোন মাস্তান উঠছে, কেই বা পড়তির দিকে। এটা তার অভ্যাস, ছাড়তে পারে না।

ননী মনের গেলে সে একদিন লাইন পেরিয়ে পাড়ায় ঢুকল।

লালুর আত্মবিশ্বাস এখন অনেক বেড়ে গেছে। তার শরীরটা হোঁৎকা হলেও যে কাজের তা সে বুঝতে পারে আজকাল। মারপিট হুজ্জোত লাগলে সে সবার আগে যায়! লোকে তাকে রাস্তা ছেড়ে দেয়।

মোড়ের মাথায় পটা ধরল লালুকে।

—শোন।

লালু একটা চোখ কুঁচকে পটাকে দেখে। খুব একটা আমল দিতে চায় না। কিন্তু পটার রক্তবর্ণ পোশাক, উড়োউড়ো চুলদাড়ি, রোগা শুকনো চেহারার মধ্যে এখনো একটা কিছু আছে যাকে ঠিক উপেক্ষা করা চলে না। তাই লালু পটাকে আমল দেবে না করেও কাছে গিয়ে বলল—কিছু বলছ পটাদা?

—বলছি। গায়ে অত মাংস কেন তোর? ভারী শরীর নিয়ে কিছু করা যায় না—বুঝলি?

ব্যঙ্গের হাসি হাসে লালু, বলে—করা যায় না কী করে বুঝছো?

পটা আধখোলা চোখে একটু চেয়ে থেকে বলে—ননীকে সাফ করেছিস বলে বলছিস। ননী তৈরি থাকলে তোর মত চারজনকে জমি নেওয়াতো। আলটপকা মেরেছিস। তা সব সময়ে কি সেরকম হবে?

বলে রোগা হাতখানা বাড়িয়ে পটা বলল—এই হাতখানা ধরে দেখ, বুঝতে পারবি।

লালু আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তার প্রকাণ্ড হাতখানা বাড়াল। পটা তার রোগ আঙুল দিয়ে লালুর পাঞ্জাটা ধরে আলতো চাপে মোচড় দিল একটু। ব্যথায় থরথর করে কেঁপে উঠল লালু। হাতখানা বুঝি কবজি থেকে ভেঙেই যায়।

—আহা, ছাড়ো ছাড়ো—

পটা মৃদু হাসে। ছেড়ে দিয়ে বলে—তাই বলছিলাম কি গায়ের মাংস আর একটু ঝরিয়ে দে। কারণ নিজের মাংস নিজের শত্রু। লাইনের ওপারে মায়ের মন্দির আছে আমার জানিস তো! সেখানে বিকেল বিকেল চলে আসবি। তোকে তৈরি করে দেব।

প্রচণ্ড বিস্ময়ে রোগা শুকনো চেহারার পটাকে কয়েক পলক দেখে লালু। সে দেবী দত্তর আখড়ায় বিস্তর মাটি মেখেছে। যন্ত্রপাতি নেড়ে তৈরি রেখেছে শরীর, তবু এই রোগা দুর্বল পটার হাতের ক্ষমতার কাছে সে ছেলেমানুষ। ওস্তাদ একেই বলে!

পটা হাসল, আবার লালুর মুখ দেখে বলল—ননী চিরকালের গোঁয়ার, তার ওপর পয়সার লালচ। ওসব লালচ থাকলে মানুষ অন্ধ। নইলে তোর মতো আনাড়ির হাতে যায়?

লালু বুঝল যে সে এখনো আনাড়ি। মাস্তানির বিষয়টি এখনো বিস্তর শিখবার আছে। তাই সে বিকেল বিকেল লাইন পেরিয়ে পটার মায়ের মন্দিরে যেতে লাগল।

প্রথম প্রথম কয়েকদিন পটা কেবল নিজের ডানহাতটা মুঠো করে বাড়িয়ে দিয়ে বলত—মুঠো খোল।

পটার হাতে সেই মুঠো খুলতে সারা বিকেল প্রাণপণ চেষ্টা করে ঘেমে যেত লালু। পারত না। বলত—কী দিয়ে তৈরি গো তোমার হাত পটাদা?

পটা হাসে, বলে—আজ যা, কাল আবার আসিস।

লালু সেলাম করে ফিরত। কিন্তু যাতায়াত বজায় রাখল সে। পটা শেখাত। বলত—এসব কাউকে শেখাইনি বড় একটা। এখন বুড়ো হয়ে যাচ্ছি, আমার সঙ্গেই সব চলে যাবে, তাই ভাবছি, তোকে দিয়ে যাই। কিন্তু দেখিস বাপু, লালচ বেশি করবি না, কখনো কোনো মেয়েমানুষের কেস নিবি না, গুরুকে মনে রাখবি।

লালু মাথা নাড়ে।

তারপর একদিন লালু মায়ের বাড়িতে পুজো দিয়ে বেরিয়ে এল। ভারী খুশি সে।

বিশাল শরীর এবং যথেষ্ট হিংস্রতা নিয়ে লালু ঘুরে বেড়াতে লাগল। শরীরের মাংস অনেকটা ঝরে গিয়ে, শরীরটা হালকা লাগে এখন। চলন্ত মালগাড়ির গা বাইতে পারে, টপকাতে পারে উঁচু দেওয়াল। সবচেয়ে বড় কথা আর টপ করে ভয় পায় না আগের মতো। পটা তাকে শিখেয়েছে, যখন হাঁটবি চলবি তখন চোখের মণি নড়বে ঠিক যেন দেওয়াল ঘড়ির পেণ্ডুলাম। হাঁ করে এক দিকে চেয়ে হাঁটবি না। চারদিক নজরে রাখবি। তাই রাখে লালু। দু—খানা চোখ টকটক করে ডাইনে বাঁয়ে নড়ে তার, সবদিক নজরে রাখে। এখন তার জীবন বিপজ্জনক।

ওয়াগন—ভাঙা হিসেবে লালু বেশ নাম করল। হাইওয়েতে মাঝে মাঝে লরি বা মোটরগাড়িও থামায় সে। পাড়ার বেশিরভাগ দোকানদার তাকে খাজনা দেয়। রোজগারপাতি মন্দ না।

কিন্তু বিপদও আছে। ওয়াগন—ভাঙাদের পুরোনো দলটার সঙ্গে বিস্তর বোমাবাজি চলল কিছুদিন। পুরোনো দলটা ভেঙে যাচ্ছিল, লালুর দলটা তৈরি হচ্ছিল। বোঝা যাচ্ছিল, দিনকালে লালুর দলটাই দাঁড়িয়ে যাবে। কিন্তু বিনা হুজ্জতে নয়।

ঠিক দুপুরবেলা লালু পেটোপাড়ার ভিতর দিয়ে আসছিল। সেই সময়ে হঠাৎ সে দেখল কে যেন সুইচ টিপে সূর্যটা নিবিয়ে দিল। এমনকী সুইচ টেপার ফুটুস একটু আওয়াজ শুনতে পেল সে। অন্ধকারে মুখ থুবড়ে পড়ল রাস্তায়। তার গলায় সোনার চেনে বাঁধা বাঘনখ বেয়ে রক্ত পড়ছিল টপটপ।

হাসপাতালে তাকে দেখতে এল পটা। মাথায় বিরাট ব্যান্ডেজ নিয়ে পড়ে আছে লালু। গুলিটা বের করেছে ডাক্তারেরা, কিন্তু তবু মাঝে মাঝেই মাথাটা অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। সেই আলো—আঁধারির ভিতরে সে পটাকে দেখে ক্ষীণ গলায় প্রশ্ন করল—পটাদা আমি মাইরি শেষ হয়ে গেলুম।

পটা গম্ভীর মুখে বলে—তোর একটা জিনিস নেই লালু। ওস্তাদ হতে গেলে সে জিনিসটা চাই—ই।

—কী সেটা।

—আর একটা ইন্দ্রি? আমি আগেই জানতাম, তোর সেটা নেই।

—সেটা কী রকম জিনিস?

পটা একটু ভেঙে উত্তর দিল—কী রকম যেন ঠিক বোঝানো যায় না। চোখ কান ছাড়া আর একটা জিনিস। আমার মাথায় ঠিক রুমালের মতো একটা জিনিস আছে। সেটা সব সময়ে এদিক—ওদিক ঝাপটা মারছে। আমার চোখের আড়ালে কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে তা ঝাপটা মেরে জানিয়ে দিচ্ছে আমাকে। কোন রাস্তা ঠান্ডা কোন রাস্তা গরম তা রাস্তা দেখেই আমি ধরতে পারি। মানুষের চোখের দিকে চেয়েই বুঝতে পারি যে কোন লাইনের লোক। তোর মুশকিল হচ্ছে তুই তা পারিস না। তোর শরীর আছে, কায়দাও জানিস, কিন্তু ও জিনিস তোর নেই।

ভারী হতাশ হল লালু। বলল, তা এখন আমি করব কী?

পটা বলল—তোর জখমটা ভালো নয়। মাথার চোট সারাজীবন জ্বালায়। নিজের হাতে তৈরি করেছি তোকে, একটা ভালোমন্দ কিছু হলে বুকে লাগবে বড়। তার চেয়ে তুই লাইন ছেড়ে দে।

লালুর মাথা আবার অন্ধকার হয়ে গেল এই কথা শুনে।

বুড়োবয়সে লালুর বাবা মায়ের একটি মেয়ে হয়েছিল। তার তখন পাঁচ বছর বয়স। লালু তার এই রোগ টিঙটিঙে বোনটিকে ভালো করে লক্ষ্যও করেনি কোনোদিন। হাসপাতালে থেকে ফিরে যখন কিছুদিন ঘরেই শুয়ে বসে থাকতে হল তাকে, ছোট বোনটি তার কাছে ঘুরঘুর করত। তার বিছানার কাছে বসে গুটি খেলত,

পুতুলের সংসার বসত খুলে। কখনো বা রান্নাবাটি খেলায় লালুকে নেমন্তর করত। এইভাবেই মায়া জন্মায়। লালু ঘরবন্দি বলেই আরও বেশি মায়াটা জন্মায়। তখনো মাঝে মাঝে মাথা অন্ধকার হয়ে যায়, একটা দিক ফাঁকা ফাঁকা লাগে সব সময়ে। শরীরটা কাঁপে, নিজের জন্য ভারী একটা দুঃখ হয় তার। তখন সব ভুলবার জন্য বোনের সঙ্গে রাজ্যের খেলনা নিয়ে বসে লালু। আস্তে আসেত নিজের কথা ভুলে যায়। নিজেকে শিশুর মতোই লাগে তার।

তার দলটা দাঁড়িয়েই গেল। ওয়াগন—ভাঙার এমন ওস্তাদ দল বড় একটা আসেনি। দলের ছেলেরা এসে লালুর হিস্যার অংশ বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যায়, কিন্তু তারাও বুঝতে পারে, লালু শেষ হয়ে গেছে। বোনের সঙ্গে সারা দিন খেলে খেলে তার মুখ চোখেও একটা শিশুর মতো হাবভাব। তারা বুঝতে পারে, লালু আর লাইনে নামতে পারবে না।

সেটা লালুও বোঝে। বুঝে একদিন সে তার হিস্যার টাকা ফিরিয়ে দিয়ে বলল—আমি বসে গেছি রে। ও টাকা ছুঁতে আমার লজ্জা করে। তোর ভাগজোখ করে নে।

তারা খুব একটা আপত্তি করল না। টাকা ফেরত নিল।

লালু একটা শ্বাস ফেলে বোনের সঙ্গে খেলায় ডুবে গেল আবার। সে এখন এক পায়ে লাফিয়ে এক্কা দোক্কা খেলতে পারে। হাত চিৎ উপুড় করে গুটি খেলতে পারে, পুতুলকে পরাতে পারে কাপড়।

কিন্তু সেইসঙ্গে রোজগারও বন্ধ। সরকারি অফিসের টাকায় বাবা সংসার চালিয়ে নিচ্ছিল কোনোরকম। কিন্তু রিটায়ারমেন্টের সময় এসে গেল। লালুকে এখন আর তেমন ভয় করে না কেউ, বাবাও না। একদিন বাবা ডেকে বলল—লালু, তোমার মতিগতি ভালো হয়েছে, খুব সুখের ব্যাপার। কিন্তু রোজগারপাতির বুদ্ধি কই! শুধু ভালোমানুষিতে চলবে না।

লালু বুঝল। কিন্তু সে লেখাপড়া শেখেনি। পটা ওস্তাদের কাছে যা সে শিখেছে তা আর কাজে লাগাবার মতো ক্ষমতা তার নেই। তবু সে বোনের সঙ্গে খেলা ছেড়ে একটু—আধটু বেরোতে লাগল।

প্রথমেই গেল স্টেশনের গায়ে তাদের চায়ের দোকানটায়। দলের ছেলেরা এখানেই বসে।

সন্ধেবেলা। কয়েকজন বসে আছে। তাদের মধ্যে দুজন—নীলু আর শানু লালুর চেনা—বাকি কজন নতুন। নীলু আর শানু খাতির করে তাকে বসাল। নতুনরা তাকে গ্রাহ্য করল না। এক দুইবার দেখে চোখ ফিরিয়ে নিল।

লালু নীলুকে বলল—আমার কিছু টাকার দরকার নীলু, দোকান করব।

নীলু মন দিয়ে শুনে ভেভে বলল—ধার না হিস্যা?

লালু মাথা নাড়ে—ওসব না। কাজে নামব।

নীলু আবার ভাবে। অনেক ভেবে বলে—দল ঠিক আগের মতো নেই লালুদা। পুলিশেরও হুজ্জত খুব। নতুন ছেলেরা এসেছে—তারা কাউকে বিশ্বাস করে না। তুমি নামতে চাও ভালো, আমি সবাইর সঙ্গে একটু কথা বলে নিই। কাল একবার এসো।

লালু গেল পরদিনও। নতুন ছেলেরা তার হোঁৎকা শরীরটা চেয়ে দেখল মাত্র। নীলু গম্ভীরমুখে আড়ালে ডেকে বলল—তোমাকে নেব। কথা হয়েছে। কিন্তু এখন দল বেড়ে গেছে অনেক, আমাদের হিস্যা বেশি থাকে না। পুলিশকে কত দিতে হয় তা তো তুমি জানই। আর একটা কথা, এখান থেকে ক্যাপিট্যাল বাগিয়ে সরে পড়বে তা হবে না। এলে থাকতে হবে। ভেবেচিন্তে এসো।

কথাটা লালু ভাবল অনেক। ওয়াগন—ভাঙা কিছু শক্ত কাজ না। গাড়ি জায়গা মতো দাঁড়ায়, পুলিশও বন্দোবস্ত মতো তফাতে তাকে। কেবল বন্ধ ওয়াগন খুলে মাল বের করা। কিন্তু ওই যে দল ওই দলটাই সাঙ্ঘাতিক। বহুকাল সে আর দল করেনি, এখন বুঝে চলা কি সম্ভব! একটু এদিক—ওদিক হলে লাশ পড়ে যাবে। পটাদা কী একটা ইন্দ্রিয়র কথা বলত, যেটা তার নেই। সেটা নেই ঠিকই। তাই একটু—আধটু ভয় করে লালুর! গলায় সোনার চেনে বাঁধা বাঘনখটা মুখে পুরে, সে ভ্রূ কুঁচকে ভাবে। ভাবলেও কিছু সমাধান

পায় না। মাথার ভিতরটায় একধারে এখনো জমাট অন্ধকার। সব সমস্যা গিয়ে সেইখানে সেঁদোয়। ভারী অস্থির লাগে তার।

তবু নামে লালু। দুদিন তাকে কোনো কাজ দেওয়া হল না। দলের সঙ্গে থাকল কেবল। তিন—চারদিন পর গাড়ি থামতে দরজা খুলে অভ্যাস মতো উঠে গেল লালু। পা দিল গমের বস্তায়। হাতে হাতলওলা সরু হুক। তার পিছনে উঠল তিনচারজন নতুন ছেলে।

ওয়াগনের ভিতর অন্ধকার। যার হাতে টর্চ সে কেন যেন টর্চটা জ্বালল না। অন্ধকারেই বিপুল একটা বস্তা টেনে তুলল লালু। পাকসাট মেরে দরজার কাছে ফেলল। নীচে থেকে কেউ তা ধরল না। কিছু বুঝবার আগেই ওয়াগনের ভিতরের অন্ধকার থেকে হুক—এর সরু অংশটা কে যেন সজোরে বসাল তার কাঁধে। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল সে, হাতের বস্তাটা পড়ল প্রথমে, তার ওপর পড়ল সে, পিছন থেকে একটা লাথি খেয়ে টাল সামলাতে না পেরে। ভারী শরীর তার, উঁচু ওয়াগন থেকে পড়ে বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে সে কাঁধ চেপে বোকার মতো চেয়ে রইল কেবল। টলটলে রক্তে ভেসে যাচ্ছিল তার হাত। ওয়াগনের ভিতর থেকে একটা তীব্র টর্চের আলো এসে পড়ল তার মুখে। একটা গলার স্বর বলল—আমরা নতুন লোক পছন্দ করি না লালু। কেটে পড়ো।

লালু সেই টর্চের আলোর দিকে চেয়ে বলল—কিন্তু নীলু যে বলেছিল।

—নীলুও যাবে। তুমি পুরোনো লোক, দলটা তোমার হাতেই তৈরি—আমরা জানি। তাই তোমাকে জান—এ মারলাম না। পুরোনো লোক আমরা পছন্দ করি না। কেটে পড়ো।

লালু তার অন্ধকার মাথা দিয়েও ব্যাপারটা বুঝল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল—কিন্তু আমার হিস্যা?

—যে গমের বস্তাটা নামিয়েছো ওটা নিয়ে যাও।

বস্তাটা অবশ্য নিল না লালু। কিন্তু ফিরে গেল। আস্তে আস্তে ইয়ার্ড পার হল, টপকাল রেলের লোহার বেড়া। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ফিরে এল বাড়িতে।

পরদিন আবার শিশুর মতো মুখ নিয়ে ঘুম থেকে উঠল সে। খেলতে শুরু করল ছোট বোনের সঙ্গে।

দিনসাতেক বাদে খবর পেল, রেলে কাটা পড়ে নীলু মারা গেছে। শুনে একটু শিউরে উঠল সে। ছোট বোন মিলু পাড়ার রাজ্যের ছেলেমেয়ে জুটিয়ে আনে, তাদের নিয়ে সারাদিন খেলে লালু। নীলু মারা যাওয়ার খবর পেয়ে সে সেইদিন তাদের নিয়ে বাড়ির উঠোনের করবী গাছের নীচে বনভোজন করল। বাচ্চাদের হুল্লোড়ে ডুবে রইল সারাদিন।

কিন্তু এভাবে চলে না।

দত্তদের গাড়িটা গতবছর বেচে দিয়েছে। গ্যারাজটা খালি পড়ে আছে। লালুর খুব ইচ্ছে ওখানে একটা দোকান দেয়। মনোহারী দোকান। সামান্য কিছু থোক টাকা হলে চলে যায়।

সে বাবার কাছে টাকাটা চাইল প্রথমে।

বাবা অবাক হয়ে বললেন—আমার প্রভিডেন্ড ফান্ডের টাকা ভাঙব? তোমার কি মাথা খারাপ! বুড়ো বয়সে আমাদের খাওয়াবে কে? তার ওপর তোমার বোনের বিয়ের জন্যও কিছু রাখতে হবে। কেরানির প্রভিডেন্ড ফান্ড তো বাপু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নয়। সামান্য দশ পনেরো হাজার টাকা—

লালু বুঝল। বাবাকে সে এখনো ভালোবাসে। যাদের সে ভালোবাসে তাদের বিপন্ন মুখ দেখতে তার ভালো লাগে না।

একদিন সন্ধে পেরিয়ে শানু এসে হাজির। চুপিচুপি ডেকে নিয়ে বলল—লালুদা, কী করি বলো তো?

—কেন, কী হয়েছে?

—শোনোনি নীলু সাফ হয়েছে?

—শুনেছি।

—নতুন ছেলেরা আমাদের আর চাইছে না। নীলুকে রড মেরে লাইনে ফেলে রেখে সরেছে। আমি পালিয়ে আছি।

লালু একটু ভাবল। বলল—শানু, আয় তোতে আমাতে একটা মনোহারী দোকান দিই।

শানু হাসল—তিন পয়সায় মাল কিনে পাঁচ পয়সায় বেচে দু—পয়সা লাভ? দূর, ওসব কি আমাদের পোষায়! অন্য কিছু বল।

লালু কী বলবে ভেবে পেল না। কিন্তু সে দেখতে পাচ্ছিল, শানুর মাথার চুলে পাক ধরেছে, জুলপি বেশ সাদা। যখন দাঁড়ায় তখন একটু কুঁজো দেখায় ওকে। শানুর বয়স বেশি, লালুর চেয়ে অনেক বড়, লালু ওস্তাদ ছিল বলে তাকে দাদা বলে ডাকে।

লালু মাথা নেড়ে বলল—লাইন আমার নয়। কিছু টাকা পেলে আমি দোকান দেব।

শানু বলে—টাকা পাচ্ছো কোথায়?

এই প্রশ্নটার উত্তর সহজে দিতে পারে না লালু। ভাবে।

শানু বলে—তুমি এখনো ওস্তাদ আছো। চলো, কিছু ক্যাপিট্যাল জোগাড় করি। পেলে আমিও ব্যবসাতে নামবো, অর্ডার সাপ্লাইয়ের।

বলতে বলতে শানু তার কোমর থেকে একটা রিভলভার বার করে দেখিয়ে একটু চোখ টিপল।

রিভলভার বিস্তর দেখেছে লালু, নেড়েছেও অনেক। তবু এখন দেখে তার বুক কেঁপে উঠল। বলল—রেখে দে। মিলুটা দেখলে ভয় পাবে।

চোখের পলকে যন্ত্রটা লুকিয়ে শানু বলল—একটা কি দুটো কেস করব তার বেশি না। বিশ্বাস কর, ক্যাপিট্যাল হলেই কেটে পড়ব।

একটা শ্বাস ফেলে লালু বলল—তাই চল তবে।

নাগরমল ওয়াগন ভাঙিয়েদের পুরোনো খদ্দের। তার গদিতে রাত—বিরেতে মাল পৌঁছায়। সকাল হতে না হতে বড়—বাজারে তার পাইকারি আড়তে চলে আসে মাল। নগদ কারবার। স্টেশনের কাছাকাছি তাই তার একটা গদি আছে। সারাদিন ফাঁকা গদিতে একটা বাচ্চা ছেলে বসে মাছি তাড়ায়। ব্যবসা শুরু হয় রাতে। অনেক রাত পর্যন্ত গদিতে আলো জ্বলে, ভিতরে নড়াচড়া করে লোকজন। বাইরে অন্ধকারে বাতি নিবিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দু—তিনটে লরি। ওয়াগন ভাঙিয়েদের দলে আছে বলে নাগরমলের তেমন ভয়ডর নেই। বাঁধা রেট—এর ব্যবসা, টাকাপয়সা নিয়েও বড় একটা গোলমাল হয় না। আটটা সাড়ে আটটা নাগাদ গদিতে ক্যাশ পৌঁছে যায়। ক্যাশের জন্য দারোয়ানও থাকে না। এগারোটা বারোটার মধ্যে টাকা হাত বদল হয়ে যায়।

লালু আর শানু এক রাত্রে হানা দিল গদিতে। শানুর হাতে রিভলভার, লালুর হাতে রড। দুজনেই মুখে কালি মেখেছে, রুমালে বেঁধেছে মুখ। এতকাল পরে এই সব হুজ্জত করতে লালুর খুব ভয় করছিল বলে একটা দিশি মদের পাঁইট ভেঙে খেয়েছে দুজন।

নাগরমল একদম তৈরি ছিল না। লরীর ড্রাইভাররা এ সময়টা কাছে পিঠে থাকে না, লরি ভিড়িয়ে মাল টানতে কাল ধারে যায়। গদিতে নাগরমল নিজে আর দুজন নিরীহ কর্মচারী। এসময়ে ঝাঁপ ঠেলে দুজন ঢুকল। নাগরমল দৃশ্য দেখে হাঁ করে রইল।

রিভলভারটা নেড়ে শানু ক্যাশবাক্সটা দেখাল শুধু মুখে কিছু বলল না। নাগরমল হাঁ করে বাতাস গিলে ফেলল। তারপর লালুর বুকের সোনার চেনে বাঁদা বাঘনখটা দেখল সে। লালুর বিশাল চেহারাটার সঙ্গে বাঘনখটা মিলিয়ে দেখতেই কয়েক বছর আগেকার লালুকে মনে পড়ে গেল তার। বলল—আরে রাম রাম লালুবাবু, কী খবর? এ সব কী হচ্ছে? যাত্রাপার্টি নাকি।

লালুর বুকটা বড় চমকে ওঠে। চিনে ফেলেছে নাগরমল। এখন আর উপায় কী? হয় এখন তিনটে লাশ ফেলে যেতে হয় নইলে নাগরমলের সঙ্গে একটা বন্দোবস্তে আসা যায়।

এক সময়ে নাগরমলকে লক্ষ টাকার মাল দিয়েছে লালু। সেটা নাগরমল ভোলেনি।

বলল—কিছু ক্যাশকড়ি দরকার থাকে বলুন না? আপনার সঙ্গে তো অনেক বিজনেস করেছি। এ সব ছিনতাই কি ভালো লালুবাবু? আপনার নামে পাড়া কাঁপত এক সময়ে—

তিনটে লাশ ফেলার জন্য ট্রিগার হাত রেখেছিল শানু। কিন্তু বয়সকালে নানা চিন্তাভাবনা এসে যায়। বেপরোয়া হওয়া যায় না কিছুতেই। তারা দুজনেই ঘরপোড়া গরু।

লালু হতাশ হয়ে বলল—কিছু ছাড়ো নাগরমল, ব্যবসা করব।

—কত?

—দু—হাজর করে দুজন।

নাগরমল ভাবতে লাগল।

—ভেবো না। সময় নেই। শানু বলল।

নাগরমল শ্বাস ফেলে বলল—কাল দেব। বাড়িতে বসে পেয়ে যাবেন। আজকের ক্যাশ গোনা আছে।

—না দিলে কিন্তু—

নাগরমল হাসে—আপনার সঙ্গে বেইমানি? আমার প্রামের ভয় নেই?

পরদিন নাগরমল নিজেই টাকাটা পৌঁছে দিল। বলল—কাল আমার ড্রাইভার, ক্লীনার আর কর্মচারীরা দেখেছে আপনাদের। তারাই বলেছে ওয়াগন ব্রেকারদের। খুব হইচই হচ্ছে ওদের মধ্যে। একটু দেখবেন দাদা—ওরা ভালো না। নীলুবাবু মরল, শানুবাবু পালাল; আমাকেও ব্যবসা গুটোতে হবে।

লালু বুঝল। নাগরমল ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হচ্ছে। আর যেন লালু হানা না দেয়।

লালু টাকা নিয়ে বলল—এটা ধার হিসেবে নিলাম নাগরমল। শোধ দেব ব্যবসা করে।

নাগরমল মুখের একটা ভঙ্গি করে বলল—যা বোঝেন। আপনার সঙ্গে তো অনেক বিজনেস করেছি! আপনি ভাল লোক।

দু—হাজার নিয়ে শানু কাটল। বাকি দুই হাজারে দত্তদের গ্যারাজটা ভাড়া নিয়ে মনোহারী দোকান খুলল লালু। দোকানে তার লজেন্স, বিস্কুট, চানাচুর, বেলুন খেলনাই বেশি। পাড়ার বাচ্চারাই তার প্রধান খদ্দের।

লাভালাভের হিসেব রাখতে পারেনা লালু। বেচে যায়। পাড়ার লোকে যাতায়াতের পথে লালুর দোকান দেখে থমকে দাঁড়ায়—দোকান দিলে নাকি হে?

এক গাল হাসে লালু—দিলাম। আমাকে একটু দেখবেন, কাকা।

বেবী ফুড কোথাও পাই না, এনে দেবে নাকি। ব্ল্যাকের দামই না হয় দেব।

—দেখব।

লালু এইরকমভাবে ব্যবসা শুরু করল। মাল বেশি রাখে না, কিন্তু দুষ্প্রাপ্য জিনিস ঠিক এনে দেয়। ব্ল্যাকের দাম নেয়। খুব আস্তে আস্তে সে টাকাপয়সার হিসাব বুঝতে শুরু করল। এখন বাচ্চারা দশ পয়সার চানাচুর চাইলে ঠোঙা ভরতি করে দেয় না। ছোট মাপের ঠোঙা বের করে। ফাউ দেয় না। পয়সা গোনে। মাসের শেষে স্টক মেলায়। পাড়ার মধ্যে পান সিগারেটের একটা মাত্র দোকান, তার মালিক মদনা, কিন্তু মদনার ব্যবহার ভালো না, একটা মাত্র দোকান বলে দোকানটা চলে ভালো। দেখেশুনে লালু সিগারেটের একটা কাউন্টার খুলল, মুদির দোকানের সওদা রাখল কিছু কিছু, অনেক কষ্টে বের করল বেবি ফুডের লাইসেন্স। ফলে দত্তদের গ্যারাজ ঘরে তার দোকানটা হুহু করে চলতে থাকে। মাসে শ তিনেক টাকা আয়।

মিলু এখন ইস্কুলে যায়। বাবা রিটায়ার করে বসে আছেন। বাইরের দিকের বারান্দায় পাতা ইজিচেয়ারে বসে সারাদিন খবরের কাগজটা উলটেপালটে পড়েন। মায়ের চোখে ছানি আসছে। তবু মা সারাদিন ঘরের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। লালু মাঝে মাঝে বলে—মা, তোমাকে একজন রান্নার লোক দেখে দিই।

মা হাসে, বলে—রান্নার জন্যে পাকা লোক চাই। স্বঘর, ভিন্ন গোত্রের একটা মেয়ে। এনে দে দেখি।

লালু বড় লজ্জা পায়। গলার বাঘনখটা মুখে পুরে ভাবে।

পাড়ার গিন্নিবান্নিরা আগে লালুর দোকানে আসত না। তারা সভয়ে বলত—বাব্বাঃ, লালু গুন্ডার দোকান? ওখানে মেয়েমানুষ যায় কখনো? কিন্তু ধীরে ধীরে তাদের মত পালটায়। এখন পাড়ার বউ—ঝিরা আসে, আসে প্রৌঢ়ারা। লালু সবাইকে দিদি, মা, মাসি বলে ডেকে খুব খাতির করে।

সবচেয়ে বেশি ঝামেলা চাটুজ্জে খুড়িকে নিয়ে। লালুকে তার আফিং এনে দিতে হয়। আফিং নিতে এসে চাটুজ্জে খুড়ি পাড়া জানান দিয়ে চেঁচামেচি শুরু করে—বিয়ে করছিস না কেন? তোর বাপ দাদা বিয়ে করেছে, সংসারসুদ্ধু লোক করছে, তুই করবি না কেন? ত্রিশ বছর বয়স হল না তোর! এরপর কি পাকা চুলে টোপর পরবি? বিয়ে না করলে বুড়ো বয়সে পাগলামিতে ধরে, জানিস না?

—বিয়ে করব খুড়িমা, সময় পাচ্ছি কোথায়? একটু স্থিতু হয়ে নি।

—হ্যাঁ, ঢেউ সরে গেলে ডুব দিবি। বয়সকালটা মামদোবাজিতে কাটালি, এখন বুদ্ধিশুদ্ধি একটু হয়েছে—এইবারে কোথায় পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে বসবি তা নয়, কেবল উড়বার মতলব। বউ না থাকলে আবার মামদোদের খপ্পরে পড়বি কবে।

ভারী বিব্রত হয়ে সে তাড়াতাড়ি বলে—করব শীগগিরই করে ফেলব বিয়ে। আর কটা বছর—মিলুটার একটা বিয়ে দিয়ে নি—

—ও মা, ও তো গুয়ের গ্যাংলা মেয়ে—ওর বিয়ে হতে হতে তোর বয়স বসে থাকবে? পুলিপিঠের ন্যাজ বেরুবার আশায় বসে থাকো তবে—

কিন্তু সময় বাস্তবিক বসে থাকে না। মিলু স্কুল ডিঙিয়ে কলেজে ঢুকল, দেখতে না দেখতে ধাঁ করে বড় হয়ে গেল। চোখে চশমা, শাড়ি পরা মিলু দোকানের সামনে দিয়ে কলেজে যায়। বিক্রিবাটার ব্যস্ততার মধ্যেও চোখ তুলে লালু এক এক সময়ে দেখে মিলুকে। তার বুক ভরে যায়। ভাগ্য ভালো যে ভাইবোনের চেহারায় মিল নেই, কালো হোঁৎকা লালুর বোনটা ফর্সা আর ছিপছিপে হয়েছে। চেহারায় অমিল, কিন্তু বড় ভাব দুজনে। দাদার ওই বিশাল শরীরটা যে খাটাখাটনিতে রোগা হয়ে যাচ্ছে তা একমাত্র মিলুই লক্ষ করে। গম্ভীর মুখে শাসন করে দাদাকে।

লালু ভাবে—এইবার মিলুর একটা বিয়ে দিতে হবে।

## দুই

পাঁচ বছর পর।

এখন একা ঘরে লালুর বাস। শরীরটা তেমনি আছে তার। কেবল পেটে চর্বি জমেছে একটু, মাথার চুল কয়েকটা পেকেছে। ছত্রিশে পা দিল সে। চোখে চশমা। মিলুর বিয়ের পর পরই। প্রথমে বাবা গেল এক সকালে। সামনের বারান্দায় বসে ইজিচেয়ারে খবরের কাগজ মুখে ঘুমিয়ে পড়েছিল, আর উঠল না। দু—বছর পর মা। ফাঁকা ঘরে একা থাকে লালু। ভালো লাগে না। দিন কেটে যায়।

লালু এখন পাড়ার ভালো লোক। লোকে বাকিতে জিনিস পায়, প্রশংসা করে। দোকানটা বিলেত বাকি পড়ে ঝাঁঝরা হয়ে আসছে। লালুর তাতে কিছু যায় আসে না। সে একা। চলে যাবে।

বিকেলের ডাকে মিলুর একটা চিঠি পেল লালু। তাতে লেখা—একবার এসো। খুব জরুরি দরকার।

বুকটা কেঁপে উঠল। মিলু বিয়েটা ভালো করেনি, নিজের পছন্দমতো বর বেছেছিল। ছেলেটা চোখা, চালু। কিন্তু মিলুর সঙ্গে মানায় না। গোত্র কিংবা ঘর ঠিকই ছিল তবু ছেলেটা বড় বেশি চালু। বহু মেয়েকে বাঁদর নাচ নাচিয়েছে। বিলাসকে তাই পছন্দ হয় না লালুর। কিন্তু মিলুর বর বলে সমীহ করে চলে। সবসময়ে তার বুকের ভিতর খাঁ খাঁ করে—মিলুকে নিয়ে থাকবে তো বিলাস? অন্য দিকে ঝুঁকবে না তো?

দোকানের সামনে একটা টুল পেতে শানু বসে থাকে আজকাল। পঞ্চাশ প্রায় ছুঁল সে। তার অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসাটা জমেনি। জোড়াতাড়া দিয়ে চালিয়ে নিচ্ছে। বয়সের জন্য নয় চিন্তার ভারেই কুঁজো হয়ে গেছে একটু। বয়সের তুলনায় বেশ বুড়ো দেখায়। লালুর সঙ্গে বসে দুরন্ত যৌবনকালের নানা গল্প করে। মাঝে

মাঝে বলে—এ সব ঝিমোনো ব্যবসা কি আমাদের লাইন? চল লালুদা আর এক বার হুজ্জত বাধাই, লুটেপুটে আনি। শেষজীবনটা সুখে কাটিয়ে দিই চলো। আমাদের আমলে এমন সোনার দিন আর আসেনি।

লালু হাসে। চুপ করে থাকে।

চিঠি যেদিন পেল সেদিনও শানু বসে আছে বাইরের টুলে। চিঠিটা ভাঁজ করে বুকপকেটে রেখে লালু উঠল, শানুকে বলল—দোকানটা একটু দেখিস শানু, আমি ঘুরে আসছি।

—চললে কোথায়?

—মিলুটা চিঠি দিয়েছে, কী আবার গোলমাল ওদের।

শানু উদাস গলায় বলে—ওসব ছেড়ে দাও লালুদা, যে যার মতো চলুক। সংসারের কোনো জ্ঞানই তো তোমার নেই।

—তা ঠিক। কিন্তু শানু সারা পৃথিবীতে ওই আমার একটা আপনজন।

শানু ভাবে। ভেবে বলে—সেটা সত্যি। ঠিক আছে। যাও।

বাইরের ঘরে উদাস শুকনো মুখে মিলু বসে আছে। তার হাঁটুর কাছে দু—বছরের বাচ্চা মেয়ে জুলেখা। লালুকে দেখে হরিণীর মতো সচকিত তাকাল মিলু।

—কী হয়েছে মিলু।

মিলু ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে সতর্ক করে দিল, ইঙ্গিতে শোয়ার ঘর দেখিয়ে বলল—ও আছে।

হাত ধরে বারান্দায় নিয়ে এল লালুকে। পায়ে পায়ে ঘুরছে ছোট্ট জুলেখা। তাকে কোলে নিয়ে গায়ের শিশু গন্ধ বুক ভরে নেয় লালু। তার শৈশব ফিরে আসতে থাকে।

—কী হয়েছে?

—সেই একই ব্যাপার। আমাকে ওর পছন্দ নয়। পরশু রাতে মেরেছে।

—মেরেছে?

—হ্যাঁ। এই প্রথম। কিন্তু এখন মারটা চলবে। হাত এসে গেছে।

রাগে বোবা হয়ে গেল লালু, কষ্টে বলল—মিলু তোকে কেউ কখনো মারেনি।

মিলুর ঠোঁট কাঁপতে থাকে। চোখ ভরে জল আসে।

—খুব লেগেছিল?

মিলু মাথা নাড়ে। লেগেছিল।

—ও কী চায়?

—কী জানি। বলে মিলু কাঁদতে থাকে।

—ও, তোকে চায় না।

—না।

—তাবে আমার কাছে চল মিলু। বেশ থাকব ভাইবোনে।

—না। মাথা নাড়ে মিলু।

—তবে কী করবি?

—সে জন্যই তো তোমাকে ডেকেছি। কী করব বল?

লালু, একটা শ্বাস ছাড়ে। বলে—ওর সঙ্গে একটু কথা বলি।

জুলেখাকে নামিয়ে দিয়ে লালু ঘরে আসে।

বিলাস বিছানায় শুয়ে আছে। ভারী ক্লান্ত আর রোগা দেখাচ্ছে তাকে। বিমর্ষ মুখ।

—বিলাস।

—উঁ!

—কী হয়েছে?

বিলাস চোখ চায়। আস্তে করে বলে—ওকে জিজ্ঞাসা করুন।

—করেছি। তুমি ওকে মেরেছো। কেন?

বিলাস ঠোঁট উলটে বলে—ইচ্ছে।

—কেন মারবে? ওকে কেউ কখনো মারেনি।

—আমি মেরেছি। আমার ইচ্ছে। কার বাবার কী?

লালু ধমকায়। সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপে।

—তার মানে?

বিলাস উঠে বসে, একটা সিগারেট ধরায়। তারপর আস্তে আস্তে বলে, শোধ নেবেন? নিন না! কিন্তু বলে রাখছি, ও আবার মার খাবে।

—না খাবে না।

—খাবে। কোনো শুয়োরের বাচ্চা ঠেকাতে পারবে না—

পলকে সব ভুল হয় যায়। ছত্রিশ বছর বয়স, চোখের চশমা—সব ভুল হয়ে যায়। পনেরো ষোলো বছর আগেকার এক জ্যোৎস্নায় আলোকিত নির্জন চাতাল মনে পড়ে কেবল। আর শরীরের মধ্যে ঝড় ওঠে বহুকাল বাদে।

প্রকাণ্ড হাতখানা বাড়িয়ে বিলাসকে শূন্যে তুলে নেয় লালু। অন্য হাত আঘাতের জন্য উদ্যত।

মিলু ছুটে আসে, চিৎকার করে বলে—দাদা, মেরো না। মরে যাবে।

হকচকিয়ে যায় লালু। ঠিক তো! এইভাবে একদিন ননী গিয়েছিল তার হাতে। তারপরও পটা ওস্তাদের কাছে শেখা মার। কাজটা ঠিক হবে না। শিশুর মতো দু—হাতে ধরে বিলাসকে আবার মেঝের ওপর ছেড়ে দেয় লালু।

কিন্তু বিলাস ছাড়ে না। পয়সা জমানোর একটা মাটির ঘট রাখা আছে তাকে। বিলাস প্রথমে পাগলের মতো সেইটে ছুঁড়ে মারে।

ভারী ঘটটা মাথায় লেগে চৌচির হয়ে ভেঙে যায়। লালুর সমস্ত শরীর বেয়ে পয়সার ধারা নেমে ঘরময় ছড়াতে থাকে। ক্ষীণ একটা রক্তের ধারা সেই সঙ্গে। বিলাস ছুঁড়ে মারে জুলেখার খেলনা, কালীর দোয়াত, পেপারওয়েট। তাতে খুশি হয় না। দু—হাতে ঘুষি মারে লালুর মুখে, পেটে মারে লাথি। বিলাসের বাবার একটা ভারী বাঁধানো ফটোগ্রাফ ছিল দেওয়ালে। রাগে পাগল হয়ে সেইটে টেনে আনে সে। কানা দিয়ে উপর্যুপুরি মারতে থাকে মাথায় মুখে। কাচ ভেঙে ঢুকে যায় লালুর চামড়ায়।

লালু ধীরে ধীরে মেঝেতে বসে। তারপর দেওয়ালে হেলান দিয়ে চোখ বোজে। একটাও মার ঠেকাবার চেষ্টা করে না। জুলেখা চিৎকার করে কাঁদতে থাকে, মিলু চিৎকার করে দুজনের মাঝখানে এসে পড়ে, বিলাস তাকে হাতের ঝাপটায় সরিয়ে দিয়ে পাগলের মতো আবার আক্রমণ করে লালুকে।

তারপর এক সময়ে সে থামে। চারদিকে চেয়ে দেখে। তার চোখে আতঙ্ক দেখা যায়। সে লালুর রক্তাভ বীভৎস নিস্পন্দ দেহখানা দেখে। হঠাৎ সংবিৎ পেয়ে কেঁপে ওঠে। দৌড়ে আলনা থেকে প্যান্ট টেনে নিয়ে পরে, গায়ে শার্ট চাপায়, খুব তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে, বেরিয়ে পড়ে সে।

সদর দরজার কাছে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে ভিতরের ঘরের দিকে চেয়ে বলে—মিলু, মিলু আমাকে ক্ষমা কোরো—লক্ষ্মী সোনা আমার—

দাদাকে দু—হাতে জাপটে বসেছিল মিলু। পাথর হয়ে। তবু বিলাসের কথা তার কানে গেল। হরিণীর মতো সচকিত হয়ে উঠল সে। বিলাস—বিলাস কি তবে ভালোবাসে তাকে? এখনো? চকিতে বিদ্যুৎ স্পর্শে উঠে দাঁড়ায় সে। ছুটে আসে দরজায়।

বিলাস সিঁড়ি দিয়ে কত দ্রুত নেমে যাচ্ছে। পালাচ্ছে।

শোনো, শোনো। ডাকে মিলু।

বিলাস তার ভয়ার্ত সুন্দর মুখখানা ঘুরিয়ে থমকে দাঁড়ায়।

দরজার চৌকাঠে হাত রেখে মিলু কাঁপতে থাকে, কাঁদে অস্ফুট গলায় বলে—তুমি কি এখানো আমাকে ভালোবাসো?

বিলাস দু—ধাপ সিঁড়ি উঠে আসে বলে,—বাসি মিলু, চিরকাল বেসেছি। তুমি বোঝ না?

মিলু আস্তে করে বলে—তোমার ভয় নেই, দাদা মরেনি। তুমি তাড়াতাড়ি ফিরো।

বিলাস অবিশ্বাসের চোখে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকে। তারপর মাথা নাড়ে। ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙে নেমে যায়।

ভাঙা কাচে আকীর্ণ মেঝের ওপর শিশু জুলেখা দাঁড়িয়ে। তার চোখে জল, সে কাঁদছে এক পা এক পা করে এগোচ্ছে লালুর দিকে।

ভাঙা, রক্তাক্ত মুখ তুলে লালু জুলেখাকে দেখল।

—আঃ জুলেখা, চারদিকে কাচ মা, তোমার পা কেটে যাবে।

সে ফিসফিস করে বলল।

জুলেখা তবু ভাঙা কাচ মাড়িয়ে এক পা এক পা করে আসছে।

চোখের রক্ত মুছে নেয় লালু। তারপর দু—হাত বাড়িয়ে কোলে নেয় জুলেখাকে। শিশু গন্ধে তার বুক ভরে যায়।

—আঃ জুলেখা আমার তেমন লাগেনি মা। আমি ঘোড়া হই, তুমি আমার পিঠে চাপো।

লালু শিশু হয়ে থাকে। লালু শিশু হয়ে যায়। ভাঙা মুখ, রক্তাক্ত শরীর, মাথার ভিতরে এক আংশিক অন্ধকার—তবু নিজেকে নিরভিমান লাগে তার। রাগদ্বেষহীন প্রকাণ্ড শিশুর মতো সে জুলেখাকে ভোলাতে থাকে। জুলেখাকে পিঠে নিয়ে আকীর্ণ কাচ খণ্ড পয়সা রক্তের ফোঁটার ওপর সে হামা দিয়ে ফেরে সারা ঘর। মুখে তার অনাবিল হাসি।

দরজায় দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা হাঁ করে দেখে মিলু।

# বনমালীর বিষয়

এইখানে বনমালী বাগান করেছে। বাগানের মাঝখানটিতে তার লাল ইটের বাড়ি। বলতে কী, যৌবনকালটা তো সুখে কাটায়নি বনমালী। বড় কষ্ট গেছে। সে সময়ে সে ঘর ছেড়ে কাপড়ের গাঁট নিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছিল। মহাজন ধারে কাপড় দিত, নইলে সে ব্যবসাও শুরু করতে পারত না সে। ক্রমে ফিরি করতে করতেই তার শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড়ের কাছে দোকানটা হয়ে গেল। সারাটা জীবন সে দেখেছে, মানুষের লজ্জা ঢাকার জন্য বস্ত্রের বড় প্রয়োজন। বস্ত্র ছাড়া উপায় নেই।

বনমালী সেই মানুষের লজ্জা ঢাকার বস্ত্রের ব্যবসায়ে এখন সুখে আছে। এই যে বাগান, এই যে লাল ইটের বাড়ি এ—ও হচ্ছে মানুষের বস্ত্র। এসব দিয়ে মানুষ লজ্জা ঢাকে। বনমালী তার সারাটা যৌবনকালের দীনতার লজ্জা ঢেকেছে। বাগানে হরেক ফুল, কত নার্সারি ঘুরে ঘুরে বীজ আনে সে, কত জায়গা থেকে নিয়ে আসে গাছের চারা, লাগায়।

সামনে ফুলের বাগান, পিছনে ফলের। সামনে যেমন ফোটে গোলাপ, বেল, শেফালি, পপী কিংবা চন্দ্রমল্লিকা, কাঠচাঁপা, তেমনি পেছন দিকে রয়েছে মর্তমান কলার ঝাড়, কেরালার নারকোল গাছ, আম, লিচু, পেয়ারা সুপুরি, কাঁঠালের গাছ। শীতকালে পালং বুনে দেয়, বাঁধা আর ফুলকপি, আলু মুলো বেগুন লঙ্কা সব গাছ লাগায়। অবসর সময়ে ছুটির দিনে সারাদিন বাগানে ঘুরে ঘুরে গাছ দেখে সে। ভারী একটা বিস্ময় তার বুকে থমকে থাকে। এই যে গাছ হয়, ফুল ফোটে, ফল ফলে—এটাই একটা অবাক কাণ্ড। কী করে এক মাটি, এক সার থেকে এত রকমের রং আর রস তৈরি হয় তা সে বুঝেই পায় না। মাটির ভিতরে বোধহয় তাহলে সবই লুকিয়ে থাকে। এই ফুল ফোটা, ফল হওয়ার সব গুপ্ত রহস্য!

ফিরি করার সময়ে সে যেত কত বাড়িতে। বিচিত্র সব বাড়ি বিচিত্র সব মানুষ থাকে তাতে। বনমালী বেরোতো দুপুরের দিকে, যখন বাড়ির কর্তারা থাকেন বাইরে। গিন্নিরা ফিরিওলার কাছ থেকে জিনিস রাখে—এটা কর্তাদের পছন্দ নয় কখনো। মেয়েরা ঠকেই। দশ টাকার জিনিস কমিয়ে সাত টাকায় রাখে, তবু দেখা যায় দু—টাকা ঠকে গেছে। কর্তারা তাই ফিরিওলা বাড়িতে এলে ভারী বিরক্ত হন, গিন্নিদের ধমকটমক করেন। বনমালী তাই দুপুরে বেরোত। ধার বাকিতে জিনিস দিত, ভারী মিষ্টি ছিল তার ব্যবহার। ডবলের বেশি দাম হেঁকে রাখত, যাতে কমিয়ে কমিয়েও গিন্নিরা তল না পায়। বনমালীর জিৎ হত বরাবর। এখন তার শ্যামবাজারের দোকানে 'ফিক্সড প্রাইস' লেখা কয়েকটা প্লাস্টিকের ছোট বোর্ড ঝোলে। এখন সে আর কষ্ট করে দর কষাকষির মুখে ফেনা তোলা ব্যবসাতে নেই। তা সেই ফিরিওলা বনমালী যখন বাড়ি বাড়ি যেতে তখন সে মানুষের বাড়ির ভিত দেখত, জানালা দরজা দেখত, গ্রিল দেখত, আসবাব দেখত। তার মন বলত—যদি কোনোদিন হয়, ভগবান সুদিন দেন তো এরকম বাড়ি করব। সামনে বারান্দা থাকবে, তাতে পদ্ম আর রাজহাঁসের নকশাওলা গ্রিল, ঘরে ঘরে বাথরুম থাকবে, ছাদে থাকবে ঠাকুরঘর...এরকম নানা কথা ভাবত, ভেবে রাখত বনমালী। ঘরে টিউবলাইট, রেডিও, রেফ্রিজারেটার, গ্রামোফোন, সবই থাকবে। আর থাকবে বউ। সুন্দরী লক্ষ্মীমন্ত।

সবই হয়েছে বনমালীর। ভগবানের ইচ্ছা। বাগান হয়েছে, হয়েছে লাল ইটের দেড়তলা ছিমছাম সুন্দর বাড়িখানা। সামনে পদ্ম আর হাঁসের নকশাওলা গ্রিল। গ্রীষ্মের রাতে স্নান করে এসে যখন বারান্দার ইজিচেয়ারে বসে সে, তখনই বেল আর গোলাপের গন্ধ আসে, আরও নানা গন্ধ। সবচেয়ে ভালো লাগে মাটির ভিজে স্নিগ্ধ গন্ধটি। একই মাটি থেকে কোন ম্যাজিকওয়ালা যে এতরকম রং আর রস তৈরি করছে! বনমালীর বিস্ময় এখানেই শেষ হয় না। বসে বসে সে চারদিক দেখে। তার বিষয়—সম্পত্তির ওপর যখন

আবহমান কালের চাঁদের আলো পড়ে, তখন তার মনে হয়, তার এক জীবনের দারিদ্র্যের লজ্জা কেমন সুন্দর বাগানের ফুলের গন্ধে, বাড়িটার ছিমছাম সৌন্দর্যে ঢাকা পড়ে গেছে। বিষয় হচ্ছে মানুষের আত্মার সবচেয়ে বড় বস্ত্র। কী করে এই দুর্লভ বস্ত্রটি পেয়েছে! এইটে ভেবেই তার বিস্ময় আর শেষ হতে চায় না। সে চুপ করে বসে থাকে। মুখটি হাঁ হয়ে যায়, চোখে পলক পড়ে না। এইভাবে অনেকক্ষণ কেটে গেলে তার বউ এসে ডাক দেয়—বলি ভূতে পেয়েছে নাকি! ভাবছো কি হাঁ করে!

বনমালী চমকে উঠে তার বউয়ের দিকে চায়। বিস্ময় তার শেষ হয় না সত্যিই। এই যে রমণীটি—এ হচ্ছে তার সেই মহাজনের মেয়ে। খেটেখুটে বনমালী উন্নতি করল দেখে সে ভারী খুশি হয়েছিল। একদিন তাকে ডেকে বলল—দেখ বনমালী, ছেলের মতো তোমাকে দেখেছি এতদিন। দেখলাম, তুমি বাহাদুর বটে। তোমার মতো ছেলেকে ছাড়তে ইচ্ছে করে না। আমার ইচ্ছে, তোমাকে বেঁধে রাখি। আমার পয়সার অভাব নেই, বড় তিনটে মেয়েকে সোনা জহরত আর টাকায় মুড়ে ভালো ঘর—বরে বিয়ে দিয়েছি। কিন্তু ভালো ঘর—বর বলতে লোকে বোঝে টাকাওলা বনেদি বংশ। বনেদি বংশে মেয়ে দিয়ে সুখ পাইনি। জামাইরা সব পৈতৃক টাকায় খায়দায় বাঁশি বাজায়, ঘুড়ি আর পায়রা নিয়ে আছে। পরিশ্রমী, লড়িয়ে মানুষ নয়। ভাবছি শেষ মেয়েটাকে আর ওসব অপদার্থের গলায় ঝোলাব না। তোমার এখন উঠতি সময়, এখনো দাঁড়াওনি। তবু তোমাকেই দেব, যদি রাজি থাকো।

বনমালি রাজি হয়ে গেল। মেয়েটিকে সে দেখেছিল। সুন্দরীই বলা যায়। রংটা চাপার দিকে, মুখখানা গোলগাল। কিন্তু সব মিলিয়ে চটকদার। ঘন ভ্রূ, টানা চোখ, গালে টোল। সেই মেয়েটিই এখন তার বউ। বনমালীর এও এক বিস্ময়।

মহাজনের মেয়ে। ওর বাপের না হোক দশ—বারো লাখ টাকার কারবার। যৌবনকালে ওর বড়বাজারের দোকানের সামনের হাতায়। ঠান্ডায় বসে থাকত বনমালী। সারা দিনটা কলকাতায় দৌড়ঝাঁপ। পৃথিবীটা তখন ভারী পিছল জায়গা বলে মনে হত। কোথাও দাঁড়ানো যাচ্ছে না। দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে গেলেই পা হড়কায়। প্রাণপণে তখন পৃথিবীতে লেগে থাকার চেষ্টা এক নাগাড়ে চালিয়ে যাচ্ছে বনমালী। বাপ রিফিউজি কলোনীতে দু—খানা ঘর তুলতেই মাজা ভেঙে বসে পড়েছে। তার আটটি ছেলেপুলে, বনমালী বড়। তাকে ডেকে বলেছে—রাস্তা দেখ।

তা সারাদিন রাস্তাই দেখত বনমালী। কত রাস্তা, কত অলিগলি, কী বিচিত্র কায়দায় কলকাতা শহর কেটে কেটে রাস্তা বানিয়েছে মানুষেরা। তখন বনমালীর বিশ্বাস ছিল, কলকাতা শহরে আগে তৈরি হয়েছে বাড়িঘর, দোকানপাট। তারপর সেই জমাট বাড়িঘর আর দোকানপাটের ফাঁকফোঁকর দিয়ে মানুষেরা শাবল গাঁইতি চালিয়ে এইসব অলিগলি তৈরি করেছে। রাস্তাঘাটগুলো তাই এমন গোলমেলে।

সারাদিন রাস্তা দেখে দেখে বনমালী ক্লান্ত হয়ে এ বাড়ির রক, সে বাড়ির বারান্দায় বসত। লোকে অচেনা লোক বিশ্বাস করে না। হুড়ো দিত। বনমালী আবার উঠে রাস্তায় হাঁটত। ক্রমে সে দেখেছিল রোদ উঠলে, গ্রীষ্মকালে সবেচেয়ে ছায়ার জায়গা হচ্ছে বড়বাজার। সেখানে কাটরার ঘিঞ্জিতে কোনোকালে দিনমণির আলো পড়েনি। দুপুরের দিকটায় তাই বনমালীর বাঁধা আস্তানা ছিল বড়বাজার। সেখানে ব্যাপারী খদ্দেরের ভিড়ে দিব্যি গা—ঢাকা দিয়ে থাকা যেত। হুড়ো যে কেউ দিত না তা নয়। তবু বেশিরভাগ ব্যাপারীই গা করত না। তার মহাজন, হবু শ্বশুরের দোকান ঘরটার সামনে একধাপ সিঁড়িতে বসে থাকত সে। দেখত, দোকান—ঘরে টিউবলাইট জ্বলে, পাখা ঘোরে, খদ্দেরের ভিড় গায়ে গায়ে, টাকার গদি লেগে যায় ক্যাশবাক্সে।

মহাজন একদিন এক বড় খদ্দেরকে খাতির করতে গিয়ে বনমালীকে ডেকে বলে—যাও তো খোকা, লাটুর দোকানে তিন কাপ চা বলে এসো তো। বোলো দুখীরামবাবুর চা, তাহলে বেশি দুধ—চিনি দিয়ে দেবে।

সেই হল বনমালীর পয়লা দড়ি, যা দিয়ে নিজেকে সে পিচ্ছিল পৃথিবীর সঙ্গে আজও আটকে রেখেছে। চা বলে এল বনমালী। পরদিন সিগারেট এনে দিল। ক্রমে ক্রমে মহাজন তাকে দিয়ে আরও ফাইফরমাস করাতে

লাগল। যত করায় তত করে বনমালী, টুঁ শব্দটিও না করে, ফলের আশা না রেখে। 'কী করো খোকা? কোথায় থাকো?'—এরকম দু—একটা প্রশ্নও তাকে মহাজন কখনো কখনো করেছে।

মহাজনের দোকানে দু—একবার কাপড়ের গাঁট বাঁধল সে। দু—এক জায়গায় মাল পৌঁছে দিয়ে এল। ওইভাবেই একদিন মহাজনের মনের মধ্যে সে সেঁধিয়ে গেল। আর মনের মধ্যে একবার সেঁধোতে পারলে আর ভয় নেই। মানুষের মনই হচ্ছে মানুষের ঠিক বাসা। সে দোকানে ঢুকল বিশ টাকা মাইনের কর্মচারী হয়ে। কয়েকদিন পর মহাজনকে ঘাড় চুলকে বলল—কয়েকখানা বাছাই কাপড় ধারে দিন। মহাজন দিল। গোপনে কাপড় বেচে এল সে, টাকা শোধ করল। এইভাবে তার ব্যবসার শুরু। ক্রমে ক্রমে বেশি কাপড়, আরও বেশি কাপড় নিতে নিতে সে একদিন আলাদা হয়ে ফিরিওলা হয়ে গেল। মহাজন দুখীরাম আপত্তি করেনি। কেবল চোখটা সে খোলা রেখেছিল।

সেই মহাজনকে বরাবর গৃহদেবতার পরের আসনটাই দিয়ে রেখেছিল সে। তার বাড়ির জামাইও যে হওয়া যায় এমনটা তার কখনো মনে হয়নি।

সে রাজি হয়ে গেল। মহাজন দশ হাজার টাকা নগদ দিয়ে সে এক এলাহি বিয়ে দিল তাদের। লোক খাওয়াল হাজার দুই। সেই ম্যারাপ, আলো, ফুল, লোকজন, উপহার সবই স্বপ্নের মতো মনে হয়। বিয়ের পরও কয়েকদিন সে তার বউয়ের অঙ্গস্পর্শ করতে ভয় পেত। কেমন যেন মনে হত—আরেব্বাস, এ তো মহাজনের মেয়ে।

বলতে কী, বনমালীর আজও তা মনে হয়।

বাগানে জ্যোৎস্না পড়লে কি ফুল ফুটল হাঁ করে দৃশ্যটা দেখে বনমালী। তা সেই মহাজনের মেয়ে যখন এসে তাড়া দেয় তখন বনমালী হঠাৎ মুখ তুলে তার বউকে ঠিক বউ বলে বিশ্বাস করতে পারে না। বিস্তর রাম—চিমটির দাগ বনমালীর শরীরের আজও আছে। স্বপ্ন দেখছে মনে করে নিজেকে জাগানোর জন্য বিস্তর চিমটি কেটেছে।

তা এখন বনমালীর মনে হয়, স্বপ্ন ব্যাপারটা ভারী গোলমেলে। গত কয়েক বছর ধরে সে একনাগাড়েই বোধহয় স্বপ্ন দেখে যাচ্ছে। স্বপ্নের মধ্যেই করছে বসত। সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে—যদি স্বপ্নেই রেখেছো তো শেষ দিনকতক আর ঘুমটা ভাঙিও না বাবা।

বনমালী বাহারি বাগান করেছে এইখানে। নানা রঙে রঙিন বাগানের মাঝখানটিতে তার বাড়ি। কলকাতা থেকে জায়গাটা দূরে নয়। কিন্তু কলকাতার বাইরে, বালী মাকালতলা। বাঁশঝাড় আছে, পুকুর আছে, পুরোনো বাড়ির ধ্বংসাবশেষ আছে, রাতে শেয়াল ডাকে, জ্যোৎস্না উঠলে টের পাওয়া যায়। কলকাতা আর ভালো লাগে না বনমালীর। বিয়ের পরও বছর সাত—আট তার কলকাতার নবীন পাল লেনের পুরোনো ভাড়াটে বাসায় কেটেছে। তার বউ—আসলে যে মহাজনের মেয়ে—সেই তাগাদা দিত। বলত 'বাড়ি করো, বাড়ি না করলে পৃথিবীতে ঠিক শেকড় গাড়ে না মানুষ। তুমি যে বড়লোক, প্রতিষ্ঠাবান, তার প্রথম প্রমাণই হচ্ছে দিনের শেষে তুমি অন্যের বাসায় না ফিরে ফিরছো নিজের বাড়িতে। ভাড়াটে বাড়ির দেয়ালে একটা পেরেক ঠুকলেও বাড়িওয়ালা দৌড়ে আসে। এ আর ভালো লাগে না।'

চৌপর দিন ঘুরে, দালালের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে, বিস্তর দেখেশুনে মহাজনের মেয়ের পছন্দমতো বালীর মাকালতলায় জমি নিল বনমালী। গ্রামও নয়, শহরও নয়। ইলেকট্রিক আছে, দোকানপাট আছে। বাড়ি থেকে টানা তার শ্যামবাজারের দোকানে পৌঁছোতে বড় জোর পঁয়তাল্লিশ কি পঞ্চাশ মিনিট লাগে।

তার বউ অতসীকে সে বাড়ির মধ্যে প্রতিষ্ঠা করে নিশ্চিন্ত হল। এখন সকালবেলা গৃহদেবতাকে ভূলুণ্ঠিত প্রণাম করে নিজের বাড়ি থেকেই বেরোয় বনমালী। পৌনে সাতটার ট্রেন ধরে। পৌনে আটটার মধ্যে ধূপধুনো দিয়ে দোকান খুলে ফেলে। বাচ্চা একটা চাকর আছে, সে চা এনে দেয়। বাড়ি থেকে যখন বেরোয় তখন প্রায় দিনই চা খেয়ে আসা হয় না। মহাজরে মেয়ের বেলা পর্যন্ত ঘুমোনোর অভ্যাস। সকালে উঠলে সারাদিন মেজাজ ঠিক থাকে না। ঠাকুর আছে, বাচ্চা একটা কাজের মেয়েও আছে বটে, কিন্তু বনমালী কাউকে খাটায়

না। এক গ্লাস ইসবগুলের ভূষি খেয়ে প্রাতঃকৃত্য সেরে চলে আসে। সকালের প্রথম চা—টি খায় দোকানে বসে।

দোকানখানা তার নিজের। একার। কোনো অংশীদার নেই। শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড়ের কাছে এই দোকানঘরখানা যদি বনমালী এখন ছেড়ে দেয় তবে লাখ দেড়েক সেলামি লেগে যাবে। বনমালী হাজার দশেক দিয়ে নিয়েছিল দশ বছর আগে।

ঘরখানা বড়ই, একনম্বর সেগুন দিয়ে তৈরি তার বিশাল বিশাল আমলারি, শো—কেস, কাউন্টারের গায়ে ইদানীং সানমাইকা লাগিয়ে আরও বাহার খুলছে। দোকানটা চার ভাগে ভাগ করা। এক কাউন্টারে তাঁত ও সিল্ক, অন্যটাতে মিলের সূতি, সিল্ক, টেরিলিন, একটাতে রেডিমেড, আর সবশেষে হোসিয়ারী। শীতকালে পশমি জিনিস, শাল—মলিদা, সোয়েটার, সুটের কাপড়। লাখ টাকার মাল মজুত রয়েছে দোকানে। কাচের ওপাশে হরেক রঙের বাহার বনমালীর জীবনে রঙের অভাব নেই। বাড়িতেও রং, দোকানেও রং।

দোকানের ঠিক মাঝখানটিতে একটি কংক্রিটের থাম। ঘরটার ভারসাম্য রাখার জন্যেই তৈরি। চৌকো থামখানা বিশ্রী দেখায়, তাই বনমালী ভালো পালিশ কাঠে থামখানা আগাপাশতলা ঢেকে চারধারে চারটে সরু, লম্বা আয়না লাগিয়েছে। থাম ঘিরে গোল একখানা কাউন্টার। থামের একপাশে পেতলের রেলিংওলা ক্যাশের খোপে বসে বনমালী, অন্য দারটায় প্যাকিং আর ডেলিভারি।

সাতসকালে ধোঁয়া ওঠা পুরো এক গ্লাস সুগন্ধী চা সামনে রেখে বানমালী হাই তোলে। আর চারদিকে চায় আলাদিনের গল্পের সেই দৈত্য, নাকি মহাভারতের সেই দানবময়—কার যে কীর্তি তা ঠিক বুঝতে পারে না।

লোকে বলাবলি করে, বনমালী বড় উন্নতি করেছে।

উন্নতি! তা অবশ্য বনমালী অস্বীকার করে না। উন্নতি বই কি! কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা আছে একটা। উন্নতির চেয়েও বেশি হচ্ছে কেটা বিস্ময় বোধের জন্মলাভ, এ দোকান যে তারই, সে—ই যে মালিক, এর যে আর কোনো মহাজন নেই সেটা তার ঠিকমতো বিশ্বাস হতে চায় না। এ দোকান সে কি নিজে করেছে! এ কি তারই! তার বর্ণহীন জীবনে এত রঙের বাহার কবে খোলতাই হল!

কারবার দাঁড়িয়ে গেলে আপনিই চলে, তার জন্য হালদারি শিকদারীর আর দরকার হয় না। একবার কারবারটা বেঁধে ফেলতে পারলেই হল। পেতলের রেলিং ঘেরা ক্যাশ কাউন্টারে বসে পাখির পালকে কানে সুড়সুড়ি দিতে দিতে আরামে আধবোজা চোখে বনমালী দেখে, তার কারবার চলছে। চোখ পুরোপুরি বুজে থাকলেও চলবে। কাপড় মাপা হবে, কাটা হবে, প্যাকিং হবে, ক্যাশে এসে দাঁড়াবে লোকজন, বনমালী টাকা গুনে—গেঁথে তুলবে, ইনকাম ট্যাক্স, পুলিশ, কর্পোরেশন সব বন্দোবস্ত মতো চলবে। মাঝে মাঝে দুপুরের দিকে বড়বাজারে মাল তুলতে যাবে বনমালী, কিংবা রেল—ইয়ার্ডে মাল ছাড়াতে। কিছু কষ্ট নেই সেই সব নড়াচড়ায়। টাকার ছবিতে বড় বাহার। সব সয়। বড় ছেলেটা দশে পা দিলে। মেরেকেটে আঠারো হলেই কারবার বোঝাবে। ততদিন বেঁচে থাকলেই হল। বড় ছেলেটা একটু বুঝে গেলেই আর চিন্তা নেই। শুধু সেটুকুর জন্য, কয়েক বছর সময়ের জন্য একটু দুশ্চিন্তা তার। মোটা ইন্সিওরেন্স করে রেখেছে নিজের আর বউয়ের, দোকানও ইন্সিওর করা, তবু ভয় একটু থেকেই যায় সেটাকে ইন্সিওর করা চলে না, আর আট—দশ বছর সে কি বাঁচবে না? বাঁচবে, এখনো সে পোক্ত আছে বেশ। মাত্র পঁয়তাল্লিশ কি ছেচল্লিশ বছর, ঠিকমতো বাঁচলে আরও বহুদিন তার বাঁচার কথা।

বিকেলের দিকে সত্যচরণ আসে। গাঁটরি বওয়ার আমলে তার সঙ্গে ভাব হয়েছিল। দিনের শুরুতে ঠিক করে নিত কে কোন রাস্তায় ফিরি করবে। সেই থেকে বন্ধুত্ব। সত্যচরণ তেমন কিছু করতে পারল না। রিফিউজি কাটারায় দোকান দিয়েছে একটা। চলে না তেমন। স্টকও রাখতে পারে না। শরীরটাই সত্যচরণের জুতের নয়। রোগা—ভোগা, তার ওপর নেশা—ভাঙ, একটু মেয়েমানুষের দোষও ছিল, গায়ে পারা উঠে যাচ্ছেতাই ভুগেছিল একবার। জমানো টাকা সব তাতেই গলে গেল। শেষমেষ রিফিউজি কাটারায় দোকান ছাড়া আর উন্নতি করতে পারল না সে। ছেলেরা বড় হয়েছে, তাদের মধ্যে বড়টি দোকান দেখে, সত্যচরণ

আসে বনমালীর দোকানে। দরজার কাছে টুলখানায় বসে থাকে। ছটা বাজলে বনমালী ক্যাশে সবচেয়ে বুড়ো আর বিশ্বাসী কর্মচারী সুধীরবাবুকে বসিয়ে বেরিয়ে আসে।

দুই বন্ধুতে তেমন কোনো কথা হয় না, বনমালী একটা সস্তার নেশা শিখেছিল। মোদক। হেমদা কবিরাজের দোকানে এক সময়ে যেত বাবার জন্য স্বর্ণ—সিঁদুর কি চ্যবনপ্রাশ আনতে। সেই থেকে মদনানন্দ মোদকের বিজ্ঞাপনটা খুব টানত। হেমদার পর বরদা কবিরাজের আমলে সাহস করে কথাটা পেড়েছিল সে —মোদক একটু খেলে বোধহয় প্রপুল্ল থাকা যায়, কী বলেন বরদাবাবু?

খুব হেসেছিলেন বরদা, বললেন—লজ্জার কী? প্রফুল্ল থাকলেই হয়।

সেই থেকে সে বাঁধা খদ্দের! নেশা কে নেশা, গন্ধ বেরোয় না, মাতলামি নেই, কেবল একটা বুঁদ হয়ে যাওয়া আনন্দের ভাব আছে।

সেবার যখন সত্যচরণ লিভারের বারোটা বাজিয়ে কদিন প্রাণান্তকর। ন্যাবায় ভুগে উঠল তখন তার বউ তাকে দিয়ে মা কালীর পা স্পর্শ করিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেয় যে মদ খাবে না। মদ ছেড়ে ভারী মুশকিলে পড়ে গেল সে। বনমালী তখন তাকে মোদক ধরায়। বরদা কবিরাজের দোকানে এখন দৈনিক যাতায়াত, কবিরাজও বন্ধু হয়ে গেছে। পয়সার বেশ সাশ্রয়। কেবল সত্যচরণ খুঁতখুঁত করে বলে—মাইরি বরদাবাবু, শুনেছি মৃতসঞ্জীবনীতে নাকি এইট্টি পারসেন্ট অ্যালকোহল আছে!

—আরও কম। বরদা কবিরাজ চেয়ারে কেতরে বসে হাঁটু দুটো তুলে নাড়তে নাড়তে বলে।

—তোমরা কি আর সেই অ্যালকোহল দাও নাকি! বলে সত্যচরণ হাই তোলে।

—তবে কী দিই?

—কাঁচা ধেনো। একটা বোতল দিও তো, চেখে দেখব।

বনমালী কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে বলে—যা নিয়ে আছো তাই নিয়ে থাকো। একটারই বশ হও।

সত্যচরণ রোগে ভুগে খেঁকি হয়ে গেছে, সহজেই খ্যাঁক করে ওঠে। বলে—সেইজন্যই তো তোমার টাকা ছাড়া আর কিছু হল না! তুমি ওই একটি জিনিসের বশ।

—আর কী হবে শুনি! বনমালী দাপটে বলে।

সত্যচরণ তখন কথা খুঁজে পায় না। বিড়বিড় করে।

নেশা জনে এলে বনমালী মিটিমিটি হাসে—টাকা হলে সংসারী মানুষের আর কী হওয়ার থাকে! অ্যাঁ! আমি ভেবে তো পাই না। কী বলেন বরদাবাবু?

বরদার বাপকেলে ব্যবসা এখন ঝুল। পুরোনো আমলের ঘরভাড়া কম বলে দোকান টিকে আছে। যুদ্ধের বাজারে লাখোপতি হওয়ার জন্য বরদা বিস্তর পাথর কুঁচির ব্যবসা করতে গিয়ে ঘোল খায়, নইলে এতদিনে সে দোকান তুলে দিত। এখন দোকানের কলে ইঁদুরের মতো আটকে পড়ে গিয়ে খাবি খায়। মোদকের খদ্দেররাই বাঁচিয়ে রেখেছে। সালসা—টালসা, সুধা কিংবা পাঁচন চলে না। বরদা কবিরাজ তাই ফলাও মোদক বানায়। খদ্দের প্রায় বাঁধা। বনমালীর কথা শুনে একটু ছটাকে হাসি হেসে বলে—তাই তো। টাকাই হচ্ছে সংসারের সুতো, যেমন ইচ্ছে মালা গাঁথা যায়।

সত্যচরণ সেটা মানতে চায় না। বলে—বনমালী, তোমার সত্য উপলব্ধিই তো হল না। এই যে পৃথিবীতে জন্মেছো, এর কটা জায়গা দেখলে তুমি? কটা মানুষের সঙ্গে ভাব ভালোবাসা হল? জীবনের একশো মজা আছে তার কটা মজার স্বাদ পেয়েছো? মদ খেলে না, মেয়েমানুষের কাছে গেলে না, কাশী হরিদ্বার বৃন্দাবন কি লন্ডন নিউইয়র্ক গেলে না—ধুস ওটা কি জীবন? তুমি হচ্ছো গিয়ে সাদা দেওয়াল, ছবি ছক্কর নেই, রং নেই, দূর দূর...সাঁঝের বেলা মোদক চেটে ভাম হয়ে বসে থাকো, এর বেশি তোমার আর কিছু হল না।

ততক্ষণে নেশা জমে আসে। চোখে লাল নীল নানারকম রং দেখে বনমালী। দেখে কলকাতার রাস্তাঘাটে কেমন সব বাহারি রং, কেমন আলো, কেমন মিঠে বাতাস বইছে! এ সময়ে তার মনের ওপর একরকম মাখনের প্রলেপ পড়ে যায়। কোনো কথাতেই রাগ হয় না, বরং ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। সত্যচরণের কথা

শুনে তাই সে মৃদু হাসে। দুলে দুলে হাসে। তারপর বলে—বিশ্বরূপ দেখতে ত্রিভুবন ঘুরতে হয় না। আমি আমার দোকানে বসেই দেখি।

—আমার ইয়ে। বলে সত্যচরণ। তারপর মৃদু হেসে বলে—আর এক বিশ্বরূপ তোমার পরিবারের রূপে। তোমার মতো মাদি পুরুষ দেখিনি হে। অত ন্যাওটা হয়ো না বনমালী, একটু নিজের সংসারের বাইরের দুনিয়াটাকেও দেখ!

বনমালী ঝিমুনোর মধ্যেই বলে—যারা বাউন্ডুলে তাদের ঘরে জায়গা হয় না, পরিবার বের করে দেয় বাড়ি থেকে। তখন তাদের অগত্যা বিশ্বরূপ দেখতে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়। সত্যচরণ, সাফল্যের মধ্যে যে বিশ্বরূপ আছে তা তোমার দেখার কপাল নেই।

তর্ক হয়, ঝগড়াঝাঁটি হয়। তারপর একটা টানা রিকশায় উঠে দুজনে ফিরে আসে। বনমালী ফিরে ক্যাশ মেলায়। সত্যচরণ হেঁটে বাড়ি ফেরে। যতটুকু বনমালীর রিকশায় আসা যায় ততটুকুই লাভ, তারপরের রাস্তাটুকু তার নিজের।

বনমালী জানে সত্যচরণ তাকে গাল পাড়তে পাড়তে বিড়বিড় করে বকতে বকতে বাড়ি ফেরে। তা হোক। বনমালীর রাগ হয় না। সত্যচরণের সঙ্গে তার অবস্থার তফাতটুকুই প্রমাণ করে যে, বনমালীর উপলব্ধিই সত্য। সত্যচরণেরটা হচ্ছে গিয়ে প্রলাপ। তার রাগ করার দরকার হয় না।

নটা সাতের ট্রেনটা রোজ পায় না বনমালী। তার পরের ট্রেন নটা পঞ্চান্নোয়। লম্বা সময়। হাওড়া স্টেশনের মুখে বারোমাস কয়েকটা ছোকরা কাটামুন্ডুর মতো ঝুঁটি ধরে কানফুল নাকফুলের মতো ছোট ফুলকপির আঁটি বিক্রি করে। হাতে সময় থাকলে অসময়ের কপি সওদা করে বনমালী, স্টেশনের বাইরের দোকান থেকে মহাজনের মেয়ের জন্য ফল কেনে। মর্তমান কলাটা আবার মহাজনের মেয়ের বড় পছন্দ। ছেলেপুলের জন্য খেজুর কি আমসত্ত্ব লিচু বা আম—সময়ের ফলপাকুড় কেনে। সওদা করেও সময় থাকে। তখন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে অন্যমনে নানা কথা ভাবে। বেশিরভাগই বাকি বকেয়া, মন্দা বাজার, সোনার দর, আয়কর, জমি ইত্যাদির কথা। কখনো—সখনো সত্যচরণের বিশ্বরূপের কথাও ভেবে ফেলে। সত্যটা পাগল। একটা জীবন ফুক্কুড়ি করে কাটিয়ে দিল।

ট্রেনে পনেরো মিনিট বালী স্টেশন, তারপর মিনিট ছয়েকের হাঁটাপথ। বাগানের ফটকে পা দিতেই অন্য জগতে চলে আসে বনমালী। ছবির মতো বাড়িখানা তার, চারদিকের ফুলবাগিচায় ডুবে আছে। নানা ঘরে নানা আলো, দরজায় পাতলা রঙিন লেস—এর পরদা ওড়ে। লালা, সবুজ, নীল, হলুদ সব টিউবলাইট জ্বলে ঘরে ঘরে। ধূপগন্ধ পাওয়া যায়। রেডিওর শব্দ আসে। ভালো রান্নার গন্ধ।

বাগানের ফটক থেকেই বনমালীর দ্বন্দ্বের শুরু হয়। এই বাড়ি কি তার! এই বাগান, ওই আলো, ওই আলো, ঘরে ঘরে সব দামি আসবার, এ সব কি তার! মনে কিছুতেই বিশ্বাসটা আসে না। ঘেমো শরীর, সারাদিনের পরিশ্রম, চিন্তা সব মিলিয়ে বনমালীর ভিতরটা শুকিয়ে থাকে। ভিতরে ভিতরে সে জানে পৃথিবীতে খুব সাধারণভাবে বেঁচে থাকাটাও কত কষ্টকর! কী পরিশ্রমটাই গেছে এক জীবনে! তাই বোধহয় এত আলো, মহার্ঘ জিনিসপত্র, বাগান এসব দেখে তার ভিতরটা কেমন চমকে ওঠে। এখনো রিফিউজি কলোনীতে তাদের পরিবার আলাদা পড়ে আছে। মা ভাই বোন। সম্পর্ক না থাকার মধ্যেই। বনমালী মাস মাস এক দুশো ধরে দেয়, ভাইরা খেটে খায়, একটা বোনের বিয়ে বাকি। সে বাড়িতে গিয়ে পা দিলে দুর্ভাগ্যজনক অতীতটা যেন হুড়মুড় করে মাথায় ভেঙে পড়ে। সব মনে পড়ে যায়! সেই দুর্ভাগ্যের দিন তো খুব বেশি দূরে ফেলে আসেনি সে, তাই মনে পড়ে। এইসব বাড়িঘর, আলো, বাগান অবিশ্বাস্য লাগে।

মহাজনের মেয়েক খুশি করা সহজ কথা নয়। টাকার খেলা সে মেয়ে দেখেছে বিস্তর। তাই বনমালীর অবস্থা ফিরলেও সে এখনো পুরোপুরি খুশি নয়। বাড়িঘর সে—ই সাজায়, ঘরে ঘরে নানা রঙের আলো জ্বালে, ছেলেমেয়েদের নিত্যনতুন পোশাক পরায়, নিজেও সাজে খুব। তাকে খুশি রাখার জন্যই পরিবারের সঙ্গে আর একত্র হল না বনমালী, বাড়ির লোকেরা তার কুৎসা গায় সেইজন্য। বলে—মেড়া, কামাখ্যার

যোগিনীদের বশ—করা পুরুষমানুষ—আরও কত কী! এত করেও মহাজনের মেয়ের মন পাওয়া গেছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। বাড়িতে ফিরে বরাবর তার নিজেকে অতিথি অতিথি মনে হয়, ভয়ে ভয়ে অস্বস্তিতে আলগা আলগা থাকে সে। পরিষ্কার গেঞ্জি পরে, দামি লুঙ্গি, চুল আঁচড়ায়, পায়ে মোষের—নাক চটি, রোজ দাড়ি কামাতে হয়—বিস্তর ঝামেলা। হাঁটুর ওপর লুঙ্গি তুলে, বিড়ি ফুঁকে, বিছানায় গড়ানোর গার্হস্থ্য আয়েস তার কপালে নেই। মহাজনের মেয়ে সব টিপটাপ চায়। ছেলেমেয়েদের যে টেনে—হিঁচড়ে বুকে নিয়ে হামলে আদর করে চিড়বিড়ে ভালোবাসা মেটাবে তারও উপায় নেই। ছেলেমেয়েরা মায়ের শাসনে আলগা থাকে, গায়ে গায়ে মাখামাখি বারণ। মাঝে মাঝে জ্যোৎস্না উঠলে, কি ফুলের গন্ধ ছুটলে, কি অকারণ পুলকে মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে, বউকে বুকে চেপে ধরে লন্ডভন্ড করে দেয় পোশাক, গাল কামড়ে ধরে আলগা দাঁতে, ঝামরে দেয় বাঁধা চুল। কিন্তু তা করতে গিয়ে থমকে যায়। সেই পুরোনো গন্ডগোল। বউকে বউ মনে হয় না, মনে হয়—এ তো মহাজনের মেয়ে! ভারী একটা ভয়—ভক্তির ভাব এসে পড়ে তখন।

মোদকটা অনেক্ষণ ধরে শরীরের ভিতরে খেলা করে। রিমঝিমে একটা আনন্দের ভাব। দেহ নিশপিশ করে। সুন্দর বাগানের ভিতর দিয়ে বারান্দা পর্যন্ত কংক্রিটে বাঁধানো চওড়া রাস্তা পার হতে হতে সে দেখে, বারান্দায় মহাজনের মেয়ে দাঁড়িয়ে। গায়ে একটা নেট—এর ফুলহাতা ব্লাউজ, বুকে পেটে অনেকখানি খোলা জায়গা। এ ছাঁটের ব্লাউজ বনমালীর দোকানেও রাখা হয় না। মহাজনের মেয়ের পোশাক নিউমার্কেট থেকে আসে। পরনের মিহিন খদ্দরের ছাপা শাড়িটা পর্যন্ত বনমালীর দোকানের নয়।

—বাঃ বাঃ! বনমালী খুশি হয়ে বলে—দিব্যি কাটটা তো ব্লাউজের। স্টক করব নাকি!

—তোমার তো কেবল স্টকের চিন্তা। একটা জিনিস চোখে পড়েছে যখন, তখন তার সৌন্দর্যটা দেখ, তা না স্টক।

লজ্জা পায় বনমালী। হেঁ—হেঁ করে হেসে বলে—চোখে লাগল বলেই তো বললাম।

বউ গম্ভীর হয়ে বলে—বাড়িতে এসে যখন দোকানদারি পোশাকটা ছাড়বে, তখন দোকানদারি স্বভাবটাও ছেড়ে ফেলবে। আমার বাবা বাড়িতে মেজাজি জমিদারের মতো থাকতেন।

বনমালী যে একদিন ফিরিওলা ছিল তা বোধহয় অতসী ভুলতে পারে না। দোষ নেই। নিজের অবস্থাকে আজও তো নিজেই সঠিক বিশ্বাস করতে পারে না বনমালী!

স্বপ্ন! সবই স্বপ্ন। মার্বেল মাজা বাথরুমে হাতমুখ ধুয়ে ওডিকোলোন আর দামি পাউডারের গুঁড়ো গায়ে মেখে কিছুক্ষণ বারান্দায় বসে বনমালী। বাগানে জ্যোৎস্না পড়ে, ফুলের গন্ধ আসে। নিজের গা থেকে প্রসাধনের গন্ধ ছড়ায়। পাশেই হেলানো চেয়ারে বসে থাকা অতসীর গয়নার টুং—টুং শোনা যায়। স্বপ্ন ছাড়া আর কি!

টেবিলে বসে রাতের খাবার খায় সে। মোদকের নেশার রেশটা তখনো তাকে। খাবারের স্বাদ ভারী ভালো লাগে। ছেলেমেয়েরা সব ইংরিজি স্কুলে পড়ে। অতসীর কড়া নিয়ম, বাড়িতেও ভাইবোনেরা পারতপক্ষে ইংরিজিতে কথা বলবে। খাওয়ার টেবিলের এধারে ওধারে ছেলেমেয়েরা পরস্পরের দিকে ইংরিজি কথা ছুঁড়ে দেয়, লুফে নেয়, বাবার দিকে চেয়ে হাসে। বনমালী ভালো বোঝে না, কিন্তু ভারী একটা সুখ হয়। সেও হাসে। এ যেন কোন না কোন বড়লোকের সাহেবি কেতার খাওয়ার ঘরে তার মতো উটকো এক লোকের নিয়ন্ত্রণ, অস্বস্তিটা ধাক্কা, মারে, নেশাটা ফিকে হয়ে আসে প্রায়। তবু হাসে বনমালী, সুখও হয়।

সত্যচরণ মাঝে মাঝে দু—হাতের বুড়ো আঙুল অশ্লীন ভঙ্গিতে নেড়ে তাকে দেখিয়ে বলে—এত যে করলে হে, কিছুই তোমার নয়। যখন পটল প্লাক করার সময় হবে তখন বুঝবে কি গু—খোরের কাজই করেছো একটা জীবন। নিজেকেই জানলে না বনমালী।

ফক্কড়। সত্যচরণের কথা ভাবতেই তার ওই শব্দটাই কেবল মনে আসে। রাতে ভালো ঘুম হয় না বনমালীর। চারদিক নিশুত হয়ে গেলে সারা বাড়ি জুড়ে কে যেন, কারা যেন কেবলই খুটখাট শব্দ করে। উদ্বেগ। মহাজনের মেয়ে তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে এক খাটে ঘুমোয়। বনমালীর ঘর আলাদা, বিছানাও, তবু

পাছে মহাজনের মেয়ের ঘুম ভাঙে সেই ভয়ে বনমালী বাতি জ্বালে না। টর্চ জ্বেলে জ্বেলে সারা বাড়ি ঘুরে বেড়ায়। দরজা—জানালা ঠেলে দেখে, গ্রিলের দরজার তালা নেড়ে দেখে। আবার শোয়, ঝিমুনি আসে। আবার শব্দ পেয়ে ওঠে।

জ্যোৎস্না ফুটেছে খুব। অন্ধকারে ভূতের মতো ঘর থেকে ঘরে ঘুরতে ঘুরতে বনমালী তার বিষয়—সম্পত্তি দেখতে পায়। দেখে বাগানের জ্যোৎস্না। সুখ তাকে খামচে ধরে। সুখ তাকে যন্ত্রণা দেয়। সত্যচরণ বলে—একটা জীবন পরের ঘরেই বাস করলে বনমালী, সেটা টেরই পেল না। ফক্কড়, কে কার ঘরে বাস করে দেখে যা হারামজাদা। চিরকাল মদ—মেয়েমানুষের পিছনে উচ্ছন্নে গেলি। থু!!

বেঁটে একটা ডেশাণ্ড কুকুর আছে অতসীর। কর্মের নয়। কেবল হাত পা চাটে, আর পায়ে পায়ে ঘোরে। মাঝে মাঝে ভুক ভুক করে নরম আদুরে আওয়াজ ছাড়ে। বনমালীর সঙ্গে প্রায় রাতেই সেটাও ইঁদুরের মতো বেঁটে বেঁটে পায়ে তুড়তুড় করে ঘোরে।

ছাদের সিঁড়িঘরের দরজা দেখে পিছু ফিরতেই সে কুকুরটার লেজ মাড়িয়ে দিল। বলল—আঃ হাঃ, ব্যথা পাসনি তো! কুকুরটা আদুরে আওয়াজ ছাড়ে। গ্রিলের গেট—এ একটা শব্দ হয়। কে যেন দরজা নাড়ে।

বনমালী টর্চ জ্বেলে নেমে আসে। কুকুরটা দৌড়ে গিয়ে ভয় পেয়ে ফিরে আসে। পায়ের চারধারে ঘোরে। বনমালী গাল দেয়—ব্যাটা নিষ্কর্মা।

সদরটা খুলে বারান্দায় পা দিতেই ভীষণ চমকে যায় বনমালী। কোলকুঁজো এক মানুষ, গ্রিলের ওধারে ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে।

চিলের মতো চিৎকার করে সে—কে?

ছায়াটা ফিসফিস করে বলে—দাদা, আমি গো, আমি হরিপদ।

বনমালী ভারী অবাক হয়,—হরিপদ? এত রাতে তুই কোত্থেকে?

—একবার বাড়ি চলো, মার অবস্থা খুব খারাপ।

—মা? বনমালী যেন কিছুক্ষণ বুঝতে পারে না। বাগবাজারের দোকান কি মাকালতলার বাড়ি জুড়ে তার যে জীবন তাতে মা তো নেই!

—অবস্থা কেমন বললি?

—ভালো নয়। অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে। রাত বোধহয় কাটবে না।

বনমালী চাবি এনে দরজা খোলে। চোরের মতো সাবধানে ঢোকে হরিপদ। এইসব বাড়িঘর দেখা তাদের অভ্যাস নেই, দাদা—বউদি নিপ্পর! বলে—কুকুর সামলাও।

—কামড়াবে না, ঘরে আয়। শব্দ সাড়া করিস না, তোর বউদির আবার পাতলা ঘুম।

অন্ধকারেই মাথা নাড়ে হরিপদ—না, না, সেসব আমরা জানি।

ঘরে এসে দুই ভাই অন্ধকারে মুখোমুখি বস। বাতি জ্বালে না বনমালী, মহাজনের মেয়ের ঘুম বড় পাতলা।

—কী হয়েছে?

হরিপদ মাথা নিচু করে বলে—কী আর হবে। বুড়ো হয়েছে! বয়সটাই তো রোগ। যেবার বাবা ফেঁপে—ফুলে মরে গেল, সেই থেকে মা আর মা নেই। তুমি তো অতশত খবর রাখো না। মার বড় টান ছিল তোমার ওপর।

ফিসফিস করে বনমালী জিজ্ঞেস করে—কীরকম টান?

হরিপদ বলে—দেরি কোরো না দাদা, যদি যেতে চাও তো চলো, সাড়ে বারোটায় শেষ ট্রেন। যদি তুমি না যাও, আমাকে ফিরতেই হবে।

বনমালী তবু ওঠে না, একটু চুপ করে থেকে বলে—যাচ্ছি। টানের কথাটা কী যেন বলছিলি!

—মার খুব টান ছিল তোমার ওপর। প্রায়দিনই তালের বড়াটা, নারকোলের নাড়ুটা বানিয়ে কৌটোয় ভরে আমাদের সঙ্গে দিয়ে দিত তোমাকে দেওয়ার জন্য।

—তোর কখনো দিসনি তো!

—দেব কি! বউদি রাগারাগি করবে হয়তো, আর সেসব কি এখন আর তোমরা খাও! ভালো ভালো খাবার তোমাদের। আমরা তাই সেসব নিজেরাই লুকিয়ে খেয়ে ফেলতাম। তবু মা মরে মরে তৈরি করত। কতদিন তোমাকে দেখতে চেয়েছে! গত তিন—চার মাস একটানা মা তোমাকে দেখেনি। দাদা, ওঠো। বেশি সময় নেই।

—উঠি। বলে একটা শ্বাস ছাড়ে বনমালী।

—উঃ দাদা, কী পেল্লায় বাড়িখানা বানিয়েছো, কী বাগান!

বনমালী ধমক দেয়—আস্তে। তোর বউদি উঠে পড়বে। শব্দ করিস না।

হরিপদ মিইয়ে যায়। ফিসফিস করে বলে—প্রত্যয় হয় না।

—কী?

—এসব যে তোমার!

—আমারও হয় না। বলে বনমালী অন্ধকারেই কাপড় বদলাতে বদলাতে বলে—হরিপদ—

—উঁ।

—তোর বউদি জেগে যাবে, এইটাই ভয়। নইলে।

—নইলে কী?

বনমালী আবার একটা শ্বাস ছেড়ে বলে—নইলে আমি একটু কাঁদতুম। আমার বড় কাঁদতে ইচ্ছে করছে রে।

# জ্যোৎস্নায়

বিলেত থেকে মোট দেড়খানা চিঠি লিখতে পেরেছিল লেবু। আর সময় পায়নি। মদ সেখানে বেজায় সস্তা, আর ভারী ভালো। অফিসের সময়টুকু বাদ রেখে বাদবাকি সময় লেবু লন্ডনের নালায় নর্দমায় পড়ে থাকে, সাহেবেরা বড্ড বিপদে আছে তাকে নিয়ে।

এ খবর জানিয়েছে ডাক্তারের ভাইঝি—জামাই নৃপেন, তার কাছেই থাকে লেবু! থাকে মানে ওই আর কি—থাকার কথা, আসলে তো থাকে ফুটপাথেই।

চিঠি পেয়ে ভারী রেগে যায় ডাক্তার। রুগিভরা চেম্বার ছেড়েই উঠে আসে ভিতর বাড়িতে, দুই বউকে ডেকে হেঁকে বলে—এই দেখ তোমাদের দেওরের কাণ্ডটা দেখ। বলে নৃপেনের লেখা এয়ারোগ্রামখানা তাদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে আবার গোঁ গোঁ করতে করতে চেম্বারে গিয়ে ঢোকে।

দুই বউ আসলে দু—বোন। বড়টি সোনালি। বাঁজা। বিয়ের দশ বছর তক বাচ্চা না হওয়ায় স্বামীর পায়ে মাথা খুঁড়ে নিজের ছোট বোন রুপালিকে বিয়ে করিয়েছে। ভারী ভাব দুই বোনে, সতীনের কোঁদল নেই। রুপালি দুটো ছেলেমেয়ের মা। সোনালি বাচ্চাগুলো নিয়ে সারাদিন পড়ে থাকে। রূপালি হুটোপাটা করে কাজ সারে, গান গায়, সিনেমায় যায়। বাচ্চাদের সঙ্গে তেমন সম্পর্কই নেই। তাতে সোনালিই বেশি খুশি। বাচ্চার কথা বলতে শিখতেই সে তাদের নিজেকে মা আর রূপালিকে ছোট মা ডাকতে শিখিয়েছে।

এয়ারোগ্রামখানা দুই বোনে পড়ে। লেবু সোনালির চেয়ে বয়সে ছোট, রূপালির চেয়ে বড়। সোনালি দেওরের জন্য চিন্তায় পড়ে। রূপালি গালে হাত দিয়ে বলে—ওমা! বিলাতেও নালা—নর্দমা আছে! বলে সে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে নিজের কাজে উঠে যায়।

পেটের রোগে ডাক্তারের খুব হাতযশ। একটা খয়েরি রঙের ক্বাথ—মতো ওষুধ দেয়, তাতেই খিদে বেড়ে রোগীরা চাঙ্গা হয়ে ওঠে। অনেকের সন্দেহ ডাক্তারের ওষুধে আপিঙ মেশানো আছে। তা হোক, চেম্বার তবু খালি যায় না। ইচ্ছে করলে আরও দুটো বউ মেনটেন করতে পারে।

'ব্লাডি ড্রাঙ্কার্ড' বিড়বিড় করে এই কথা বলে আবার চেম্বারে ঢোকে ডাক্তার। ভ্রূ কোঁচকানো, মুখ গম্ভীর। এমনিতে ডাক্তার ভারী হাসিখুশি গোলগাল শান্ত মানুষটি। গম্ভীর হলে থলথলে গাল দুটো কাঁপে, ঠোঁট নড়ে, তখন তাকে দেখলে হাসি সামলানো দায়। বিলেতটা সিভিলাইজড দেশ, সেখানে কত রকম গাড়ি—ঘোড়া চলে, আর সেখানে ল্যাবাবাবু রাস্তায়—ঘাটে পড়ে থাকে, অ্যাকসিডেন্ট হতে কতক্ষণ! তা ছাড়া দেশের প্রেস্টিজ বলেও একটা কথা আছে। সাহেবরা বাঙালিকে ভাববে কী? পুরো সকালটাই ডাক্তার গম্ভীর থাকে, গাল কাঁপে, ঠোঁট নড়ে।

বেলা এগারোটায় কল—এ বেরিয়ে চৌমাথায় হাতকাটা হরেণ পাঁড়ুইকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লঝঝরে মোটর সাইকেলখানা থামায় ডাক্তার।

—হরেন, ব্ল্যাকিটার খবর জানিস?

ব্ল্যাকি বা ডার্টি নিগার, ব্লাডি ড্রাঙ্কার্ড কিংবা শুধু ল্যাবা একজনেরই নাম, ডাক্তারের দেওয়া। লোকটা লেবু।

—কী খবর দাদা? লেবু খুব টানছে?

—টানবে সে তো জানা কথা। বংশের ধাত। কিন্তু নিগারটা যে কাছা আলগা দিয়ে গিলছে প্রেস্টিজ রাখল না।

—টানতেই তো গেছে।

—সাহেব সুবোরা এদেশে এসে মাতাল হয়, কখনো দেখেছিস? ডার্টি নিগারগুলোই ওদেশে গিয়ে মদ আর ইয়ের নামে হামলে পড়ে।

—সাহেব আর দেখলাম কোথায় দাদা! যখন আমাদের চোখ ফুটেছে, ততদিনে তোমরা যে দেশ থেকে সাহেব ফরসা করে দিয়েছো।

একটু খুশি হয় ডাক্তার। সে নিজে ঠিক স্বদেশি ছিল না বটে, কিন্তু একবার বিয়াল্লিশে পুলিশের সামনে বন্দেমাতরম বলে চেঁচিয়েছিল বলে তাকে পুলিশ দরে নিয়ে যায়, পরদিন আদালতে কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আটকে রেখে ছেড়ে দেয়। সেই থেকে স্বদেশি বলে তার খুব নামডাক। তাম্রপত্র পাওয়ার কথাও উঠেছিল। পায়নি শেষপর্যন্ত।

—সাহেব তাড়িয়েই খারাপ হল দেখছি। তারা থাকলে অন্তত তোরা সাহেবি মাতলামিটা শিখতে পারতিস।

—লেবুও শিখে নেবে, সদ্য গেছে তো। ভেবো না।

একটু দুঃখের সঙ্গে ডাক্তার বলে—সে সব সাহেব কি আছে আর? এখন শুনি তারা সব কেওন করে, উলিঝুলি পোশাক পরে ভিখিরির মতো ঘোরে। যত সব ন্যাকড়া। কলকাতায় যে—সব সাহেব আসে... হুঁঃ। বলে মোটর সাইকেল চালিয়ে দেয় ডাক্তার।

বিকেলে ডাক্তার ঘুড়ি ওড়ায়। শরতের আকাশ দেখলে ডাক্তার আর থাকতে পারে না। উপরন্তু লেবুর জন্য দুশ্চিন্তা তো আছেই। দুশ্চিন্তা কি একটা? বেলুর রেশনকার্ড থেকে এখনো রেশন তোলা হচ্ছে। ডাক্তার বারুণ করেছিল, কিন্তু বড় বউটা বড্ড টিকরমবাজ, বলে—সবাইর ঘরেই দু—চারখানা বাড়তি কার্ড থাকে। অন্যায়টা কী শুনি! এ এক দুশ্চিন্তা ডাক্তারের। তার ওপর আপিঙের ব্যাপারটা খুব চাউর হয়ে গেছে। সেটা আর একটা পৃষ্ঠব্রণ। ঘুড়ি ওড়ালে মনটাও ওড়ে। বিকেলবেলাটায় গোটা পাঁচেক ঘুড়ি কেটে ডাক্তারের মন ভালো হয়ে গেল।

সন্ধের মুখে জটা এল। গায়ে র‍্যাপার। বিস্তর ভাইনাম গ্যালেসিয়া ফাঁক করেছে ডাক্তারের। আবারও চায় বুঝি, ভেবে মনে মনে আঁতকে উঠেছিল ডাক্তার। পাড়ার মস্তানদের সর্দার—পোড়ো, আপিঙের ব্যাপার কিংবা রেশনকার্ডের খবর সবই রাখে।

—কী ব্যাপার রে?

—মুরগি আনাও দাদা।

—কেন?

—কাল দুপুরের লোকালে কেষ্টনগরে ফ্লাই করছিলুম, আজ সকালে এসে ল্যান্ড করছি আবার। এক ওস্তাদ কেষ্টনগরে মৌড়ি থেকে মাল তৈরি করেছে। এক বোতল এনেছি তোমার জন্যই।

বলে র‍্যাপারের তলা থেকে একটা মস্ত বোতল বের করে। ডাক্তার ভারি খুশি হয়ে পড়ে। বোতলের মুখ খুলে শুঁকে বলে—দিব্যি গন্ধ ছাড়ছে রে!

—মিঠে মাল দাদা। গোলপী নেশা লেগে যায়। মাইরি, মুরগি আনাও।

ডাক্তার গম্ভীর হয়ে বলে—মাল ফাল আর ছুঁতে ইচ্ছে করে না। ল্যাবাটা ঘেন্না ধরিয়ে দিলে।

—সবই শুনেছি দাদা, লেবুটা তেমাদের ঘরানা পায়নি। তোমার বাপ—দাদারা মাল খেত, আমার বাপ—দাদার কাছে শুনেছি। তারা কিছু কম খানেওয়ালা ছিল না। তারা মাল খেয়ে রাজ—উজির সাজত, মুখে হাতি—ঘোড়া মারত, কু—বাক্যি বলা কি মারধর করা তাদের ধাতে ছিল না, রাস্তায় গড়ানো মাতালকে তারা ঘেন্না করেছে। কিন্তু লেবুটা? ছিঃ ছিঃ।

বংশ গৌরবে ডাক্তারের চোখ চিকচিক করছিল। একদৃষ্টে জটার মুখের দিকে চেয়ে কথাগুলো পান করল সে। তারপর নিশ্বাস ছেড়ে বলল—বাবাকে দেখেছি, চুরচুরে মাতাল অবস্থায় ঘোড়ার গাড়ি থেকে নামছেন। পাদানিতে পা ফেলেছেন ঠিকমতো, কোঁচানো ধুতি এদিক ওদিক হয়নি, সিল্কের পাঞ্জাবির পাট নষ্ট হয়নি,

কাঁধে চাদরের পাটটি পর্যন্ত ঠিকঠাক আছে। দুটো চাকর গিয়ে দু—বগলে কাঁধ দিয়ে দোতলায় পৌঁছে দিয়ে যেত। মাথা উঁচু করে চলা—ফেরাটা মাতাল অবস্থাতেও বজায় রেখেছিলেন। আর তাঁর ছেলে লেবুর মুখে কতবার রাস্তার কুকুর ইয়ে করে দিয়ে গেছে। কার ছেলে কোথায় নেমেছে দ্যাখ।

মুরগি এসে গেল। ফোঁড়া কাটার ছুরিটা বের করে ডাক্তার তার সাবেক কালের বাড়ির উঠোনে গিয়ে জোড়া মুরগি নিয়ে বসে। ছাড়াবে। উড়ুক্কু মাছের গল্প পড়তে পড়তে উঠে এল মেয়েটা, ছেলেটা বাতাসের মুখে খবর পেয়ে খেলা ছেড়ে দৌড়ে আসে। বড়—বউ সোনালি এসে সাবধান করে—পেটে ডিম থাকলে মেরো না কিন্তু।

ডাক্তার লাল—চোখে চায়। আধ বোতল মৌড়ির মাল ফাঁক হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। পান—জর্দা—অ্যালকোহলের গন্ধ ছেড়ে ডাক্তার বলে—পেটের ভিতরকার ডিম আনফার্টিলাইজড, খেলে শরীরে টক্সিন ডিপোজিট কম হয়। যা জানো না, তা নিয়ে কথা বলা কেন?

—তুমি বাপু বড্ড নির্দয় মানুষ। বলে বড়—বউ সরে যায়।

মেয়েটা ওই রকম ডিম ভালোবাসে। ডাক্তার একটা মুরগির পেট থেকে সাবধানে দুর্লভ ডিমসুদ্ধ থলি বের করে। মেয়েটা আনন্দে চেঁচায়।

জটা পাড়ায় খবরটা ছড়িয়েই এসেছিল। মুরগি কষা হতে—না—হতে পাড়ার মস্তান—মুরুব্বি দু—চারজন এসে গেল। মৌড়ির মাল ততক্ষণে ফরসা। অগত্যা ডাক্তার তার নিজের স্টক বের করে। দুর্লভ জিনিস বিলেত থেকে দেড়খানার বেশি চিঠি পাঠায়নি লেবু, কিন্তু চার—পাঁচ কিস্তিতে কয়েকজন ঘরে—ফেরা বাঙালির সঙ্গে পাঠিয়েছে স্কচ হুইস্কি, রাম, এক বোতল শ্যাম্পেন। লোকে কলম, রেডিও, ঘড়ি পাঠায়, লেবু সে—সবের ধার দিয়েও যায়নি। ল্যাবাটার দূরদৃষ্টি খুব। সমঝদার ছেলে।

মাইফেলটা জমে গেল খুব। জটা আর তার সাকরেদরা বিদায় নিল ইংরিজি তারিখ পেরিয়ে। সামনের মহল থেকে ভিতর মহল পর্যন্ত দোতলায় একটা ঝুলবারান্দা আছে, অনেকটা পোলের মতো। সেটা ধরে ভিতর মহলে ফিরবার সময়ে ডাক্তার দেখে, ভারী ভালো জ্যোৎস্নায় মাখামাখি হয়ে আছে বারান্দাটা। রেলিঙের ছায়ায় নানা নকশা। তারই মধ্যে ডাক্তারের ছায়াটা টলতে টলতে যাচ্ছে। ভারী লজ্জা পায় ডাক্তার। জিভ কাটে। ধমক মারে—'অ্যাও!' ছায়াটা ভয় পেয়ে স্টেডি হয়ে যায়। রেলিঙে ভর রেখে সাবধানে হাঁটে ডাক্তার। ছায়াটা না টলে আবার।

# হ্যাঁ

অধ্যাপক ঢোলাকিয়া অবশেষে এক জানুয়ারির শীতার্ত রাতে তার টেবিল ছেড়ে উঠল। টেবিলের ওপর অজস্র কাগজপত্র ছড়ানো, তাতে বিস্তর আঁকিবুকি এবং অসংখ্য অঙ্ক। এই অঙ্ক ও আঁকিবুকির সমুদ্র থেকে একটি মাত্র কাগজ তুলে নিল ঢোলাকিয়া, ভাঁজ করে কোটের বুক—পকেটে রাখল। গত সাতদিন ঢোলাকিয়া জীবন—রক্ষার্থে সামান্য আহার্য গ্রহণ করা ছাড়া ভালো করে খায়নি, ভালো করে ঘুমোয়নি, বিশ্রাম নেয়নি। এখন সে একটু অবসন্ন বোধ করছিল, কিন্তু মনটা খুশি ভরা। মনে হচ্ছে সে কৌশলটা আবিষ্কার করতে পেরেছে।

ঢোলাকিয়াকে লোকে বলে অযান্ত্রিক মানুষ। এই কম্পিউটার এবং ক্যালকুলেটরের যুগে ঢোলাকিয়া পড়ে আছে দেড়শো বছর পিছনে। সে এখনও কাগজে কলম দিয়ে আঁক কষে, রেখাচিত্র আঁকে। পৃথিবীর যত শক্ত অঙ্ক আর রেখাচিত্র, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাবনিকাশ যখন যন্ত্রই করে দিচ্ছে তখন মানুষ কেন অযথা পরিশ্রম করবে? ঢোলাকিয়ার বক্তব্য হল, অঙ্ক আমার কাছে আর্ট, লাইন ড্রয়িং—এ আমি সৃষ্টিশীলতার আনন্দ পাই। যন্ত্র তো মানুষের মস্তিষ্কেরই নকল। যন্ত্র আর্ট বোঝে না, সৃষ্টিশীলতাও তার নেই। প্রোগ্রাম করা যান্ত্রিকতা আমার পথ নয়।

ঢোলাকিয়ার মতো আরও কিছু মানুষও আজকাল কম্পিউটারের চেয়ে কাগজ কলম বেশি পছন্দ করে। সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হলেও এ ধরনের কিছু মানুষের ইদানীং যে উদ্ভব হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। ঢোলাকিয়া তার বাড়িটাকে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে সাজায়নি। আজকাল বোতাম টিপলেই ঘরের আকার ও আকৃতি বদলে নেওয়া যায়। কম্পিউটারে নানারকম নকশা দেওয়াই থাকে। সে সব নকশার নম্বর ধরে বিভিন্ন বোতামের সাহায্যে ওপর থেকে বা আড়াআড়ি নানা ধরনের হালকা ভাঁজ করা দেওয়াল এসে ঘরকে বদলে দিতে পারে। আছে বাতাসি পরদা, যা দিয়ে বাইরের পোকামাকড় বা বৃষ্টির ছাঁট বা ঝোড়ো হাওয়া রুখে দেওয়া যায়—জানালা বা দরজায় কপাটের দরকার হয় না। বাতাসি পরদাকে অস্বচ্ছ করে দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে। জানালা দরজার প্যানেলে সরু সরু ছিদ্র দিয়ে প্রবল বায়ুর প্রবাহই হচ্ছে বাতাসি পরদা। ঢোলাকিয়া তার বাড়িটাকে শীততাপ নিয়ন্ত্রিতও করেনি। ঠাকুরদার আমলের পুরোনো ঘরানার বাড়িতে সে যেন বিংশ শতাব্দীকে ধরে রেখেছে।

ঢোলাকিয়া আজ কিছু চঞ্চল, উন্মন। সে তার স্টাডি থেকে বেরিয়ে বাড়ির বিভিন্ন ঘরে উদ্ভ্রান্তের মতো কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াল। নিজেকে শান্ত করা দরকার। বেশি আনন্দ বা বেশি দুঃখ কোনোটাই ভালো নয়।

ঢেলাকিয়ার বাড়িতে জনমনিষ্যি নেই। এমন কি কুকুর বেড়ালটা অবধি নয়। ঢোলাকিয়া বিয়ে করেনি, মা—বাবা তাকে গাঁয়ের বাড়িতে। ঢোলাকিয়াকে সবাই অসামাজিক মানুষ বলেই মনে করে। আসলে সামাজিক হতে গেলে কাজকর্ম, ভাবনাচিন্তা এবং গবেষণার সময় অত্যন্ত কম পাওয়া যায়। সে একাই বেশ থাকে। অবশ্য সে জানে, একা বেশি দিন থাকা চলবে না। এই সোনালি দিনের আয়ু বেশি নয়। কারণ রাষ্ট্রব্যবস্থার নিয়ম অনুযায়ী বিয়ে করাটা বাধ্যতামূলক। এবং সন্তান উৎপাদনও। দু—হাজার তিরিশ সাল থেকে পরবর্তী দশ বছরের মধ্যে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, দুরারোগ্য ক্যানসার আর এইডস, মারাত্মক ভূমিকম্প, বিশ্বযুদ্ধ ও ঘূর্ণিবাত্যায় পৃথিবীতে বিপুল লোকক্ষয়ের পরিণামে এখন জনসংখ্যা বিপজ্জনকভাবে কম। সারা ভারতবর্ষে জনসংখ্যা এখন এক কোটি তিপান্ন লক্ষ মাত্র। এবং ভারতের জনসংখ্যাই পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম। চীনে আড়াই কোটি মানুষ বেঁচে—বর্তে আছে। গোটা ইউরোপে আছে দু—কোটির সামান্য বেশি। আমেরিকায় মোট পঞ্চান্ন লক্ষ। আফ্রিকায় তিন কোটি দশ লক্ষ। বিপদের কথা হল, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি বাড়ছে

না। বরং কমছে। ফলে কাউকেই অবিবাহিত থাকতে দেওয়া হয় না। সন্তান উৎপাদনও করতেই হবে। কিন্তু অরুণ ঢোলাকিয়ার দুশ্চিন্তাই হল বিবাহিতজীবন। একটা মেয়ের সঙ্গে বাস করতে হবে, তার ওপর ছেলেপুলের চ্যাঁ ভ্যাঁ—এসব কি সহ্য হবে তার?

একটা কুশনের ওপর বসে কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হল সে। মনকে শান্ত ও সজীব রাখার এটাই প্রকৃষ্ট উপায়।

স্যাটেলাইট টেলিফোনটা সংকেত দিল। পকেট থেকে ফোনটা বের করে অরুণ ঢোলাকিয়া বলল, বলুন।

ক্রীড়া দফতর থেকে অবিনশ্বর সেন বলছি।

আপনার কাজ কি শেষ হয়েছে?

হ্যাঁ, আমি প্রস্তুত।

ভালো কথা। কিন্তু এখনও আপনার বিপক্ষ গোষ্ঠী ব্যাপারটা মানতে চাইছে না।

তারা কি বারবার একটা আপত্তিই জানাচ্ছেন? না কি নতুন কোনো পয়েন্ট বের করেছেন?

না, নতুন পয়েন্ট নয়। তারা সেই পুরনো কথাই আরও জোর দিয়ে বলেছেন, কোনও অ—খেলোয়াড়কে দলভুক্ত করা যায় না।

আমি তো বলেইছি, আমি খেলোয়াড় নই বটে, কিন্তু আমি একজন বিশেষজ্ঞ। আমার পারফরম্যান্স হবে সম্পূর্ণ ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশনের ওপর।

ওদের ওখানেই আপত্তি। চূড়ান্ত দলে আপনাকে জায়গা দিতে হলে একজন দক্ষ খেলোয়াড়কে বাদ দিতে হয়। যেক্ষেত্রে আমরা চাপে থাকব।

সেনবাবু, আপনাদের মানসিকতা পিছিয়ে আছে। এমন একদিন আসতে বাধ্য যখন খেলোয়াড় এবং বিশেষজ্ঞ এ দুটোই দরকার হবে। একথা ঠিক যে আমি ক্রিকেট খুব বেশি বুঝি না, ব্যাট করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু তবু আমি যা করতে পারি তা আপনাদের টিমে কেউ পারবে না।

সেটাও পরীক্ষাসাপেক্ষ। আপনি ডেমনস্ট্রেশন দিতে পারবেন?

আপনারা অর্থাৎ নির্বাচকমণ্ডলীর সবাই যদি উপস্থিতি থাকেন তবে আগামীকালই আমি যেমনস্ট্রেশন দিতে পারি। কিন্তু দোহাই, একবারের বেশি দুবার পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়।

কেন?

আমার কলাকৌশল বেশি লোকের কাছে এক্সপোজ করা ঠিক হবে না। আমি কৌশলটা একেবারে বিশ্বকালের আসরেই প্রয়োগ করতে চাই।

খুব মুশকিলে ফেললেন।

আর একটা কথা।

কী?

আমার অ্যাকশনের কোনো ভিডিও তোলা চলবে না। কোনো ক্যামেরা বা রেকর্ডারও নয়।

আপনি বড্ড বেশি দাবি করছেন।

করছি, কারণ আমি একাই ভারতকে বিশ্বকাপ জিতিয়ে দেব বলে মনে করছি।

নির্বাচকরা এটাই মানতে চাইছেন না। যাই হোক, আপনি কাল সকাল দশটায় ক্রীড়াকেন্দ্রে চলে আসুন।

ফোনটা পকেটে রেখে অরুণ ঢোলাকিয়া উঠে পড়ল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে নির্জন রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল। কলকাতা শহরে আজকাল মাত্র বত্রিশ হাজার লোক বাস করে। এক সময়ে এখানে এক কোটি মানুষ বাস করত। তখন শহরটা ছিল ঘিঞ্জি, নোংরা, ভিড়াক্কার, এখন শহর গাছপালায় ভরতি। চওড়া রাস্তার দুধারে বড় বড় গাছের সারি, প্রচুর বাগান, পার্ক, জলাশয়। এসবেরই ফাঁকে ফাঁকে অনেক দূরে দূরে একখানা করে বাড়ি।

এবার প্রচণ্ড শীত পড়েছে। গতকালও দু—ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল। অরুণ ঢোলাকিয়ার গায়ে পশমের জামা আছে, তা সত্ত্বেও তার শীত করছিল। একটু হাঁটাচলা না করলে মাথার জটটা খুলবে না।

মাইলখানেক হাঁটল অরুণ, একজন মানুষের সঙ্গেও দেখা হল না। শুধু দুটো ওভারক্র্যাফট নিঃশব্দে রাস্তা দিয়ে গেল।

আঞ্চলিক বাজার নামে কথিত একটা করে বহুমুখী কেন্দ্র শহরের বিবিন্ন জায়গায় তৈরি হয়েছে। এগুলো আসলে বাজার, ক্লাব, রেস্তোরাঁ ইত্যাদির সমাবেশ।

ঢুকতেই একটা হলঘর। মাঝখানে বিশাল এক ফোয়ারা। তার চারপাশে চমৎকার বসার জায়গা। দুঃখের বিষয় বসবার লোক নেই। হলঘরের মধ্যে রয়েছে বিস্তর গাছপালা এবং সবুজ লনও। ছাদটা স্বচ্ছ আবরণে তৈরি বলে এই ঘরে সূর্যের আলো আসতে পারে। হলঘরের চারদিকে ছোট ছোট থিয়েটার এবং ভিডিও হল। টিকিট কাটতে হয় না, থিয়েটার এমনিই দেখা যায়। তবে নাটক করার মতো দল বেশি নেই বলে থিয়েটারগুলো বেশিরভাগই অচল থাকে। ভিডিও হল—এও লোক হয় না।

স্বয়ংক্রিয় সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় চলে এল অরুণ ঢোলাকিয়া। এখানে কিছু রেস্তোরাঁ এবং দোকানপাট। কিছু মানুষজন দেখা যাচ্ছে। তবু খুবই ফাঁকা। এখানেই লোকটার আসার কথা।

অরুণ চারদিকে চেয়ে সবুজদ্বীপ রেস্তোরাঁয় গিয়ে ঢুকল। খুবই ছোট রেস্তোরাঁ। সব মিলিয়ে দশটা টেবিল পাতা আছে। খুবই কম আলোয় দেখা গেল খদ্দের নেই বললেই হয়। একটা টেবিলে চারজনের একটি পরিবার বসে খাচ্ছে। স্বামী—স্ত্রী এবং দুটি বাচ্চা। আর কোণের দিকে একজন লোক চুপচাপ বসে আছে।

ঢোলাকিয়া সেদিকেই এগিয়ে গেল।

নমস্কার।

লোকটা মুখ তুলে একটু হাসল, বোসো ঢোলাকিয়া।

সে বলল, কী খাওয়া যায় বলো তো?

যা খুশি। তবে আমি নিরামিষাশী।

সে তো আমিও। ভেজিটেরিয়ানদের সংখ্যাই তো বেশি।

নুডলসের অর্ডার দিয়ে লোকটি পকেট থেকে একটা ক্ষুদে টেলিভিশন সেট বের করে ঢোলাকিয়ার হাতে দিয়ে বলল, ওতে চার মিনিটের একটা কভারেজ আছে। দেখে নাও।

ছোট টিভি সেটটার মধ্যেই ভিডিও টেপ রয়েছে। ঢোলাকিয়া সেটটা অন করল। একটা ক্রিকেট মাঠ একজন ব্যাটসম্যান দাঁড়িয়ে। একজন বল করতে দৌড়চ্ছে। বল করল, পিচ পড়ে বলটা নিচু হয়ে গেল. খুব নিচু। ব্যাটসম্যান সেটাকে আটকে দিল। দ্বিতীয় বলটা নিচু হল না, কিন্তু অফ স্টাম্পে পড়ে বাঁই করে ঘুরে স্টাম্পের দিকে এল। ব্যাটসম্যান বিপজ্জনক বলটাকে ফের আটকাল। দেখতে দেখতে ঢোলাকিয়া বলল, এ বল—এ আজকাল খেলা হয় না।

জানি। নতুন নোবা বলে ক্রিসক্রস সেলাই থাকে।

হ্যাঁ।

তুমি যে পরীক্ষানিরীক্ষা করতে চাইছ তাতে নোভা বল হয়তো সাহায্য করবে। কিন্তু মনে রেখো পঞ্চাশ বছর আগে পুরোনো ক্যাট বলেও এরকম সেলাই থাকত।

জানি। আমার কাছে পুরোনো সব রকম বলেরই নমুনা আছে।

পরের বলটা—আশ্চর্যের বিষয়—পিচে পড়েই সম্পূর্ণ গড়িয়ে স্টাম্পের দিকে গেল। ব্যাটসম্যান আটকাতে পারল না। বোল্ড।

লোকটা একটু হেসে বলল, দেখলে?

ঢোলাকিয়া মাথা নেড়ে বলল দেখলাম, আপনি চল্লিশ বছর আগে শুটারস দিতেন।

হ্যাঁ, সারা পৃথিবীতে আমিই একমাত্র শুটারস আর লুপ বল করতে পারতাম। তবে ছ—টা বলের মধ্যে একটা দুটো বা তারও কম। ডেলিভারির ওপর কন্ট্রোল সহজে আসে না। কঠোর অনুশীলন দরকার,

কেরিয়ারের শেষ দিকে আমি কৌশলটা খানিক রপ্ত করতে পেরেছিলাম, কিন্তু পুরোটা নয়। আজ অবধি কৌশলটা কাউকে শেখাইনি।

ঢোলাকিয়া কিছুক্ষণ নিঃশব্দে খাবার খেয়ে গেল, তারপর বলল, কাল ওরা আমার পরীক্ষা নেবে।

লোকটা একটু হাসল, মুখ না তুলেই বলল, ঈশ্বর তোমার সহায় হোন। যদি ওরা তোমাকে টিমে নেয় তাহলে এই প্রথম একজন নন—ক্রিকেটার টিমে ঢুকবে।

হ্যাঁ, আমি ওদের বুঝিয়েছি যে, আমি ক্রিকেটার না হলেও একজন বিশেষজ্ঞ।

লোকটা সকৌতুকে একটু চেয়ে মাথা নাড়ল।

খাওয়া শেষ করে লোকটা বলল, এবার চল, হাতেকলমে ব্যাপারটা দেখা যাক।

বাইরে পার্কিং লটে লোকটার ছোট হেলি—কারে এসে উঠল তারা। এ গাড়ি মাটি দিয়ে চলে না, হুশ করে হায়োয় ভেসে পড়ে। দ্রুত গতি, ব্যাটারি চালিত মোটর পাখির ডানার মতো দুটি ফ্লোটারকে চালু রাখে, পাখির মতোই স্বচ্ছন্দে ওড়ে এই গাড়ি। দশ মিনিটের মধ্যেই তারা নিরিবিলি শহরতলির একটা উজ্জ্বল আলোয় সজ্জিত মাঠে এসে নামল। মাঠের মাঝখানে বাইশ গজে ক্রিকেট পিচ। চারদিক আলোর স্তম্ভ জায়গাটাকে দিনের অধিক আলোকিত করে রেখেছে।

লোকটা অনুচ্চ স্বরে ডাকল, রজনী?

মাঠের ধারে একটা ছোট তাঁবুর ভিতর থেকে একটি কিশোরী মেয়ে ঘুমচোখে বেরিয়ে এসে হাই তুলল।

লোকটা বলল, আমার ছোট মেয়ে রজনী। ও যদি ছেলে হত তবে ওকে আমার সব বিদ্যে শেখাতাম। আমার ছেলে নেই, চারটিই মেয়ে।

মেয়েরাও তো ক্রিকেট খেলে।

খেলে, আমার মেয়েরা ক্রিকেটে আগ্রহী নয়। মেয়েটা পিচের এক ধারে নিঃশব্দে তিনটে স্ট্যাম্প পুঁতে দিয়ে সরে দাঁড়াল, তারপর বলল, ইনিই কি তিনি?

লোকটা বলল, হ্যাঁ, আমাদের তুরুপের তাস, এসো ঢোলাকিয়া, বল করো।

রজনী একটা ব্যাগ থেকে সাদা রঙের একটা বল বের করে অরুণ ঢোলাকিয়ার দিকে ছুঁড়ে দিল, এই সেই বিতর্কিত বল নোভা, বলটাকে যদি পৃথিবী হিসেবে ধরা যায় তাহলে এর একটা সেলাই গেছে বিষুব রেখা বরাবর, অন্যটা দুই মেরু ভেদ করে, বলের দু—পিঠে এক জায়গায় সেলাই দুটো কাটাকাটি করেছে, আর এই দুটো জায়গাই অরুণের কাছে গুরুত্বপূর্ণ, বলটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিল অরুণ। নজরে পড়ল দুটো সেলাই যেখানে কাটাকাটি করেছে যেখানে হালকা পেনসিল দিয়ে চারটি অক্ষর—ডি ও এন টি, ভ্রূ কুঁচকে ঢোলাকিয়া একটু ভাবল, এর মানে কি ডোন্ট? সে মেয়েটার দিকে এক ঝলক তাকাল, মেয়েটা খুব বিরক্তি মাখানো মুখে অন্য দিকে চেয়ে আছে।

বৃদ্ধ রামনাথ রাই তার দিকে মিটমিটে চোখে লক্ষ রাখছে। রামনাথ ষাট সত্তরের দশকে ভারতীয় একাদশে খেলেছিল। তার রেকর্ড তেমন ভালো কিছু নয়, কিন্তু অরুণের মাথায় আইডিয়াটা ঢুকিয়েছিল এই লোকটাই, অঙ্কের জগতে অরুণ ঢোলাকিয়ার খ্যাতি সাঙ্ঘাতিক। বিশেষ করে জ্যামিতিক এবং ত্রিকোণমিতিক গণনায় সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তার রৈখিক গণনা, বিচার ও বিশ্লেষণ পৃথিবীর যে কোনো বিষয়েই গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বৃদ্ধ রামনাথ একদিন তার দ্বারস্থ হয়ে বলল, বাপুক্রিকেটের জন্য তুমি কিছু করো।

সেই সূত্রপাত, রামনাথই তাকে ক্রিকেট বুঝিয়েছিল এবং আগ্রহী করে তুলেছিল। মাস তিনেক ধরে সে নোভা বল নিয়ে মেতে আছে। আজ নিজের সাফল্য সম্পর্কে সে ঘোর আত্মবিশ্বাসী। ভারতীয় নির্বাচকমণ্ডলী তার মতো নামী লোকের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে পারছে না, তাকে হয়তো দলে নেওয়াও হবে। এর জন্য বৃদ্ধ রামনাথের কাছে সে কৃতজ্ঞ। কিন্তু মুশকিল হল বলের গায়ে 'ডোন্ট' কথাটা লিখে রজনী কী বোঝাতে চাইছে? তাহলে কি মাঠের আশেপাশে বা ঊর্ধ্বাকাশে গুপ্তচর রয়েছে? তার বোলিং অ্যাকশন কি রেকর্ড করা হবে?

অরুণ ঢোলাকিয়া ফুটফুটে মেয়েটার দিকে বারবার তাকাল, কিন্তু মেয়েটা একবারও তার দিকে তাকাল না। উদাসীন মুখে ঘাসের ওপর বসে নিজের নখ দেখছে এখন।

ঢোলাকিয়া বিদ্যুদবেগে চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিল। বৃদ্ধ রামনাথকে বিশ্বাস করা ঠিক হবে না।

সুতরাং অরুণ যে ছ—টা বল করল তার একটাও গড়িয়ে গেল না। একটাও লুপ হল না।

উত্তেজিত রামনাথ মাথা নেড়ে বলল, পিচ জায়গা মতো পড়ছে না।

তাই তো দেখছি, মনে হচ্ছে শুটার বা লুপ আমাদের কাগজে কলমেই থেকে যাবে।

রামনাথ রাই প্রচণ্ড হতাশ দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, তাহলে তোমার পরিশ্রম বৃথাই গেল?

তাই মনে হচ্ছে।

আবার চেষ্টা করে দেখ, নোভা বলের ভিতরে এক ধরনের সিনথেটিক আঠা থাকে। তার ফলে বলটা ক্যাট বলের চেয়ে একটু বেশি লাফায়। মুশকিল কি সেখানেই হচ্ছে?

ঢোলাকিয়া জানে, সেটা সমস্যা নয়। সমস্যা রামনাথ নিজেই। অরুণ সেটা রামনাথকে বলে কি করে?

তবে সে আরও এক ওভার বল করল, ইচ্ছে করে? প্রথম পাঁচটা বল করল বিশ্রীভাবে। কিন্তু ষষ্ঠ বলটা করল তার ক্ষুরধার ক্যালকুলেশন দিয়ে। বলটা নীচে পড়ে মাটি কামড়ে বুলেটের মতো ছুটে গিয়ে মিডল স্ট্যাম্প ছিটকে দিল।

বাঃ, এই তো হচ্ছে? বলে চেঁচিয়ে উঠল রামনাথ।

রজনী হঠাৎ উঠে তাঁবুর দিকে হাঁটতে লাগল, ঢোলাকিয়া ভাবল সে কোনো মারাত্মক ভুল করে বসল নাকি? তবে বুদ্ধি করে সে ডান হাতের গ্রিপ বাঁ হাত দিয়ে ঢেকে রেখেছিল। এবং শুধু গ্রিপ ছাড়াও অনেক ব্যাপার আছে যা নকল করা সহজ নয়, বিশেষ এক গতিতে, বিশেষ এক কোণ থেকে ডায়াগোনাল রান আপ নিয়ে আসতে হবে। ডেলিভারির সময়ে গোটা হাতেরও একটা বিশেষ কম্পন চাই, এসব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় অনুধাবন ও অনুশীলন সোজা কথা নয়। তবু মনটার খুঁতখুঁতুনি থেকেই গেল।

রামনাথ তাকে আরও বল করার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল, কিন্তু অরুণ রাজি হল না, টেলিফোনে একটা হেলি—ট্যাক্সি ডাকিয়ে এনে বাড়ি ফিরল।

একটু রাতের দিকে ফোনটা এল।

আমি রজনী।

ওঃ, রামনাথবাবুর ছোট্ট মেয়েটা?

হ্যাঁ। আপনি আজ খুব ভুল করেছেন, বলের ওপর আমি লিখে রেখেছিলাম 'ডোন্টা'।

হ্যাঁ, দেখেছি।

তা সত্ত্বেও শেষ বলটা ওরকম করলেন কেন?

না করলে তোমার বাবা হতাশ হতেন।

তাহলেও ক্ষতি ছিল না, আজ মাঠের চারপাশে লোক ছিল, আপনি তাদের দেখেনন, কিন্তু আমি জানি, দক্ষিণ আফ্রিকার বিশেষজ্ঞরা আপনার অ্যাকশনের ছবি তুলে নিয়ে গেছে। আপনি আমার বারণ শুনলেন না কেন?

আমার ভুল হয়েছে। আসলে তুমি একটি বাচ্চা মেয়ে বলে তোমার বারণকে বেশি গুরুত্ব দিইনি।

আমার বয়স চোদ্দো, আজকাল এ বয়সের ছেলেমেয়েরা যথেষ্ট বুদ্ধি রাখে।

কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার বিশেষজ্ঞরা জানল কী করে?

আমার বাবাই জানিয়েছে। চল্লিশ বছর আগে বাবাকে ভারতীয় টিম থেকে অন্যায়ভাবে বাদ দেওয়া হয়। এটা তারই প্রতিশোধ।

কিন্তু উনিই তো আমাকে এ কাজে নামিয়েছিলেন।

হ্যাঁ, কারণ তিনি জানেন, আপনার মতো একজন ধুরন্ধর অঙ্কবিদকে দিয়েই কাজটা সম্ভব। আমার বাবাও একজন ম্যাথমেটিশিয়ান, কৌশলটা আপনাকে দিয়ে আবিষ্কার করিয়ে সেটা অন্য দেশকে বেচে দেওয়ার মতলব ছিল তাঁর।

এখন তাহলে কী হবে?

সেটা আপনিই ঠিক করুন। আর এক মাস পরেই বিশ্বকাপ। দু—হাজার নিরানব্বই সালের সতোরোই ডিসেম্বর। প্রথম ম্যাচেই ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী দক্ষিণ আফ্রিকা, আপনি কত বড় ভুল করেছেন আজ তা বুঝতে পারছেন?

পারছি রজনী, আমার এত দিনের পরিশ্রম বৃথা গেলে আমি খুবই ভেঙে পরব।

এমন মন দিয়ে শুনুন।

বলো।

আপনি আমার বারণ শুনবেন না বলে ধরে নিয়ে আমি একটা কাজ করেছি।

কী কাজ?

পিচের সোজাসুজি যে দুটি বাতিস্তম্ভ ছিল আমরা সে দুটি থেকে বীমার রশ্মি ফেলেছিলাম। যত দূর জানি এই রশ্মি ফেললে ক্যামেরার চোখ ঝলসে যায়, মানুষের চোখে কিছু ধরা পড়ে না।

সত্যি?

হ্যাঁ, আমি এবং আমার বান্ধবীরা বুদ্ধি করে এইটে করেছি। তাতে কতদূর কাজ হবে তা আমরা জানি না। ওদের কাছে হয়তো আরও অত্যাধুনিক ক্যামেরা আছে।

সেটা থাকাই সম্ভব।

আমি যে বলটা আপনাকে দিয়েছিলাম তাতেও একটা সলিউশন মাখানো ছিল। তাতে মুভমেন্টের সময় হাওয়া লাগলে সেলাইগুলো সম্পূর্ণ অদৃশ্য হবে যাবে। জানি না এতে কতটা কাজ হবে। কিন্তু আমরা আমাদের সাধ্যমতো করেছি।

তোমাকে কী বলে ধন্যবাদ দেব?

বিশ্বকাপটা জিতুন, তাহলেই হবে।

বিশ্বাকাপের শুরুতেই সারা পৃথিবীতে তুমুল আলোচনা, ভারত তাদের দলে একজন নন ক্রিকেটার অঙ্কবিদকে খেলাচ্ছে। হাসাহাসি, ঠাট্টা মশকরা, সমালোচনা, প্রতিবাদ সবই হতে লাগল। তার মধ্যেই কলকাতার ইডেন উদ্যানে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে খেলতে নামল ভারত। টসে জিতে ভারতের অধিনায়ক নানক দাশগুপ্ত প্রতিপক্ষকে ব্যাট করতে পাঠাল ঢোলাকিয়ার পরামর্শে।

প্রথম ওভারেই ঢোলাকিয়ার হাতে বল। সারা মাঠ নিশ্চুপ। একজন অঙ্কের অধ্যাপক অক্রিকেটার কী করতে পারে জানার জন্য সমস্ত পৃথিবীই দম বন্ধ করে বসে আছে। অরুণ ঢোলাকিয়া কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে রইল। তারপর শুরু করল দৌড়।

প্রথম বলটা লুপ। স্টাম্পের সোজা পিচ পড়ে বাঁ দিকে বেঁকে গেল, ব্যাটসম্যানের বাড়ানো ব্যাটকে এড়িয়ে ফের ডান দিকে ঘুরল, না, স্টাম্পে লাগল না। একটু উঁচু দিয়ে চলে গেল উইকেটকিপারের হাতে। ঢোলাকিয়া বিরক্ত। ক্যালকুলেশনের সামান্য ভুল।

দ্বিতীয় বলটা আবার লুপ। কিন্তু ধীর গতির ব্যাটসম্যান মরিস বলটাকে তার সিনথেটিক ব্যাট দিয়ে পিটিয়ে দিল কভারে, চার।

আজকাল মাঠে কোনও আম্পায়ার থাকে না। কিন্তু মাঠের চারদিকে অজস্র বৈদ্যুতিন চোখ স্কোরবোর্ড নির্দেশ দিল চারের।

তৃতীয় বলটা করার আগে ফের একটু ধ্যানস্থ হল সে। ধীরে দৌড়ে এসে বল করল। মরিস ব্যাটটা তুলল কিন্তু সময়মতো নামাতে পারল না। মাটি কামড়ে বলটা গিয়ে তার মিডলস্টাম্প উপড়ে দিল, শুটার।

ওভার যখন শেষ হল তখন স্কোরবোর্ড—এ চার রানে চার উইকেট। হ্যাট্রিক সহ। দলের অন্য খেলোয়াড়রা এতদিন অক্রিকেটার ঢোলাকিয়াকে পাত্তা দিচ্ছিল না। কিন্তু ওভার শেষ হলে কেউ কেউ এসে তার পিঠ চাপড়ে গেল।

খেলা অবশ্য বেশিক্ষণ গড়াল না। মোট বাইশ রানে প্রতিপক্ষ অল আউট। ঢোলাকিয়ার ঝুলিতে দশ উইকেট। সতীর্থদের কাঁধে চড়ে প্যাভিলিয়নে ফিরল ঢোলাকিয়া।

দ্বিতীয় ইনিংসের শুরুতেই প্রবল ঝড়বৃষ্টি এসে গেল। তাতে অবশ্য খেলা আটকায় না আজকাল। দুশো মিটার ওপরে অন্য দিক থেকে দশটা পদ্মফুলের পাপড়ির মতো স্বচ্ছ ঢাকনা এসে গোটা মাঠ ঢাকা দিয়ে দিল।

এক ঘণ্টার মধ্যেই ভারত জিতে গেল ম্যাচ। জনতা গর্জন করে উঠল। ঢোলাকিয়া জিন্দাবাদ। সমগ্র পৃথিবী স্তম্ভিত। এ কি আশ্চর্য বোলিং! পরদিন পত্রপত্রিকা আর ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে কেউ কেউ দাবি করল ঢোলাকিয়া চাক করছে, ওকে নো বল ডাকা উচিত।

দ্বিতীয় ম্যাচে ইংল্যান্ড, তৃতীয় ম্যাচে অস্ট্রেলিয়া একে একে উড়ে যেতে লাগল। ফাইন্যালে শোচনীয়ভাবে হারল দুর্ধর্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তারা পনেরো রানে অল আউট।

বিশ্বকাপের উত্তেজনার পর তার নির্জন বাড়িতে ফিরে এল ঢোলাকিয়া। এত উত্তেজনা, এত চেঁচামেচি ও সোরগোল ইত্যাদিতে সে বড় অস্বস্তিতে ছিল। নিরিবিলিতে এসে যে খুব শান্তি পেল। তার কাজ শেষ। পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে তার কলাকৌশল আর গোপন রাখা যাবে না। অন্যেরা কপি করে নেবে। তা নিক, লুপ আর শুটার নিয়ে বিস্তর গবেষণা হবে। বদল করা হবে বল, তাতে আর কিছু আসে যায় না অরুণ ঢোলাকিয়ার, সে তার অঙ্ক নিয়ে থাকবে।

অস্বস্তিটা শুরু হল তৃতীয় দিন থেকে। অধ্যাপক অরুণ ঢোলাকিয়ার খুব একা লাগছে। বড্ড একা, তার সময় কাটতে চাইছে না। প্রচুর অভিনন্দন জানিয়ে লোকে ফোন করছে, উপহার পাঠাচ্ছে, অনেকে চলেও আসছে তাকে দেখতে, পৃথিবী জুড়ে তাকে নিয়ে আলোচনা। এসবই তার কাছে বিরক্তিকর এবং অস্বস্তিকর।

কয়েকদিনের জন্য সে সমুদ্রের ধার থেকে ঘুরে এল। কিন্তু সারাক্ষণ একটা নিঃসঙ্গতা সঙ্গে রয়েছে তার। প্রিয় অঙ্কশাস্ত্রও যেন আলুনি লাগছে আজকাল। কেন এমনটা হচ্ছে? সারাক্ষণ একটা অস্থিরতা বোধ করেছ সে।

একদিন রাতে বিছানায় শুয়ে নিজেকেই সে প্রশ্নটা করল, এমন লাগছে কেন? কেন এমন লাগছে?

কোনো জবাব খুঁজে পেল না সে।

রামনাথ ফোন করল দশদিন বাদে, অভিনন্দন জানাচ্ছি। তুমি আমাকে ধাপ্পা দিয়েছিলে গত দশদিন ফোন করিনি। আমার অভিমান আর রাগ হয়েছিল, সেটা সামলে উঠেছি।

রামনাথের গলা শুনেই কেন যে বুকটা হঠাৎ এমন দুরুদুরু করতে লাগল কে জানে। ধরা গলায় অরুণ ঢোলাকিয়া বলল, অনেক ধন্যবাদ।

ফোন রেখে অনেকক্ষণ ভাবল অরুণ, রজনীরও কি উচিত ছিল না একবার ফোন করা বা অভিনন্দন জানানো? অদ্ভুত তো মেয়েটা! খুব রাগ হল অরুণের। কেন জানাল না? কেন এত দেমাক ওর! কেন ওর এত অবহেলা তাকে? তার যে ভীষণ রাগ হচ্ছে! রাগে যে জ্বলে যাচ্ছে গা! অসহ্য! অসহ্য!

আরও দুদিন সময় দিল সে, তারপর আরও তিনদিন, নাঃ এ তো সহ্য করা যাচ্ছে না! কিছুতেই না।

সাতদিনের দিন এক সকালবেলা সে রজনীর মোবাইল ফোনের নম্বর বের করল কম্পিউটার সেন্টারে ফোন করে।

রজনীর মিহি 'হ্যালো' শুনেই রাগে ফেটে পড়ল অধ্যাপক অরুণ ঢোলাকিয়া, কী—কী ভেবেছ তুমি! অ্যাঁ! কী ভেবেছ? আমাকে এত অবহেলা করার মানে কী আমি জানতে চাই.....

এই তীব্র রাগের জবাবে মেয়েটা তাকে অবাক করে দিয়ে খিলখিল করে হাসল। তারপর বলল, হ্যাঁ!

হ্যাঁ! হ্যাঁ মানে কী?
হ্যাঁ মানে হ্যাঁ।
অরুণ একটু লাল হল লজ্জায়। তারপর বলল, ও, তাহলে হ্যাঁ?
হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ।

# পুতুলমাত্র

আচ্ছা, এই প্রাতঃকাল আর সায়ংকালের মধ্যে তফাত কী বলুন তো?

সকাল আর সন্ধে তো! তা সকালের সঙ্গে সন্ধের তো তফাত আছেই মশাই! হঠাৎ এই অদ্ভুত প্রশ্ন কেন?

না, এই কদিন ধরে তাই ভাবছি। সকাল মানে একেবারে যাকে প্রাতঃকাল বলে সেটা যেমন আবছা মতো, তেমনি সন্ধেবেলাটাও আবছা মতো। তাই একটা ধন্দে পড়ে জিজ্ঞাসা করলাম আর কি!

আশ্চর্য কথা! দুটোই আবছা মতো বলে কি তফাত নেই? একটা হল দিনের শুরু, আর একটা হল শেষ।

সে তো ঠিক কথাই।

তাহলে আপনার ধন্দ হচ্ছে কেন?

আসলে যেটা বলতে চাইছিলাম, দুটোর মধ্যে তফাত থাকলেও মিলও কিন্তু যথেষ্ট।

ওই আবছা মতো যা বললেন, ওটুকুই যা মিল।

আচ্ছা, আপনার কোনটা ভালো লাগে? ঊষা না গোধূলি?

কী মুশকিল! ভালো লাগা, না লাগার কথা উঠেছে কেন? আবহমানকাল সকাল আর সন্ধে হয়ে আসছে। ও আমাদের গা—সওয়া ব্যাপার। ভালো লাগলেও সই, না লাগলেও সই। আপনার সমস্যাটা কোথায় বলুন তো!

আমার যেন মনে হচ্ছে আপনি সাঁটে কিছু বলতে চাইছেন। অবিশ্যি আপনি এখন ইয়ংম্যান, সাতাশ—আটাশ বয়স, এই বয়সে ঊষা বা গোধূলি নিয়ে রোমান্টিক ভাবনা আসতেই পারে। চাই কি দু—ছত্তর কবিতাই হয়তো লিখে ফেললেন। আমাদের মতো ষাটোর্ধ্ব বয়সে আর রসকষ বিশেষ থাকে না কি না। প্রাতঃকাল হলেই নানা দুশ্চিন্তা। কোষ্ঠ পরিষ্কার হবে কি না, গিন্নির মুখ গোমড়া কি না। কাজের মেয়েটা আসবে কি না, বাজারে যেতে হবে কি না, সন্ধেবেলাতেই কি আর শান্তি আছে! ছেলে আর বউমা ক্লান্ত হয়ে চড়া মেজাজ নিয়ে অফিস থেকে ফেরে, গিন্নির বাতের ব্যথা চাগাড় দেয়, টিভিতে অখাদ্য বাংলা সিরিয়াল চালানো হয়। কোথাও শান্তি নেই মশাই।

আপনাকে দেখে কিন্তু আনহ্যাপি বলে মনে হয় না। বরং আপনার মুখে বেশ একটা তৃপ্তির ভাব আছে।

আপনি যে গবেট নন তা আমি অনেকদিন আগেই বুঝেছি। তা বলতে নেই, আমি খুব একটা আনহ্যাপিও নই। কিন্তু আপনার প্রবলেমটা কী বুঝতে পারছি না।

আমার এক এক সময়ে এক—একটা অদ্ভুত সমস্যা দেখা দেয়। এই যেমন এখন ওই ঊষা আর গোধূলি নিয়ে। আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না কোন বাক্সে আমার ভোটটা দেব।

ভোটাভুটির কী আছে মশাই! সকালও থাকুক, সন্ধেও থাকুক। আপনি চান বা না চান, ও দুটো তো ঘটতেই থাকবে। সকালে সকাল হবে, বিকেলে বিকেল।

ওখানেই তো প্রবলেম কি না কাকু!

আরে মশাই, প্রবলেমটার কথাই তো জানতে চাইছি। সকাল—সন্ধে নিয়ে আর কারও কখনো প্রবলেম হয়েছে বলে তো শুনিনি!

হয় কাকাবাবু, হয়। কী নিয়ে প্রবলেম হতে পারে না সেটাই আমি ভেবে পাই না। এই যে ঊষা আর গোধূলিকে নিয়ে প্রবলেম সেটা এত বিস্ময়কর যে, আমি ভারী কাহিল হয়ে পড়েছি।

বলেন কি ইয়ংম্যান, এই বয়সে লোকের প্রেম—ভালোবাসা নিয়ে প্রবলেম হয়, চাকরি নিয়ে প্রবলেম হয়, জেনারেশন গ্যাপের দরুন বাপ—মায়ের সঙ্গে প্রবলেম হতে পারে এ তো কখনো মাথায় আসেনি!

একটু কেটেছেঁটে বললেন কাকাবাবু। এছাড়া আরও হাজারটা বিষয় নিয়ে ইয়ংম্যানদের প্রবলেম হতে পারে, আপনারা যখন ইয়ং ছিলেন, তখনকার চেয়েও এ যুগে প্রবলেম আরও বেশি।

সে না হয় হল। কিন্তু আপনার প্রবলেমটা কিন্তু একটু বিটকেল মশাই। ব্যাপারটা একটু ভেঙে বললে হয় না?

যে আজ্ঞে। আপনি একজন সমঝদার মানুষ। আপনাকে বলাই যায়।

আমি একজন স্প্রিন্টার, বুঝলেন! আমি দৌড়োই। আর লং ডিসট্যান্স দৌড় আমার ভারী পছন্দের আইটেম।

তাই বলুন, স্পোর্টসম্যান, বাঃ খুব ভালো, তা অলিম্পিকে দৌড়োনোর ইচ্ছে আছে নাকি?

আজ্ঞে, কতদূর যেতে পারব তা তো জানি না। তবে আপতত ন্যাশনাল লেভেলে দৌড়োই। কিন্তু প্রবলেমটা দৌড় নিয়ে নয়। আমি একজন ন্যাচারাল অ্যাথলিট। কাজেই দৌড়ঝাঁপ নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছুই নেই। আমি আপনাকে সকাল নিয়ে আমার প্রবলেমটার কথাটা আগে বলে নিতে চাই যদি আপনার কৌতূহল এখনও থেকে থাকে।

নেই মানে! একশোবার আছে। শুনছি, বলুন।

হ্যাঁ, আমি শৌখিন দৌড়বাজ নই। ফলে আমাকে হার্ডওয়ার্ক করতে হয়। রোজ খুব ভোরে, রাত সাড়ে তিনটেয় উঠে চারটের মধ্যে আমি বেরিয়ে পড়ি। মোটরবাইকে চলে যাই ময়দান। আমার ট্রেনার আছেন, অন্য অ্যাথলিটরা আছে। ওয়ার্ম আপ করে আমরা দৌড় শুরু করি। দশ থেকে বারো মাইল একটানা দৌড়।

বাপ রে! সে তো বিশাল পাল্লা মশাই!

হ্যাঁ, ওটা মিনিমাম। দৌড়োতে দৌড়োতে প্রায়ই আমরা যে যার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই। ওই একা একা দৌড়োতে দৌড়োতেই একদিন মেয়েটির সঙ্গে দেখা।

মেয়ে! তাই বলুন মশাই। এতক্ষণে বোঝা গেল।

সবটাই কি বুঝে গেলেন?

আরে না মশাই! অতটা নয়, তবে গল্পটা গড়াবে ভালো।

আজ্ঞে। তা সেই মেয়েটিও ময়দানে দৌড়োতে আসে। কিন্তু খুব সিরিয়াস স্প্রিন্টার নয়। গাড়ি থেকে নেমে একটু শৌখিন দৌড়াদৌড়ি আর কি, যেমনটা ফিটনেস ঠিক রাখতে বা মেদ ঝরাতে অনেকেই করে। আর মেয়েটা রোজই গাড়ি পার্ক করে অপেক্ষা করে। আমি কাছাকাছি পৌঁছোলেই সে প্রায় আমার পাশাপাশি দৌড় শুরু করে। তারপর আমি তাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাই।

এ তো মাখো মাখো ব্যাপার মশাই! হ্যাঁ! তা মেয়েটা দেখতে শুনতে কেমন?

ভালো, বেশ ভালো, ধরুন পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি লম্বা, অ্যাথলিট, স্ট্রাইড ভালো।

আরে ওসব নয়। মুখশ্রী কেমন?

বোধহয় ভালোই, তবে বেশ বেশি ফরসা। মেম বলে ভুল হয়।

কথাটথা হয়েছে নাকি?

মাঝে মাঝে হাই হ্যালো, গুডমর্নিং, বাই বা জাস্ট হাই। আর এগোয়নি।

নামধাম?

আগে বিকেলের গল্পটা বলি।

বিকেলেও আছে নাকি?

আছে।

বলে ফেলুন, বলে ফেলুন।

এই যে বলি। আমার একটা ছোট ব্যবসা আছে। মূলধন খুব বেশি নয়। আমি ফুড প্রসেসিং করে বিক্রি করি। এ ব্যাপারে আমার খানিকটা পড়াশোনা আছে বলেই বিদ্যেটা কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছি।

মাশরুমটা আমি নিজেই চাষ করি। আর কিছু সবজি কিনে প্রসেস করি। প্রোডাকশন বেশি নয় কিন্তু স্টেডি কাস্টমার থাকায় আমার ব্যবসাটা চলে। স্পোর্টস ছেড়ে দিলে ব্যবসাটায় পুরোপুরি মন দিতে পারব। আমার কারখানাটা বাইপাসের কাছে। বিকেলটা সাধারণত আমি সেখানেই কাটাই। রাত হলে অনেক সময়ে কারখানাতেই থেকে যাই। ঘটনাটা ওখানেই ঘটে। মোট বাইশ জন কর্মচারী আছে, তার মধ্যে আটজন মহিলা। শেষ যে মেয়েটি কাজে ঢুকেছে, সে ঢুকেছে মাত্র একমাস আগে। যখন সে চাকরির ইনটারভিউ দিতে আসে তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিল। এই মেয়ে আমার ছোটো কারখানায় মাত্র সাত—আট হাজার টাকার বেতনে চাকরি করার মতো মেয়ে নয়। প্রথম কথা তার মুখ—চোখ দারুণ মায়াবী, কথাবার্তায় বড়োঘরের ছাপ এবং কাজেকর্মে একটু বেশি চটপটে। মাঝে মাঝে যখন ইংরেজি বলে ফেলে তখন তাতে কনভেন্টের অ্যাকসেন্ট থাকে। মেয়েটা কম্পিউটার হান্ডেল করে এবং অনলাইন ডিল সামলায়।

প্রবলেমটা কী?

সেটাই বুঝতে পারছি না। মেয়েটা যে আমার দিকে তাকায় বা চোরাচোখে আমাকে দেখে, বা ইশারা ইঙ্গিত করে, এমনও নয়। অথচ আমার কেবলই সন্দেহ হয় মেয়েটা শুধু চাকরি করতে আসেনি। শী ইজ আফটার সামথিং হুইচ আই ডোন্ট নো।

কিন্তু প্রবলেমটা কোথায় সেটাই তো বুঝতে পারছি না।

হ্যাঁ। আমিও পারছি না। কিন্তু আমার কেন যেন মনে হয় যে, সকালে ময়দানে যাকে দেখি সে, বিকেলে আমার কারখানায় যে কাজ করে সে—একই মানুষ। কিন্তু দু—জনকে সকালে আর বিকেলে কেন যে এত আলাদা মনে হয় সেটাই ভেবে হয়রান হয়ে যাচ্ছি। এরা কি সত্যিই একজন, না দু—জন? আমি কি চোখে ভুল দেখছি, না মনে ভুল ভাবছি। কখনো মনে হয় ওরা দু—জন, কখনও একজন। কী করা যায় বলুন তো!

আরে ইয়ংম্যান, ওটাই তো ইটারনাল প্রবলেম। বউয়ের সঙ্গে ত্রিশ বছর ঘর করছি, তিনি আসলে কে বা কেমন তা আজও বুঝতে পারিনি মশাই।

তাহলে কী করা যায় বলুন তো কাকাবাবু?

কিচ্ছু না মশাই, কিচ্ছু না, পুরুষদের কিছু করার থাকেও না। যা করার ওকেই করতে দিন। শুধু মনে রাখবেন আপনি পুতুলমাত্র।

# এক দুই

আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় ভগবান আসলে দু—জন আছেন?

কেন বলুন তো!

আমার ইদানীং কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে ভগবান আসলে দু—জন আছেন। একজন বড়লোকের ভগবান, আর একজন গরিবের ভগবান। আরও কি মনে হয় জানেন, গরিবের ভগবানও বেশ গরিব।

এরকম মনে হওয়ার তো একটা কারণ থাকবে, নাকি?

না, সে রকম লজিক্যাল কারণ কিছু নেই। মনে হল, তাই বললাম। এই গতকালকের কথাই ধরুন। মাসের শেষ বলে পুঁইচচ্চড়ি আর ডাল হয়েছে। তা খেতে বসে মনে হল, একটু লেবু আর লংকা হলে বেশ হত। তাই ভগবানকে খুব কষে ডাকতে লাগলাম। কারণ, ঘরে লেবু বা লংকা কোনোটাই ছিল না। তা ডাকতে ডাকতে যখন আর্ধেক ভাত সাবাড় করে ফেলেছি ঠিক সেই সময়ে আমাদের পাশের ঘোষবাড়ির বউটি কয়েকটা কাঁচা লংকা এনে বলল, তাদের গাছে সূর্যমুখী লংকা হয়েছে, তার শাশুড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। ওই লংকার জোরে বাকি ভাতটা খেয়ে উঠলাম। লক্ষ করবেন ভগবান অর্ধেকটা দিলেন, কিন্তু বাকি অর্ধেক দিলেন না।

আপনার কি ধারণা বড়লোকের ভগবান বেশি সার্ভিস দেন?

সেরকমই মনে হয়। নব চাটুজ্যের কথাই ধরুন না। বিশাল কারবার। নিউ আলিপুরে প্যালেসের মতো বাড়ি, গ্যারেজে খানচারেক গাড়ি। টাকায় লুটোপুটি খাচ্ছেন। তা এই তো সেদিন কোন কনজিউমার প্রোডাক্টের স্লোগান প্রতিযোগিতায় হেলাফেলায় একটা স্লোগান লিখে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। মাস দেড়েক বাদে সেই কোম্পানির লোক একখানা ঝকঝকে মার্সিডিজ বেঞ্চ গাড়ি নিয়ে এসে হাজির। উনি স্লোগান কমপিটিশনে ফার্স্ট হয়ে প্রাইজ পেয়েছেন। শুনলাম সেটার দাম নাকি সতেরো লাখ টাকা। ভগবান যদি একজন হতেন তাহলে এরকমটা হতে পারত কি?

খুবই শক্ত প্রশ্ন। ভগবান সম্পর্কে আমি প্রায় কিছুই জানি না।

আরে সে তো আমিও জানি না। আপনার কি ধারণা আমি ভগবান বিষয়ে বিশেষজ্ঞ? শাস্ত্রটাস্ত্র, বেদ—বেদান্ত, পুরাণ—উপনিষদ, গীতাটিতা আমি কিচ্ছু পড়িনি। তবে ভগবান মানি খুব।

আপনি দু—জন ভগবানের কথা বললেন। কিন্তু হিন্দুদের তো শুনি তেত্রিশ কোটি দেব—দেবী।

আহা, ওসব হচ্ছে একজনেরই নানারকম প্রতীক, বুঝলেন না? কখনো ঘেঁটু, কখনো শীতলা, কখনো শিব, কখনো বিষ্ণু। খুব কমপ্লিকেটেড ব্যাপার। তাই আমি ধর্মের মধ্যে বিশেষ মাথা গলাই না। তবে মন্দিরটন্দির দেখলে একটা নমো ঠুকে যাই।

আপনার আস্তিকতা বেশ সহজ সরল, তাই না?

যা বলেছেন। জটিলতা ব্যাপারটা আমার সহ্য হয় না। আমি শুধু জানি, ওপরে একজন কেউ আছেন। আজকাল মাঝে মাঝে মনে হয়, একজনের জায়গায় দু—জনও হতে পারেন।

ওপর বলতে আপনি ঠিক কোন জায়গাটা মিন করছেন?

কেন, ওপর বলতে ওপরটাই মিন করছি।

যদি আকাশ মিন করে থাকেন তাহলে আপনার জানা উচিত যে আকাশ হল মহাশূন্য। আর মহাশূন্যে ওপর—নীচ, পূর্ব—পশ্চিম কিছু নেই। মহাশূন্য সম্পূর্ণ দিগ্বিদিকশূন্য।

আহা, আবার আপনি জট পাকিয়ে তুললেন। আমি তো অত ভেবেটেবে বলিনি। লোকে যা বলে তাই বললাম। সামওয়ান ইজ আপ দেয়ার।

তাহলে অবশ্য কথা নেই। বেশি জানতে গেলে অনেক সময়ে বিশ্বাসটাই ভেঙে যায়।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক তাই। আমাদের মহাশূন্য নিয়ে মাথা ঘামানোর কী দরকার মশাই, আমরা তো আর মহাশূন্যে মর্নিংওয়াক করতে যাচ্ছি না। আমরা যেমন ওপর আর নীচ দেখছি সেরকমটাই তো ভালো।

যার কাছে যেমন। না জানারও নিশ্চয়ই কিছু উপকারিতা আছে।

ঠিক বলেছেন। বেশি জানতে গেলে নানারকম ভজঘট্ট বাঁধে। এই ধরুন, বউকে নিয়ে দিব্যি সুখে—দুঃখে সংসার করছেন, হঠাৎ যদি জানতে পারেন, বিয়ের আগে বউয়ের একটা কেলেঙ্কারি বা অ্যাফেয়ার ছিল তাহলে কি সংসারটা তেতো হয়ে যাবে না?

খুবই ঠিক। আপনি কি সংসারী মানুষ?

বিয়ের কথা বলছেন? না ও ব্যাপারটা আর হয়ে উঠল না। তার জন্য দায়ী হল অর্থনৈতিক অবস্থা। আমি একজন ব্যবসায়ীর কর্মচারী। বুঝতেই পারছেন, এসব কোম্পানি কর্মচারীদের কীভাবে ট্রিট করে। উদয়াস্ত খেটে চার হাজার টাকা হাতে পাই। ঘাড়ে বুড়ো বাবা—মা, একটা বোন, পড়ুয়া ভাই। বাড়িওলা জল বন্ধ করে দিয়েছে, গুন্ডা লাগাবে বলে শাসাচ্ছে। একেবারে যাচ্ছেতাই অবস্থায় বত্রিশ বছর বয়সেই যেন বার্ধক্য এসে গেছে। বিয়ের শখও নেই। মেয়েদের দেখলে আজকাল ভারি জড়সড় হয়ে পড়ি, হীনম্মন্যতায় ভুগি।

অর্থনৈতিক অবস্থা কবেই বা ভালো বলুন। দেশজোড়া দারিদ্র্য। তাতেও তো বিয়ে হচ্ছে, সন্তান জন্মাচ্ছে।

ওসব দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ। আমি বিয়ে পাগল নই। এই বেশ আছি। দারিদ্র্য থাকলেও তাতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। শখ—আহ্লাদ বলতে কিছু নেই। ভাতের পাতে একটা দুটো ব্যঞ্জন হলেই হল। মা—বাবা, ভাই—বোনেরা সবাই আমার প্রতি সিমপ্যাথেটিক। কিন্তু বউ এলেই যে আমার নানা অযোগ্যতা, অকর্মণ্যতা, ডিসকোয়ালিফিকেশনগুলো দেখতে পাবে এবং আমাকে গঞ্জনা দেবে।

বিয়ের ওসব সাইড এফেক্ট তো আছেই। ওসব জেনেশুনেই লোকে বিয়ে করছে তো!

যে করছে সে করুক। আমি ওর মধ্যে নেই।

আচ্ছা, এই যে আপনি বললেন, বউ এলে যে আপনার অযোগ্যতা, অকমর্ণ্যতা, ডিসকোয়ালিফিকেশনগুলো দেখতে পাবে, তার মানে কি? আপনার ডিসকোয়ালিফিকেশনগুলো কি বউ ছাড়া আর কেউ দেখতে পাচ্ছে না?

পাচ্ছে বইকি, কিন্তু তার জন্য তারা আমার ওপর চড়াও হচ্ছে না, হামলা করছে না। বউ পরের বাড়ির মেয়ে, তার স্বার্থ আমার ওপর নির্ভরশীল, সে ছাড়বে কেন? আমার এক বন্ধু তো বউয়ের গঞ্জনা শুনতে শুনতে ভ্যাবলা মতো হয়ে গিয়ে শেষে ঢাকুরিয়া স্টেশনের কাছে রেললাইনে গলা দিয়ে... ওঃ, সে কথা মনে করলেই ভয় হয় মশাই। আমার কি মনে হয় জানেন, দুর্বলচিত্ত মানুষদের বিয়ে না করাই উচিত। শরীরের প্রয়োজনে বরং প্রস কোয়ার্টারে যাক, বিয়ে করার রিস্ক না নেওয়াই ভালো।

দুর্বলচিত্ত মানুষের সংখ্যাই তো বেশি। সারা পৃথিবীর অ্যাসেসমেন্ট করলে দেখবেন, দুনিয়ার নাইনটি পারসেন্ট মানুষ দুর্বলচিত্ত।

তা হতে পারে। অন্যের খবরে আমার দরকার কি বলুন। আমি যে দুর্বলচিত্ত সেটাই আমার কাছে বেশি ইম্পর্ট্যান্ট।

ওঃ হ্যাঁ, আপনি তো আবার বেশি জানতে চান না।

দূর মশাই, জেনে হবেটা কি? জানলে যদি জ্বালা বাড়ে তাহলে লাভটা কি? ওই ভয়ে তো আমি খবরের কাগজও পড়ি না। কাগজ রাখার পয়সা নেই বটে, কিন্তু আমাদের ম্যানেজারের টেবিলে খবরের কাগজ থাকে। আমি কখনো তাকাইও না।

তার মানে কি পৃথিবী সম্পর্কে আপনার কোনো আগ্রহই নেই? রাজনীতি, খেলাধুলো, সিনেমা, যুদ্ধবিগ্রহ, আর্ট কালচার?

ছিল, ছিল। বছর দশ পনেরো আগেও ওসবে ইন্টারেস্ট ছিল। তারপর দেখলাম, দুনিয়াটা তার নিজের মতো চলেছে, আমি মাধ্যাকর্ষণের ফলে তার গায়ে ছারপোকার মতো সেঁটে আছি মাত্র। টিকে থাকা ছাড়া আমার কোনো ধর্ম নেই, কর্মও নেই। দুনিয়াকে জানার চেষ্টা করা বৃথা। সায়েন্টিস্টরা চেষ্টা করছে, দার্শনিকরা করছে, জ্ঞানী পণ্ডিতরা করছে। কিন্তু লাভ হচ্ছে অষ্টরম্ভা। দুনিয়াকে জানা ও বোঝা অত সহজ নয়। তাই আমি আর ওসব চেষ্টাই করি না। সকাল নটায় বেরোই, হিসেব বুঝিয়ে বাড়ি ফিরতে রাত দশটা। হপ্তায় এই একদিন ছুটি।

ছুটির দিনে কী করেন?

সকালে বাজার, তারপর জামাকাপড় কাচা, দুপুরে একটু ঘুম। বিকেলে এই একটা দিন এসে এই পার্কটায় একটু বসে থাকি।

আর কোনো এন্টারটেনমেন্ট নেই আপনার? সিনেমা থিয়েটার?

দুর দুর, ওসব বানানো কৃত্রিম জিনিস দেখে মনকে বিভ্রান্ত করার মানেই হয় না। গত দশ বছর আমি সিনেমা দেখিনি, বিশ্বাস করবেন?

করলাম। তা পার্কে বসে থাকাটাই এন্টারটেনমেন্ট আপনার?

বসে থাকি, আর ভাবি।

কী ভাবেন?

আমার ভাবনার কোনো মাথামুন্ডু নেই। ব্রেন পাওয়ার কম তো, তাই চিন্তার জগতে কোনো শৃঙ্খলাও থাকে না। বসে বসে যা মাথায় আসে তাই ভাবি।

কোনো মহিলার কথা?

ওঃ, আপনি ওই একটা দিকেই আমাকে গোত করতে চান তো? তা মশাই, সত্যি কথা বলতে কি, এক—আধজন মহিলার কথাও যে মনে আসে না তা নয়।

কোনো বিশেষ মহিলার কথা কি?

তাও বলতে পারেন। আমি যতই অপদার্থ হই, আমারও যৌবন ডাকাডাকি করেছে এক সময়ে। তা ওই কাঁচা বয়সে কখনো সখনো এক আধজন মেয়েকে ভারী পছন্দও হয়েছিল।

তাহলে রোমান্স হয়েছিল?

রোমান্স কথাটা ভারী বাবু কথা। অত ভালো ব্যাপার কি আমাদের মতো অপদার্থের কপালে হয়? তখন কসবায় একটা খোলার ঘরে থাকতাম। এ চাকরিটা তখনও পাইনি। বাবা ছিল প্রাইভেট বাসের কন্ডাকটর। অবস্থা অনুমান করে নিন। তা সেই সময়ে আমি কলেজে পড়ি। যাতায়াতের পথে একটা গোলাপি রঙের বাড়ির একতলার জানালায় একটা ফুটফুটে মেয়েকে প্রায়ই দেখতে পেতাম। কোঁকড়া চুল ছিল মাথায়, বেশ ফরসা, মুখখানা যেন নরুণে চেঁছে যত্নে বানানো। মেয়েটা ড্যাবড্যাব করে চেয়ে থাকত।

তার বয়স কত ছিল?

তেরো চোদ্দো হবে।

তারপর?

যাতায়াতের পথে রোজই চোখে চোখ পড়ত। একটু লাজুক ছিলাম বলে ওই একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিতাম। তবে এইভাবে চলল, আর আমার ভিতরে নানারকম কেমিক্যাল চেঞ্জ ঘটতে লাগল। প্রেমে পড়লে তা হয় আর কি।

আপনি কি বিজ্ঞানের ছাত্র?

কেন বলুন তো! কী করে বুঝলেন?

কেমিক্যাল চেঞ্জের কথা বললেন কি না।

সায়েন্স পড়েছি বটে, কিন্তু তাতে কোনও সম্ভাবনা তৈরি হয়নি আমার জীবনে। পাসকোর্সে বি এসসি পাশ করেছিলাম। পয়সার অভাবে ফিজিক্সে অনার্স কন্টিনিউ করতে পারিনি।

অনার্স ছিল, তার মানে সম্ভাবনা তো ছিলই!

পয়সার অভাব আমাদের দেশে সবরকম মেধাকেই গলা টিপে মেরে দেয়, বুঝলেন?

হ্যাঁ। কথাটা খুবই সত্য। কিন্তু সেই মেয়েটার কথা শেষ করুন।

শেষ না করলেও হয়। তবে হ্যাঁ, তার প্রতি আমার প্রবল দুর্বলতা জন্ম নিয়েছিল। আর আমার যাওয়া আসার সময় সর্বদাই সে জানালায় থাকত, এটাও একটা পয়েন্ট, অর্থাৎ তারও আমার প্রতি আগ্রহ ছিল, তাই না?

তাই তো মনে হচ্ছে! পরিচয় হল কী করে?

পরিচয়ে বাধা ছিল। একে আমি লাজুক, গরিবের ছেলে, টিউশনি করে কলেজে পড়ি। আর ওই মেয়েটি বড়লোক না হলেও আমাদের চেয়ে অন্তত তিন চার ধাপ ওপরের সমাজের লোক। বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়ানোর মতো ব্যাপার। তবে মেয়েটি যে আমার জন্যই অপেক্ষা করত তাতে সন্দেহ ছিল না আমার। বেশ কিছুদিন চোখাচোখি খেলার পর সে আমাকে দেখে একটু হাসতও।

বটে!

হ্যাঁ মশাই। আমিও মনে মনে বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। জীবনে ওটাই আমার প্রথম ও একমাত্র প্রেম কি না।

বুঝেছি। বলুন।

বোধহয় মাস দুয়েক এরকম চলার পর একদিন হঠাৎ দেখলাম, জানালায় মেয়েটির পাশে একজন ফরসা বয়স্কা মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। যতদূর মনে হল মেয়েটির মা।

এই রে!

হ্যাঁ, আমি খুব চমকে গিয়েছিলাম, ভয়ও পেয়েছিলাম। মিতুর মাকে দেখে আমি সেদিন প্রায় ছুটে পালাই।

মেয়েটির নাম বুঝি মিতু?

হ্যাঁ।

তারপর?

দিন দুই বাদে একদিন কলেজ থেকে ফেরার সময় দেখি সেই ভদ্রমহিলা তাঁদের গ্রিলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখে ডাকলেন, এই ছেলে, শোনো!

ও বাবা!

হ্যাঁ, আমি তো ভয়ে কুঁকড়ে গেলাম। উনি বললেন, ভয় পেও না, ভিতরে এসো। কথা আছে। আমি ভাবলাম, ভিতরে নিয়ে গিয়ে বোধহয় লোক ডেকে ধোলাই দেবেন। তবু ভদ্রতার খাতিরে না গিয়েও পারলাম না। ভদ্রমহিলা আমাকে যত্ন করে বসালেন, পাখা ছেড়ে দিলেন। তারপর আমার বাড়ির খোঁজখবর নিতে লাগলেন।

বাঃ, এ তো গ্রিন সিগন্যাল।

হ্যাঁ। গ্রিন সিগন্যালই। আমি অকপটে তাঁকে সব বলে দিলাম। উনিও দেখলাম, আমাদের সব খবরই রাখেন। বেশ কিছুক্ষণ নানা কথা বলার হঠাৎ বলে বসলেন, তুমি কি আমার মেয়েকে বিয়ে করতে চাও? আমি তো প্রস্তাব শুনে হাঁ। কী বলব ভেবেই পাচ্ছিলাম না। বুকের মধ্যে উথালপাথাল। উনি তখন খুব করুণ মুখ করে বললেন, বিয়ে করতে চাইলে আমাদের আপত্তি নেই। তোমার অবস্থা জেনেও বিয়ে দেব। তবে আমার মেয়ে কিন্তু পঙ্গু।

পঙ্গু? এঃ হেঃ, কীরকম পঙ্গু?

কোমরের তলা থেকে পা অবধি সমস্ত নীচের অংশটাই ছিল আনডেভেলপড। হাঁটাচলার ক্ষমতাই ছিল না মেয়েটার। তাই ওকে জানালার পাশে একটা চেয়ারে বসিয়ে রাখা হত। বসে বসে মিতু বাইরের জগৎ দেখত—যে জগতে যাওয়ার ক্ষমতাই ছিল না তার। কিন্তু কোমর থেকে মুখ পর্যন্ত সম্পূর্ণ স্বাভাবিক—যে কোনো মেয়েকে টেক্কা দেওয়ার মতো।

আপনি কি করলেন? পিছিয়ে গেলেন?

না। সে বয়সটা তো বিবেচনা বা স্থিরবুদ্ধির বয়স নয়। ভাবলাম, পঙ্গু তো কী হয়েছে, ওকে নিয়েই জীবন কাটিয়ে দেব। বাড়িতে এসে বললামও সে কথা। মায়ের তো মাথায় হাত। বাবা বাক্যহারা।

আর মিতু? তার মতামত নেননি?

সেখানেই তো গোল বাঁধল।

কিসের গোল?

কথা কইবার চেষ্টা করতে গিয়ে বুঝলাম, অমন সুন্দর মেয়েটাকে ভগবান অনেক দিক দিয়ে মেরে রেখেছেন। মিতুর বুদ্ধিটাও তেমন ডেভেলপ করেনি।

জড়বুদ্ধি নাকি?

অনেকটাই। স্পষ্ট কথা বলতে পারত না। ভ্যাবলা।

তবে তো ব্যাপারটা কেঁচে গেল!

হ্যাঁ। ওই যে আপনাকে দু—নম্বর ভগবানের কথা বলছিলাম, কেন বলছিলাম বুঝতে পারছেন তো! গরিবের ভগবান হয় নিজেই গরিব, নইলে হাড়কেপ্পন। লংকা আর লেবু চাইলে লংকাটা হয়তো দেন, লেবুটা টেনে রাখেন।

ভগবানের ওপর যখন আপনার এতই রাগ তখন তাকে ঝেড়ে ফেললেই তো হয়।

ভগবান আমাদের মতো কিছু লোকের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছেন। ঝেড়ে ফেললেই তিনি যাবেন কেন? আচ্ছা, আপনি কি নাস্তিক নাকি?

আস্তিক নাস্তিক কিছুই নই। ও নিয়ে কিছু ভাবিনি কখনো। দরকারও হয়নি।

তার মানে আপনার জীবনটা বেশ স্মুথ। কোনো সমস্যাই নেই। তাই না? হয়তো ভালো চাকরি করেন, মেলা টাকার মালিক, কলকাতার নিজ বাটি, ঘাড়ে গন্ধমাদন কোনো দায়িত্ব নেই। ঠিক কি না!

তাই যদি হত তাহলে সন্ধেবেলা এসে একা একা এই নেড়া পার্কে বসে থাকতাম নাকি? এটাকে পার্ক বললে পার্ক কথাটারই অপমান হয়। দেখছেন গোটা মাঠটায় কেমন টাক—পড়া ভাব। গাছপালার নামগন্ধ নেই!

হ্যাঁ, পার্কটার কোনো সৌন্দর্য নেই বটে। তা ছাড়া উত্তর দিকের ওই ভ্যাটটা থেকে খুব দুর্গন্ধও আসছে।

গত দশ দিন ময়লা নেয়নি। কালও দেখেছি, মরা বেড়াল পড়ে আছে পাশে। গন্ধ তো হবেই। আর পার্কটার ওই কোণে আজ সকালেই দুটো ডেডবডি পাওয়া গেছে। একটা মেয়ে আর একটা ছেলের। দুজনেরই গলার নালি কাটা।

বলেন কি? কিছু টের পাইনি তো!

এই পার্কটা আজকাল অ্যান্টিসোশ্যালদের আড্ডা, তা জানেন তো! প্রকাশ্যেই মদ, গাঁজা, সেক্স, জুয়া সবই চলে। আজকাল ওদের ভয়ে কোনো ভদ্রলোক আর এ পার্কে আসে না। আজ দেখুন, পার্ক পুরো ফাঁকা। কেন জানেন? ডেডবডি পাওয়ার পর পুলিশ অ্যাকশন হয়েছে সারাদিন। এখনও পেট্রল চলছে। বদমাশরা ভেগেছে বলেই পার্কটা এত ফাঁকা।

তা বটে, পার্কে তো আসি সপ্তাহে একদিন। দেখি, কিছু ছেলে—ছোকরা অন্ধকারে কেমন সন্দেহজনক আচরণ করছে। তবে তাতে আমার আর কী বলুন। আমি একটু কোনার দিক বেছে নিয়ে ঘাসে বসে থাকি চুপ করে। আমাকে কেউ গ্রাহ্য করে না। যারা খুন হল তারা কারা বলুন তো?

কে জানে! ড্রাগ পেডলার হতে পারে। চোরা চালানদার হলেই বা কি। মোট কথা, খুব ক্লিন লোক নয়। কম হলেও আপনার তবু একটা চার হাজার টাকা বেতনের চাকরি আছে। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থায় আপনার পজিশন কিন্তু বেশ ভালো। এই যারা খারাপ কাজটাজ করে বেড়ায় তাদের চার হাজার টাকার চাকরি জুটলে অনেকেই হয়তো খারাপ কাজ করত না। কী বলেন?

কে জানে মশাই, দেশ, সমাজ, বেকার সমস্যা এসব নিয়ে আমি মাথাই ঘামাই না। ঘামিয়ে কিছু হয়ও না। আমি শুধু একবগগা আমার আয় আর ব্যয়ের ব্যাপারটা প্রাণপণে মেলানোর চেষ্টা করি। আমাদের আয়ের সঙ্গে আমাদের ব্যয়ের মেলানোর চেষ্টা করি। আমাদের আয়ের সঙ্গে আমাদের ব্যয়ের কোনোদিন বন্ধুত্ব হয় না, জানেন? সবসময়ে ওই ব্যয় ব্যাটা এগিয়ে থাকে। দুটোয় কোনোদিন বনিবনা হল না।

আচ্ছা, সেটা তো দেশের লাখো লোকের সমস্যা। কিন্তু অবস্থাটা পালটে দিতে ইচ্ছে হয় না?

পালটে দেব? আমার কোন দায় বলুন তো! দেশে কোটি কোটি লোক থাকতে আমারই বা হঠাৎ দেশের অবস্থা পালটানোর ইচ্ছে হবে কেন? আপনার হয় নাকি?

হয়। খুব হয়। তবে পন্থাটা ভেবে পাই না।

ঝুটমুট ভেবে শরীরপাত করার দরকারটা কি? ওসব আমার আপনার কম্মো নয়। আমি তো ধরেই নিয়েছি যা করার ভগবানই করবেন।

আপনি কিন্তু হতাশাবাদী।

না মশাই, না। হতাশাবাদী হল আশাটাশা ছেড়ে দিয়েছে যে, আমার তো ওসব আশাটাশা ছিল না কিছু, আমি তো আপনাকে বলেইছি, আমি হলাম বাস কন্ডাক্টরের ছেলে। বাপ খেয়ে না খেয়ে ছেলেকে মানুষ করার জন্য বিএসসি অবধি পড়িয়েছিল। মানুষ হওয়া অবশ্য হয়নি। কিন্তু তার জন্য আমার কোনো হা—হুতাশও নেই। যা আছি, যেটুকু পাচ্ছি তাই নিয়েই আমাকে থাকতে হবে। বিপ্লবটিপ্লব করার কথা কখনো ভাবিনি। আর বিপ্লবও তো আর এক রকমের নয়। নানা পার্টি নানা বিপ্লবের কথা বলে। তাতেই বুঝে গেছি, কারও এখনও মনস্থির হয়নি।

হাল ছেড়ে দিচ্ছেন?

সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ। যদিও নিজেকে আমি মোটেই বুদ্ধিমান ভাবি না।

আপনার গল্পটা কিন্তু এখনও শেষ হয়নি।

কোন গল্পটা?

ওই যে মিতুর সঙ্গে আপনার প্রেমের গল্প।

প্রেমের গল্পের দু—রকম পরিণতি থাকে। হয় মিলনান্তক, নয় বিয়োগান্তক, তাই না?

হ্যাঁ, আপনারটা কীভাবে শেষ হল?

আমারটা ঠিক মিলন বা বিয়োগ কোনোটাই হল না। কেমন যেন নষ্ট দুধের মতো কেটে গেল, আমি নিজেকে তখন প্রশ্ন করেছিলাম, বাপু, প্রেমেই যদি পড়ে থাকো, তাহলে সেই প্রেমের এমন জোর নেই যে মেয়েটার শরীর আর মনের খামতিগুলো উপেক্ষা করতে পার? এ আবার কেমন প্রেম? কিন্তু কি জানেন, ভিতর থেকে কোনো সাড়াই এল না। আর সেই যে প্রেম কেঁচে গেল আর কখনো পেকে উঠল না।

মিতুর কোনো খবর রাখেন না?

না, খবর রেখে হবেটাই বা কি বলুন। ও পাড়া ছেলে চলে আসার পর আর সম্পর্কও নেই। তবে মাঝে মাঝে একটু—আধটু মনে পড়ে আর কি। আচ্ছা আপনি কি এ পাড়ার বাসিন্দা?

তা বলতে পারেন। কাছেপিঠেই আমার আস্তানা।

এই পার্কে প্রায়ই আসেন বুঝি?

না, তবে যাতায়াতের পথে পার্কটা নজরে পড়ে। আজ পার্কটা ফাঁকা দেখে একটু বসবার লোভ হল।

বেশ করেছেন। আপনার সঙ্গে বেশ আলাপও হয়ে গেল আমার। আজকাল কারও সঙ্গেই যেচে আলাপটালাপ করা হয় না। মনে হয় চেনা—জানা বাড়িয়ে হবেটা কি?

মানুষের সঙ্গে আলাপ—পরিচয় থাকাটা কি ভালো নয়?

আমার কি মনে হয় জানেন? মানষ জীবনের বেশিরভাগ সময়টাই কাটিয়ে দেয় নানারকম অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন কাজে। তার মধ্যে একটা হল এই লোকের সঙ্গে আলাপ—পরিচয়। দেখা হলে দেঁতো হাসি হেসে কুশল প্রশ্ন বা খেজুর করা, ওতে কি লাভ বলুন, কিছুটা সময় ফালতু কাটানো ছাড়া আর কি?

আপনি বুঝি কম কথার মানুষ?

তা নয়, কেউ কথাটথা কইলে আমর বরং বেশ অহংকার হয়। ভাবি, লোকটা পাত্তা দিচ্ছে। আমিও তাকে খুশি করারই চেষ্টা করে থাকি। এসব আমি করি বটে, কিন্তু কাজটা যে অর্থহীন সেটাও ভুলতে পারি না।

চেনাজানা থাকলে দায়ে দফায় মানুষের সাহায্যও তো পাওয়া যায়।

হ্যাঁ, সেরকম কিছু হয় বটে। কিন্তু চেনাজানাদের কাছ থেকে আমরা কখনো তেমন কোনো উপকার পাইনি। অবশ্য উলটোটাও সত্যি। আমরাও কারও তেমন কোনো উপকার করিনি। মানুষের উপকার করার জন্যও কিছু যোগ্যতার দরকার হয়। আমার সে যোগ্যতা নেই।

আপনি আপনার বাইরের জগৎটাকে নিয়ে ভাবেন না তো!

না। ওই যে বললাম, ভেবে সময় নষ্ট।

বই পড়েন?

পাগল! ওসব বাতিক আমার নেই।

চাকরিটা আপনার কেমন লাগে?

খারাপ কি? মালিকের বিল্ডিং মেটেরিয়ালের বিরাট ব্যবসা। সিমেন্ট, বালি, স্টোন চিপস, রড, চুন, ইট, সুরকি নিয়ে এলাহি ব্যাপার। রোজ পঞ্চাশ ষাট লরি বোজাই হয়ে সাপ্লাই যাচ্ছে চারদিকে। যাকে বলে কর্মযজ্ঞ।

আপনার কাজটা কী?

সবকিছু নলেজে রাখা।

শুধু নলেজে রাখা? আর কিছু নয়?

ওটাই তো হাড়ভাঙা খাটুনি। সারাদিন গোটা পাঁচেক গো—ডাউনে চক্কর মেরে বেড়াতে হয়। কোন অর্ডারে কত মাল যাচ্ছে তার হিসেব রাখতে হয়। একশোটা কৈফিয়ত দিতে হয়।

আপনি কি ম্যানেজার?

অনেকটা সেরকমই শোনায় বটে। ম্যানেজারের ইজ্জত অবশ্য নেই, তবে খাটনি আর ঝুঁকিটা আছে।

মালিকের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক তাহলে ভালোই?

না, ভালো বললে ভুল হবে। তবে হুকুম তামিল করি বলে মালিকরা আমাকে নিয়ে ঝামেলা পোয়ায় না। আর তাই, আমাকে তারা লক্ষও করে না।

তাদের নজরে পড়ার জন্য চেষ্টা করেন না?

মানুষের ওপর নজর দেওয়ার ফুরসত তাদের কই? তাদের নজর তো আগম নির্গমের ওপর। কত মাল বেরোচ্ছে, কত টাকা ঢুকছে।

এতে আপনার বিদ্রোহ করতে ইচ্ছে হয় না?

বিদ্রোহ কিসের? মাসের শেষে যে চার হাজার টাকা দিচ্ছে! ওটাই তো জোঁকের মুখে নুন। আচ্ছা, আপনি কি পলিটিকস করেন?

না তো!

তবে কি ইউনিয়ন—টিউনিয়ন?

না না, ওসব নয়।

আমাদের কারবারে অবশ্য ইউনিয়ন নেই। কারও চাকরিই পাকা নয়, ইউনিয়ন করবে কোন সাহসে বলুন!

আপনার কি মনে হয় না একটা ইউনিয়ন থাকলে ভালো হত?

না, হয় না। ইউনিয়ন যেখানে আছে সেখানেই বা ভালোটা কী হচ্ছে বলুন। ইউনিয়ন বেশি পেশি প্রদর্শন করলে মালিক লক আউট করে দিচ্ছে, না হয় তো কারখানা বা ব্যবসা তুলে নিয়ে যাচ্ছে।

তাহলে কি আপনি আত্মবিক্রয় করে দিয়ে বসে আছেন?

যথার্থ বলেছেন। আমরা কে না আত্মবিক্রয় করতে বসে আছি বলুন। মানুষ তো নিজেকে সবসময় আরও বেশি সেলেবল কমোডিটি করে তোলার জন্যই নানাভাবে নিজেকে ঘষামাজা করছে। তাই নয় কি?

অনেকটা তাই বটে।

সবটাই তাই। আমরা কে কতটা কার কাছে বিক্রয়যোগ্য বা ক্রয়যোগ্য সেটাই আসল কথা। দুঃখের বিষয় হল শাহরুখ খান চার কোটিতে বিকোয়, আমি চার হাজারে।

সেই দুঃখেই কি মাঝে মাঝে আপনার ভিতর থেকে একজন ঘাতক বেরিয়ে আসতে চায়?

না মশাই, না। ঘাতকটাতক আমার মধ্যে নেই। আমার মতো লোকেরা বড় জোড় নিজেকে মারতে পারে। আত্মঘাতী একটা প্রবণতা আমার মধ্যে এক সময়ে ছিল। কিন্তু সেটাও আজকাল ঘুমিয়ে পড়েছে। আচ্ছা, আপনি তো আমার নামটাও জিজ্ঞেস করেননি। অবশ্য নাম জেনে হবেটাই বা কি। রাম বা হরি, রমেশ বা যতীন যা হোক একটা হলেই হল। আমাদের তো আর নামের মহিমা নেই, কী বলেন?

আপনার নামটা আমি জানি।

বলেন কি মশাই? নাম জানেন! কী করে জানলেন?

পুলিশের রেকর্ডে আপনার নাম আছে।

হাঃ হাঃ কী যে বলেন মশাই। পুলিশের রেকর্ডে আমার নাম! আমি কি জাতে উঠে গেলাম নাকি। হাঃ হাঃ! না মশাই, আপনি একটা মস্ত ভুল করে ফেলেছেন। অন্য কারও সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছেন আমায়।

সেটাও সম্ভব।

আজ্ঞে সেটাই ঘটনা। কিন্তু পুলিশের রেকর্ডের কথা আপনি জানলেন কী করে? আপনি কি পুলিশের লোক?

পেট চালানোর জন্য কিছু তো করতেই হবে। পুলিশের চাকরিটাই জুটেছিল কপালে।

ও বাবা, আমি তা হলে এতক্ষণ একজন জবরদস্ত পুলিশ অফিসারের সঙ্গে বসে খেজুর করে যাচ্ছিলাম! কী সৌভাগ্য! বলতে কি আপনিই আমার জীবনের প্রথম পুলিশ—বন্ধু। অবশ্য বন্ধু বললে যদি আপনি অপমান বোধ না করে।

না, অপমান বোধ করব কেন?

আচ্ছা, পুলিশের রেকর্ডে আমার কী নাম আছে তা বলবেন?

মনোরঞ্জন রায়। সঞ্জীব সবরওয়াল—অর্থাৎ আপনার এমপ্লয়ার আপনাকে মনো বলে ডাকে।

ও বাবা! আপনি সবরওয়ালের নামও জানেন দেখছি! কী আশ্চর্য! আপনার ইনফর্মেশন তো একেবারে ঠিক! আমার নাম মনোরঞ্জন রায়, আমার মালিক সঞ্জীব সবরওয়াল আমাকে মনো বলে ডাকে। সবই তো মিলে যাচ্ছে! কিন্তু পুলিশের রেকর্ডে আমার নাম উঠল কেন বলুন তো! ক্রিমিন্যাল হিসেবে নাকি?

না। তবে একজন অত্যন্ত সন্দেহজনক এবং রহস্যময় মানুষ হিসেবে।

মশাই, আপনি আমার মাথা ফের গুলিয়ে দিলেন। আমার মতো একজন ডিসকোয়ালিফায়েড লোকের জীবনে সন্দেহজনক বা রহস্যময় কী থাকতে পারে বলুন তো!

সেটাই তো লাখ টাকার প্রশ্ন।

লাখ টাকার প্রশ্ন! কিচ্ছু বুঝতে পারলাম না। আমি নিজের সম্পর্কে আপনাকে যা বলেছি তা কি সবই মিথ্যে? আষাঢ়ে গল্প?

না। বরং আপনি নিজের সম্পর্কে অত্যন্ত সত্যি কথাই বলেছেন। আপনি নিজেকে যেমন বর্ণনা করেছেন আপনি ঠিক সেরকমই।

তবে?

আপনি একজন টোটালি ফ্রাস্ট্রেটেড, হতাশাবাদী উচ্চাশাহীন, আত্মবিশ্বাসহীন মানুষ। দুর্বলচিত্ত, দ্বিধাগ্রস্ত, ভিতু সবই ঠিক।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি ওরকমই তো!

অন্তত এক বছর আগে অবধি আপনি ওরকমই ছিলেন। আপনার একটা গুণ আছে। আপনি খুব প্রভুভক্ত মানুষ। সবরওয়াল আপনার কাছে ঈশ্বরতুল্য। এটা অন্যদের চোখে গুণ না হয়ে দোষ বলেও গণ্য হতে পারে। কিন্তু আপনার স্থির বিশ্বাস, সবরওয়ালের ওপরেই আপনার অস্তিত্ব নির্ভরশীল। আপনার আরও বিশ্বাস যে, পৃথিবীতে একমাত্র সবরওয়াল ছাড়া আর কেউ আপনাকে চাকরি দেবে না। আর তার ফলে প্রভুভক্ত হয়ে ওঠাটা আপনার অবশ্যম্ভাবীই ছিল।

হ্যাঁ, কথাটা খুব ভুল নয়। সবরওয়াল আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

আর সেই জন্যই সবরওয়ালকে বাঁচিয়ে রাখাটাও আপনার প্রয়োজন। তাই না?

সে তো ঠিকই।

যিশু দাস নামে কাউকে আপনার মনে পড়ে কি?

যিশু দাস! ও বাবা, সে তো বিরাট গুন্ডা ছিল!

হ্যাঁ, তোলাবাজ মস্তান। এলাকার টেরর। সবরওয়াল তাকে নিয়মিত তোলাও দিত। ব্যবসায়ীদের ওসব হিসেবের মধ্যেই ধরা থাকে। কাজেই কোনো গোলমাল ছিল না। কিন্তু মুশকিল হয়েছিল যিশু দাসের হঠাৎ ইচ্ছে হয়েছিল বম্বের একজন বিশেষ নায়িকাকে নিয়ে একটা হিন্দি ফিল্ম প্রোডিউস করবে। ওটাই নাকি ছিল তার জীবনের স্বপ্ন। সেই জন্য তার প্রচুর টাকার দরকার হয়ে পড়ে। আর সেজন্যই সে সবরওয়ালের কাছে পঞ্চাশ লাখ টাকা দাবি করে বসে। না হলে খুনের হুমকি দিতে থাকে। তার ফলে সবরওয়াল ভয় খেয়ে কারবার গুটিয়ে ফেলার কথা ভাবতে শুরু করে। ঝানু ব্যবসায়ীরা জানে টাকাটা দিলে এরপর দাবি আরও বাড়তে থাকবে। ঘটনাটা আপনার মনে আছে কি?

খুব আছে মশাই, খুব আছে। আমরা ভয়ে শুকিয়ে গিয়েছিলাম।

হ্যাঁ, সবরওয়ালের বিপদ ঘটলে আপনারও অস্তিত্বে সংকট। তবে যাই হোক, একদিন যিশু দাস হঠাৎ বেপাত্তা হয়ে যায়। তার পরিবার এবং গ্যাং তন্ন তন্ন করে তাকে খুঁজেছে, হিল্লিদিল্লিতেও খোঁজ করা হয়েছে, কোথাও তার সন্ধান পাওয়া যায়নি। খুন হয়ে থাকলে লাশটা তো পাওয়া যাবে। তাও পাওয়া যায়নি।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সবই জানি। অনেকে বলে যিশুর হঠাৎ মতির পরিবর্তন হয় এবং সে সাধু হয়ে কোথাও চলে গেছে।

আমাদের ধারণা আর একটু প্র্যাকটিক্যাল। তদন্তে জানা যায় যিশু দাসকে শেষবার দেখা গেছে সবরওয়ালের গোডাউনের কম্পাউন্ডে ঢুকতে। তারপর থেকেই সে বেপাত্তা। সন্ধের পর সে সবরওয়ালের গোডাউনে যায়। তারপর থেকেই তাকে আর দেখা যায়নি। তখন গোডাউনে প্রায় কোনো কর্মচারীই ছিল না। শুধু সবরওয়াল আর আপনি। গেটে অবশ্য দুজন দারোয়ান ছিল।

তা হবে হয়তো! আপনি কি বিশেষ কিছু ইঙ্গিত করছেন?

হ্যাঁ, আমার নিজস্ব ধারণা, যিশু দাস সবরওয়ালের গোডাউনেই খুন হয়ে যায়। সবরওয়াল কোনো ভাড়াটে গুণ্ডা আনায়নি বা তার কাছে কোনো অস্ত্রশস্ত্রও ছিল না। সবরওয়ালের কাছ থেকে যিশু বিদায় দেয় রাত আটটার কিছু পরে। যিশু সেদিন আলটিমেটাম দেওয়ায় সবরওয়াল খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ে। সে পুলিশকেও

ফোন করেছিল তার প্রোটেকশনের জন্য। সে নিজের অফিসঘরেই অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। অ্যাম্বুলেন্সে করে তাকে এক নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়া হয়।

ঘটনাটা আমার খুব মনে আছে। ওঃ কী টেনশনই গেছে। কিন্তু খুনের কথা কী যেন বলছিলেন?

বলছিলাম, আমার নিজস্ব রিকনস্ট্রাকশন অফ ইভেন্ট অনুযায়ী, যিশু দাস খুন হয় এবং তা হয় সবরওয়ালের গোডাউনের বিশাল চত্বরেরই কোথাও।

বলেন কী! এ তো সাঙ্ঘাতিক কথা!

না, খুব সাঙ্ঘাতিক কিছু নয়। একজন টোটালি ফ্রাস্ট্রেটেড লোক যখন নিজের অস্তিত্বের সমূহ সংকট দেখতে পায় তখন তার ভিতরে ঘুমন্ত ঘাতক জেগে উঠতেই পারে।

কী যে বলেন স্যার, কিছুই বুঝতে পারছি না।

একটা লোককে মেরে ফেলা খুব কঠিন কাজ নয়, যদি হাতে কোনো মারাত্মক অস্ত্র থাকে, যদি ভিকটিম অপ্রস্তুত থাকে এবং যদি খুব স্ট্রং মোটিভেশন থাকে, ঠিক কি না মনোবাবু?

আজ্ঞে, খুবই ঠিক স্যার। আপনি পুলিশ অফিসার, কত জানেন।

তনন্তকারী পুলিশেরা কিন্তু কোনো সূত্রই পায়নি। এমনকী এটা মার্ডার কেস না অ্যাবডাকশন না নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া তারা আজও জানে না। কেসটার চার্জে আমি ছিলাম না। তবে শুনেছি। যিশু যেসব ঠেক থেকে তোলা আদায় করত তার সব কটা আমি একে একে গিয়ে দেখেছি। সবচেয়ে লাইকলি স্পট বলে আমার মনে হয়েছে সবরওয়ালের গোডাউনের বিরাট চত্বর। আমি কখনো আপনাকে জেরা করিনি বা মুখোমুখিও হইনি। শুধু আড়াল থেকে দুদিন আপনাকে একটু ওয়াচ করেছি। আপনাকে সবসময়ে শহব্যস্ত, টেনশনে ভোগা নিরীহ লোক বলেই আমার মনে হয়েছে।

হ্যাঁ স্যার, আমিও তো তাই বলতে চাইছি।

কিন্তু আপনার চোখে সেই গ্লিন্টটা আছে।

সেটা কী জিনিস স্যার!

গ্লিন্টকে বাংলায় ঠিক কী বলে তা জানি না। একটা ঝলকানির মতো। একটা ঝিলিক। ঠিক বোঝানো যাবে না। অ্যান্ড দেয়ার ওয়াজ দ্যাট গ্লিন্ট ইন ইওর আইজ। খুনি চিনতে আমার ভুল হয় না মনোবাবু।

হাসব না কাঁদব তা বুঝতে পারছি না স্যার।

প্রবলেম হল যিশুর ডেডবডিটা নিয়ে। খুন হয়ে থাকলে তার লাশ যাবে কোথায়। আমি একদিন সকালে, যখন কেউ কাজে আসেনি, জায়গাটা তন্ন তন্ন করে দেখি। উত্তর—পশ্চিম দিকে একটা ন্যাচারাল ডিচ আছে। পাঁচ ছ—ফুট ডায়ামিটারের একটা ডিচ। চারদিকে প্রচুর আগাছা থাকায় গর্তটা চোখেই পড়ে না। টর্চ ফেলে দেখি, বেশ গভীর। অন্তত আট দশ ফুট নীচে ডিচের তলায় কয়েকটা সিমেন্টের চাঙড়। জলে ভিজলে সিমেন্ট জমে যায়, আর সময়টা ছিল বর্ষাকাল। আমার অনুমান ডিচের মধ্যে একটা ডেডবডি ফেলে ওপরে কয়েক বস্তা সিমেন্ট ঢেলে দিলে কাজটা এগিয়ে থাকে। সিমেন্টের ওপর অবশ্য যথেষ্ট রাবিশও ফেলা হয়েছে।

হ্যাঁ স্যার, গোডাউনে মাঝে মাঝে এক—আধটা সিমেন্টর বস্তা জমে যায়। সেগুলো ডিচের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়।

হ্যাঁ, তা আমি জানি। ওই চাঙরগুলোর মধ্যে যদি যিশুর খণ্ডবিখণ্ড অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো পাওয়া যায় তাহলে আমি অবাক হব না। তবে আমি চাঙড়গুলো ভেঙে দেখিনি। সবই আমার অনুমান।

স্যার, কেন যে ওসব ভয়ংকর অনুমান করছেন কে জানে। যিশু মস্ত গুন্ডা, সে যদি খুন হয়েও থাকে সেটা তার সমকক্ষ লোকই করেছে।

আপনি যিশুর সমকক্ষ নন?

পাগল! কী যে বলেন স্যার!

নরম্যালি, যিশু যদি বাঘ তো আপনি ইঁদুর। কিন্তু যখন অস্তিত্বের সংকট দেখা দেয়, প্রভুভক্ত যখন প্রভুর বিপদের গন্ধ পায় তখন বিশেষ সিচুয়েশনে অর্ডার অফ পারসোনালিটিজ উলটে যেতে পারে। তখন বাঘ হয়ে যায় ইঁদুর, ইঁদুর বাঘের জায়গা নেয়।

স্যার, আপনার কথা শুনে বড্ড ভয় পাচ্ছি।

কেন, ভয়টা কিসের?

আপনি যা সব বললেন সেগুলো কি ভয়ের কথা নয়? একটা নেংটি ইঁদুর হঠাৎ হালুম—বাঘা হয়ে উঠলে সে নিজেই যে ভয় খেয়ে যাবে। না মশাই, না, আপনি আমার ভিতরে ভুল জিনিস দেখেছেন। আমি ওরকমই নই।

সেটা আমিও জানি। আপনি ওরকম নন।

আজ সকালেই তো বাজারে পাতিলেবু কিনতে গিয়ে একটু দরাদরি করছিলাম, লেবুওয়ালা এমন রক্ত—জল—করা চোখে চাইল যে আমি পালানোর পথ পাই না।

হ্যাঁ, আপনি ওরকমও বটে। খুব ভিতু, ঝঞ্ঝাটবিরোধী, এসকেপিস্ট।

তাহলেই বুঝুন, আপনি আমাকে ভুল অ্যাসেস করছেন কি না।

না, তাও করছি না। খুনের কিনারা করার দায়িত্ব আমাকে কেউ দেয়নি। যিশু দাস মোট বাইশটা খুন করেছে বলে পুলিশের হিসেব আছে। বেঁচে থাকলে সে হয়তো আরও বাইশটা খুন করত। সুতরাং তার লোপাট হওয়া নিয়ে পুলিশের তেমন মাথাব্যথাও নেই। তবে হাঁ, সে বেঁচে থাকলে পুলিশ তার কাছ থেকে কমিশন পেত। সেইটেই যা লস। কিন্তু আমার ইন্টারেস্ট অন্য জায়গায়। সেটা আপনি।

কী যে বলেন স্যার, এ যে অবিশ্বাস্য! তবে বিশ্বাস করতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে। জীবনে আমাকে কেউ এত ইম্পর্ট্যান্স দেয়নি।

তারা ভুল করেছে। আপনার ইম্পর্ট্যান্স এতটাই বেশি যে, আমি অনেক খোঁজখবর নিয়ে, আপনার ডেলি রুটিন চেক করে তবে এই পার্কে ঠিক আপনার পাশে এসে বসে আছি।

আমার ভারী গুমোর হচ্ছে স্যার, বুকটা ফুলে উঠছে অহংকারে।

আপনি যিশুকে মারার জন্য কি লোহার রড ব্যবহার করেছিলেন মনোবাবু?

আপনি যে কেন আমাকে বারবার ঠেলে খুনখারাপির মধ্যে নিয়ে যাচ্ছেন বুঝতে পারছি না। তবে আমি স্বীকার করি লোহার রড একটি মারাত্মক জিনিস।

স্বীকার করেন?

হ্যাঁ, আমাদের কারখানায় একজন লেবারের বাঁ চোখের ভিতর দিয়ে কেবার একটা রড ঢুকে গিয়েছিল তার মাথার মধ্যে, তক্ষুনি মারা যায়। ঘটনাটা ভাবলে এখনও শিউরে উঠি।

যিশুকে কি ওভাবেই মারা হয়েছিল মনোরঞ্জনবাবু? চোখের ভিতরে রড ঢুকিয়ে?

কি করে জানব স্যার? ওসব যে বীভৎস ব্যাপার।

আর তার ডেডবডিটা? সিমেন্টের মধ্যে ঢুকিয়ে, জল ছিটিয়ে হুইলব্যারোতে নিয়ে গিয়ে ডিচের মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেন?

মা গো! আপনি যে কীরকম সব ভয়ংকর কথা বলেন! আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

বাঁচার জন্য মানুষ তো সবকিছু করতে পারে। তাই না?

তা অস্বীকার করছি না স্যার। তবে আমি বলতে চাই, আপনি ভুল লোককে সন্দেহ করছেন। আমি সে—নই।

আমি তা স্বীকার করি। এই যে মনোরঞ্জন আমার পাশে এখন বসে আছে সে খুনি নয়, মারকুট্টা নয়, ভয়ংকর নয়। কিন্তু এই মনোরঞ্জনের মধ্যে আরও একজন মনোরঞ্জন সেই দিন জেগে উঠেছিল, তাকে আমিও চিনি না, আপনিও চেনেন না।

তার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই স্যার।

জানি। কিন্তু সে যখন একবার জেগেছে তখন প্রয়োজন দেখা দিলেই সে কিন্তু আবার জাগবে।

সেটা তো ভয়ের ব্যাপার স্যার।

হ্যাঁ, আপনাকে সেই মনোরঞ্জন সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিতেই আমার আসা। পুলিশ আপনাকে ধরতে পারবে না, আপনার ফাঁসি বা জেলও হবে না, কিন্তু আমি তবু বলছি, আপনি বিপন্ন। ওই ভয়ংকর মনোরঞ্জন কিন্তু আপনাকে সহজে রেহাই দেবে না।

চলে যাচ্ছেন স্যার?

হ্যাঁ।

যাবেন না স্যার, আর একটু বসুন।

কেন?

একা থাকতে আমার বড় ভয় করছে স্যার। দয়া করে অন্তত আমাকে বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে যান।

কাকে ভয় পাচ্ছেন মনোরঞ্জনবাবু?

আজ্ঞে, মনোরঞ্জনকে।

# পোকা

পোকাটাকে মেরে ফেলার পর ভারী অস্বস্তি হচ্ছিল বদ্যিনাথের। অস্বস্তির কারণ পোকাটা তার কোনো ক্ষতি করেনি, হুল দেয়নি, কামড়ায়নি। এমনকী সেটা বিষাক্ত পোকা কিনা তাও জানে না বদ্যিনাথ। পোকামাকড় সে তেমন চেনেও না। ভীমরুল, বোলতা, মৌমাছি বা এ—জাতীয় পোকাদের সম্পর্কে একটা আবছা ধারণা আছে মাত্র, ঠিকঠাক তফাত ধরার ক্ষমতা নেই। এই পোকাটা দেখতে অনেকটা হয়তো ভীমরুলের মতোই, তবে রোগা, ছোট এবং দুর্বল। গত কয়েকদিন ধরেই বারবার জানালা দিয়ে উড়ে এসে তার ঘরের নানা জায়গায় বসছিল। হাবভাব দেখে মনে হয়েছিল এই ঘরে একটা বাসাটাসা কিছু করার মতলব। যদি তাই হয় তো চিন্তার কথা। ঘরে একটা পোকার চাক হলে সেটা নিরাপদ হওয়ার কথা নয়, তা বোলতা, ভীমরুল বা মৌমাছি, যার চাকই হোক।

আজ বদ্যিনাথ সকালবেলায় তার লেখাপড়া করার টেবিলে বসে একটা হিসেব কষার চেষ্টা করছিল। তখনই সেই কালচে এবং হলদে পোকাটা উড়ে এসে টেবিল ল্যাম্পের ওপর বসে কিছুক্ষণ এদিক—ওদিক ঘুরে বেড়াল। তারপর উড়ে বিপজ্জনকভাবে বদ্যিনাথের সামনে দিয়েই প্রায় তার গোঁফ ছুঁয়ে শূন্যে চক্কর মেরে জলের বোতলটার ওপর গিয়ে বসল। তার পরের স্টেশন ছিল বদ্যিনাথের নোকিয়া মোবাইল ফোনটা। সেটা ছেড়ে টেবিলে বইপত্রের ফাঁকে ঢুকে এবং বেরিয়ে কী যে খুঁজতে লাগল তা বলা মুশকিল। পোকাটা কতটা বিপজ্জনক, হুল দেয় কিনা, দিলেও তা কতটা বিষাক্ত এসব ভেবে হিসেবটা আর এগোল না বদ্যিনাথের। কলকাতা শহরে পোকামাকড়গুলো যে কোথা থেকে আসে কে জানে!

বদ্যিনাথ হৃদয়হীন বা নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক নয়। বরং সে বেশ কিছুটা দয়ালু, প্রচণ্ড ভিতু এবং কাপুরুষ। এ পর্যন্ত যে ক—টা অন্যায় কাজ সে করেছে, তার মধ্যে বেশিরভাগই করেছে ভয় পেয়ে এবং বুদ্ধির দোষে। আজকেও করল। পোকা মারার স্প্রেটা সিঁড়ির তলা থেকে নিয়ে এসে ওত পেতে রইল। বইয়ের খাঁজ থেকে পোকাটা বেরিয়ে সবে উড়েছে, ঠিক সেই সময়ে স্প্রেটা চেপে দিল সে। খুব বেশি নয়, মারার ইচ্ছেও ছিল না, তাড়ানোর জন্যই খুব সামান্য একটা হালকা ঝাঁক। কিন্তু তাতেই পোকাটা লাট খেয়ে পড়ল। বার দুই ওড়ার চেষ্টা করে খানিক উড়ে উড়ে শেষ অবধি আর পারল না। পড়ে বার কয়েক কুঁকড়ে হামাগুড়ি দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে, বিনা আর্তনাদে, বিনা প্রতিবাদে এবং পালটা আক্রমণের কোনো চেষ্টা না করেই, মরে গেল।

বদ্যিনাথের ভাবনা—সূত্রটা, অর্থাৎ কিনা অনুশোচনার পরম্পরাটা শুরু হল পোকাটা মরার পর থেকেই। এতে কি তার পাপ হল? যদি হয়েই থাকে, তাহলে এ পাপের জন্য অন্তরীক্ষে তার জন্য কোনো দণ্ডাজ্ঞা অলক্ষ্যে বহাল হল কি? আর সেই শাস্তির অর্থ কি ভবিষ্যতে তার জন্যও এরকম ক্লেশদায়ক অতর্কিত মৃত্যু? বা অন্যরকম কিছু?

সে নাস্তিক বটে, কিন্তু দুর্বল নাস্তিকের নানা সমস্যা আছে। তার কররেখা দেখে কোনো জ্যোতিষী যদি বলে যে, আপনার মশাই খুব বড় ফাঁড়া আছে, তাহলে সে ভয় পেয়ে যায়। জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাস না করেও ভয়টা হতেই থাকে। এই পাপ ও প্রায়শ্চিত্তের চিন্তাও তার দুর্বল নাস্তিকতারই ফল।

এটা একটা অভাবে—পীড়িত বাড়ি। কিন্তু বাড়িটা বিরাট এবং শরিকি ঝগড়াও আছে। বদ্যিনাথ আর তার বিধবা মা এর মধ্যে গোঁজ হয়ে আছে মাত্র। শোনা যায়, এটা তার মামাবাড়ি হলেও এখানে তার মায়ের ন্যায্য অধিকার এবং বখরা আছে। কিন্তু সেটা হল আইনের কথা। বাস্তব চিত্র হল, মামারা তাদের যে কোনো সুযোগে ঘাড় ধরে বের করে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছে। দু—টি মাত্র খুপরি ঘরে নিজেদের কায়েম

রাখার জন্য সে আর তার মা ভয়ে একসঙ্গে কোথাও বেরোয় না। বেরোলেই পাছে বেদখল হয়ে যায়। পাঁচজন দজ্জাল মামি এবং মামাতো ভাইবোনদের দাপটে, ঝগড়ায় এবং শাসানিতে তারা সর্বদাই কোণঠাসা। কলঘর নিয়ে সমস্যা আছে, রান্নাঘর নিয়ে সমস্যা আছে, কাপড় শুকোতে দেওয়ার সমস্যা আছে। মানসম্মানের সমস্যা তো আছেই। বদ্যিনাথ নিজেই এক মূর্তিমান সমস্যা। বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান বলে সে মানুষ হয়েছে মায়ের আঁচলের আড়ালে। গায়ে আঁচটি পর্যন্ত লাগেনি। ফলে তার বাস্তববোধ হল না, সে ডাকাবুকো রোখাচোখা হল না, বলিয়ে কইয়ে হল না। হয়ে রইল মিনমিনে, ভিতু। তার লেখাপড়াটাও ঘেঁটে গিয়েছিল। এলইই পাশ করে চাকরির সুবিধে হল না বলে ফের তেড়েফুড়ে বিএ পাশ করে। তারপর বিস্তর হাঁটাহাঁটি ধরকরা করে গড়িয়া থেকে ত্রিশ মাইল দূরে একটা স্কুলে পার্শ্বশিক্ষক। দু—বার বাস বদল করে গিয়ে দু—মাইল হাঁটাপথ। গাড়িভাড়াতেই বেতন প্রায় লোপাট হয়ে যায়।

আজ বাসের জানালার ধারেই বসার জায়গা পেয়ে গিয়েছিল বদ্যিনাথ। জানালার ধার পেলে মনটা বড় খুশি হয়। কিন্তু আজ মনটা খুশি নেই। সকালেই আজ তার হাত দিয়ে একটা পাপ হয়ে গেল। একটা অচেনা পোকা মরে গেল বিনা দোষে। হুল দিলে বা কামড়ালেও না হয় কথা ছিল। মনে কোনো অজুহাত খুঁজে পাচ্ছে না সে।

এই স্কুলে মিড—ডে মিল চালু আছে। আর এইটেই একটা ভারী খুশির ব্যাপার বদ্যিনাথের কাছে। তারাও বেজায় গরিব বটে, কিন্তু তবু তো মা রোজ পেট ভরে ভাত খাইয়ে দেয়। আজও উচ্ছেভাজা, ডাল আর আলুসেদ্ধ দিয়ে খেয়ে এসেছে। সঙ্গে এনেছে রুটি—তরকারির টিফিন। কিন্তু এই বাচ্চাদের তো জেটে কই? চুড়ানির মা বড় কড়াইতে রেঁধে দেয়। যখন খাওয়ার ডাক পড়ে তখন যেন বাচ্চাদের মধ্যে উৎসব। বদ্যিনাথ রোজ গিয়ে ওদের খাওয়া দেখে আসে।

আজও দেখছিল। খোলা মাঠে যেন ভোজবাড়ি। আয়োজন অবশ্যই যৎসামান্যই। বড্ড মোটা চাল, আর একটা পাতলা ডালের মতো। তাতে ছিটেফোঁটা সবজি আছে কি নেই। তাতে কী! খাচ্ছে তো নোহেন মুখ করে। ওইটেই আসল। ওই আনন্দটা। যারা রোজ মাংস—বিরিয়ানি খায় তারা কি এই আনন্দের সন্ধান জানে?

শিক্ষক হিসেবে এই স্কুলে তার তেমন কদর নেই। মুখচোরা বলে তেমন পাত্তাও পায় না কারও কাছে। সে টিচার্স রুমে একপাশটিতে বসে থাকে। বই পড়ে।

উমাকান্তবাবু হঠাৎ আজ তাকে ডেকে বললেন, ওহে বদ্যিনাথ!

যে আজ্ঞে।

তুমি না শুনেছিলুম ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং না কি একটা পড়েছিলে।

ভারী সংকুচিত হয়ে বদ্যিনাথ বলে, ও একটা ডিপ্লোমা কোর্স।

আহা, তার মানে ইলেকট্রিকের কাজ তো খানিকটা জানো।

সামান্যই জানি।

ওতেই হবে। হেডস্যারের বাড়িতে একটা টেবিলপাখা আছে, সেটাতে হাত দিলেই শক দেয়। এখানে তো মিস্তিরি—টিস্তিরি পাওয়া যায় না। দেখবে নাকি একটু?

ও তো সামান্য ব্যাপার।

আমি বলে রাখছি। ছুটির পর ওঁর সঙ্গে একটু ওঁর বাড়ি যেও।

যে আজ্ঞে।

তা গেল বদ্যিনাথ। পাখাটা খুলে টার্মিনালগুলো ভালো করে জুড়ে মেশিনের তেল দিয়ে চালু করে দিল। বলল, আমার সঙ্গে টেস্টার নেই, তবে হাত দিয়ে দেখবেন আর শক দেবে না।

হেডস্যার ভারী খুশি। বললেন, একটা ঘষটানির আওয়াজও ছিল, সেটাও তো নেই দেখছি।

আজ্ঞে না।

মেয়েকে ডেকে হেডস্যার বললেন, ওরে চুনি, এই যে তোর পাখা ঠিক হয়ে গেছে। বোসো বদ্যিনাথ, চা খেয়ে যাও।

চা হল, সঙ্গে মুড়ি বেগুনি। দিব্যি কেটে গেল বিকেলটা।

ফেরার সময়েও জানালার ধারে সিট। বদ্যিনাথ বাইরের দৃশ্য আনমনে দেখতে দেখতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। গড়িয়ায় এসে ঘুম ভাঙতেই তড়বড় করে নেমে পড়ল।

সন্ধেবেলা পোকা মারার শোকটা আর তেমন রইল না বদ্যিনাথের।

মানুষের সভ্যতার অগ্রগমন মানেই তো জীবজন্তু, পোকামাকড় আর বৃক্ষের নিধন। সুতরাং খুব বড় একটা পাপ সে হয়তো করে ফেলেনি।

বাড়িতে ফিরে টেবিলের তলা থেকে নিজের বিস্মৃতপ্রায় টুল বক্সটা বের করল বদ্যিনাথ। সে ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে সম্মানজনক একটা চাকরি চেয়েছিল, মিস্তিরি হতে চায়নি। কিন্তু আজ টুল বক্সটা খুলে নানা সাইজের প্লায়ার্স, স্ক্রু ড্রাইভার, অ্যামিটার, ভোল্টমিটার সব দেখে তার মনটা কেমন করে উঠল। বেশ কষ্ট করে শেখা একটা বিদ্যে ইচ্ছে করে ভুলে যাওয়া কি ভালো? অনেকক্ষণ যন্ত্রপাতিগুলো নাড়াচাড়া করল বদ্যিনাথ।

দিন তিনেক বাদে শশাঙ্কবাবু একটা টোস্টার ঝোলা নিয়ে স্কুলে এসেই বদ্যিনাথকে ধরলেন, এটা সারিয়ে দাও তো ভাই, তুমি নাকি ওস্তাদ লোক।

বদ্যিনাথ অমায়িক হাসল! তারপর জিনিসটা উলটেপালটে দেখে বলল, কয়েল কিনতে হবে যে। কয়েল পুড়ে গেছে।

তাহলেও তুমি সঙ্গে নিয়ে যাও, কালপরশু সারিয়ে নিয়ে এসো। এখানে ওসব কয়েল—টয়েল পাওয়া যায় না।

আবদারটা রাখতে হল তাকে। গড়িয়ার বাজারে নেমে কয়েল কিনে রাতে বসে বসে সারিয়ে দিল। পরদিন শশাঙ্কবাবু যন্ত্র পেয়ে খুব খুশি!

কত দেব তোমাকে ভায়া?

কিছু দিতে হবে না।

তা বললে কি হয়, কয়েল কিনতে তো পয়সা লেগেছে।

একদিন চা খাইয়ে দেবেন তাহলেই হবে।

এইরকম ছোটখাটো আবদার প্রায়ই আসতে লাগল। সে যে একজন ইলেকট্রিক মিস্তিরিই, সেটাই কি প্রচার হয়ে গেল নাকি?

মাসখানেকের মাথায় হেডস্যার তাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে এক ছোকরার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, এ আমার ভাগনে। প্রোমোটারি করে। তোমার সাহায্য চায়।

আমার সাহায্য! বদ্যিনাথ তো অবাক।

ছোকরা বলল, আসলে আমি একটা প্রজেক্টে হাত দিয়েছি, কিন্তু ইলেকট্রিশিয়ান নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। কনসিলড ওয়্যারিং—এর কাজ, সব ফ্ল্যাটেই হেভি ডিউটি এসি বসবে। প্ল্যানে গন্ডগোল থাকলে মুশকিল। আপনি যদি একটু সুপারভাইজ করেন—দিনে দু—তিন ঘণ্টা হলেই হবে—আমি আপনাকে ফি দেব। এরা কেউ পাস করা ইলেকট্রিশিয়ান তো নয়, দেখে দেখে শিখেছে। আগের প্রোজেক্টে সার্কিট ব্রেকার নিয়ে প্রবলেম হয়েছিল।

হেডস্যারের ভাগনে বলে কথা, বদ্যিনাথকে রাজি হতে হল।

শুধু সুপারভাইজ নয়, নিজের হাতে অনেকটা করেও দিল বদ্যিনাথ। নতুন করে প্ল্যানও করতে হল।

হেডস্যারের ভাগনে লোক খারাপ নয়। কাজের শেষে পাঁচ হাজার টাকা পকেটে গুঁজে দিয়ে বলল, আমার সঙ্গেই থাকুন স্যার। আরও প্রজেক্ট হাতে আছে আমার। আমি ঠকাব না।

টাকাটা নিতে একটু বাধো বাধো ঠেকছিল তার। মিস্তিরিগিরির মজুরি পেল নাকি?

দু—বছর পরের বদ্যিনাথকে বদ্যিনাথই আর চিনতে পারে না। গড়িয়ার বড় রাস্তায় তার অফিস—কাম—দোকান। বারো—তেরো জন কর্মচারী। এবং রকরম করছে তার দোকান মানুষের গমনাগমনে। বিয়েবাড়ি, পুজো প্যান্ডেল, লেজার শো সবেতেই তার প্রচুর চাহিদা। বদ্যিনাথের এখন সময় নেই। খালের ওপাশেই তার দোতলা বাড়ি। মামাবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচে গেছে। সে আর গাঁয়ের স্কুলের পার্শ্বশিক্ষক নয়। গত অঘ্রানেই তার বিয়ে হয়েছে। নতুন বউ বেশ মিষ্টি দেখতে।

সকালবেলা নিজের টেবিলে বসে কম্পিউটারে ইন্টারনেট করছিল বদ্যিনাথ। ঠিক এই সময়ে পোকাটা এল। রোগা, দুর্বল, হলুদ আর কালোতে মেশানো রং। জানালা দিয়ে এসে প্রথমেই ঘরে খানিক চক্কর কাটল। আর কট করে একটা শব্দ তুলে এসে বসল তার কম্পিউটারের মনিটরটার পরদায়। দিব্যি ঘুরে বেড়াতে লাগল।

কাজের সময় ব্যাপারটা ভারী বিরক্তিকর। তার ওপর হুল দেবে কিনা, কামড়াবে কিনা সেসব প্রশ্নও আছে। বদ্যিনাথ উঠে গিয়ে স্প্রেটা নিয়ে এল। তারপর বিনা দ্বিধায় এক ঝাঁক বিষ স্প্রে করে দিল পোকার ওপর।

পোকাটা সভয়ে শূন্যে উঠল। কিন্তু পারল না। একটা লাট খেয়ে পড়ল টেবিলের ওপর। ফের ওড়ার একটা অক্ষম চেষ্টা। তারপর কুঁকড়ে গিয়ে টেবিলের কাচেই কয়েকবার ঘুরপাক খেয়ে স্থির হয়ে গেল। বদ্যিনাথ একটুকরো কাগজে মৃত পোকাটাকে তুলে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিল। তারপর ঝুঁকে অখণ্ড মনোযোগে সে ইন্টারনেট অপারেশনের মধ্যে ডুবে গেল।

পোকাটার কথা তার আর মনেই রইল না।

# পটুয়া নিবারণ

আমাদের নিবারণ কর্মকার ছিলেন আঁকিয়ে মানুষ। লোকে বলত বটে পটুয়া নিবারণ—কিন্তু তাঁর ছবি—টবি কেউ কিছু বুঝত না। সেই অর্থে পট—টট কখনো আঁকেননি নিবারণ কর্মকার। যদিও ঠিক পটুয়া ছিলেন না নিবারণ, তবু তাঁর আঁকার ধরনধারণ ছিল অনেকটা পটুয়াদের মতোই। তুলির টান, রঙের মিশ্রণ—সবকিছুই ছিল সেই পুরোনো ধরনের। শুধু বিষয়বস্তুতেই তাঁর নতুনত্ব কিংবা মতান্তরে নির্বুদ্ধিতা ধরা পড়ত। আমি তাঁর আঁকা একখানা বাঘের ছবি দেখেছিলাম যার পেটটা ছিল কাচের মতো স্বচ্ছ, আর সেই পেটের ভিতরে দেখা যাচ্ছে একটি গর্ভবতী মেয়ে শুয়ে আছে—বাঘের পাকস্থলীর ওপর তার মাথা, বাঘের হৃৎপিণ্ডের ওপর তা পা, বিরাট ঢাউস পেটটা বাঘের মেরুদণ্ড পর্যন্ত ফুলে আছে, আর মেয়েটির সেই পেটের প্রায় স্বচ্ছ চামড়ার ভিতর দিয়ে কোষবদ্ধ প্রায়—পরিণত ভ্রূণটিকেও দেখা যাচ্ছে। মেয়েটি ও ভ্রূণ এই দুই জনের মুখেই নির্লিপ্ত, নির্বিকার হাসি। সব মিলিয়ে দেখলে কিন্তু বাঘটার জন্যই দুঃখ হয়। তার গোঁফ ঝুলে গেছে, অকালবার্ধক্যে তার চোখ কোটরগত ও হিংস্রতাশূন্য। ছবির নীচে লেখা 'গর্ভবতী নারীকে ভক্ষণ করিয়াছ, এখন কেমন মজা?'

'পাপের পরিণাম' সিরিজে যে কখানা ছবি এঁকেছিলেন নিবারণ কর্মকার, বাঘের ছবিটা ছিল তার দ্বিতীয় ছবি। সবগুলো ছবি আমি দেখিনি, কিন্তু যে কয়েকটা দেখেছি তার প্রতিটিই ছিল খানিকটা হিংস্র প্রকৃতির ছবি। যেমন মনে পড়ে একটি ছবিতে একটি অতিকায় বানর একটি কুমারী কন্যার সতীত্ব হরণ করছে—এমনি একটা বিষয়বস্তু এঁকেছিলেন পটুয়া নিবারণ। নীচে লেখা 'সূক্ষ্মদেহীর প্রত্যাবর্তন ও নির্বিকার কাম—অভ্যাস।'

আমাদের নিশিদারোগার মেয়ে শেফালীর একবার অসুখ হল। শক্ত ব্যামো। হরি ডাক্তার এসে বলে গেল, 'সর্বনাশ! এ মেয়ে বাঁচলে হয়! অসুখ শরীরে যতটা, মনেও ততটা। মন ভালো রাখা চাই। ওকে কখনো কোনো অভাব দুঃখ কষ্টের কথা বলা বারণ, কোনো মৃত্যুর খবর দেওয়া বারণ। আর ও যা চায় ওকে তাই দিন।'

তাই হল। শেফালীর ঘর থেকে ধুলো ময়লা, কালো ঝুল, পিকদানি, ইঁদুর আরশোলা দূর করে দেওয়া হল, বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল কালো বেড়ালটাকে। তারপর ডাক পড়ল পটুয়া নিবারণের। মন ভালো থাকে এমন ছবি এঁকে টাঙিয়ে দিতে হবে ঘরে দেওয়ালে।

পট এঁকেছিলেন নিবারণ। খুব পরিশ্রম করেই এঁকেছিলেন। একটা ছবিতে ছিল নদীর তীরে একপাল বাচ্চা ছেলেমেয়ে পরস্পরের মুণ্ড খেলাচ্ছলে কেড়ে নিয়ে এর মুণ্ড ওর ঘাড়ে বসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে; কারও মুণ্ডই যথাস্থানে নেই, এর মুণ্ড ওর হাতে, ওর মুণ্ড এর হাতে রয়েছে; আর সেই কবন্ধ ছেলেমেয়েদের দেহগুলি নিরানন্দ ও কঙ্কালসার। ছবির নাম দেওয়া ছিল 'একের মুণ্ড অন্যের ঘাড়ে চাপাইবার পরিণাম।' 'রাক্ষসীর প্রসব' নামে আর একটা ছবিতে ছিল এক বিকট দর্শন রাক্ষসী তার সদ্যজাত সন্তানকে বৃক্ষচ্যুত ফলের মতো স্বহস্তে ধারণ করছে, আশেপাশে ইতস্তত কয়েকটা রাক্ষস—শিশুর কঙ্কাল পড়ে আছে। স্পষ্টই বোঝা যায় রাক্ষসী ইতিপূর্বে তার পূর্বজাত সন্তানদের ভক্ষণ করেছে এবং আশু সন্তান—ভক্ষণের আনন্দে তার মুখ লোল, চোখ উজ্জ্বল।

এই সব ছবি দেখার ফলেই হোক কিংবা অন্য কোনো কারণেই হোক হরি ডাক্তারের সমস্ত চেষ্টা বিফল করে নিশি দারোগার মেয়ে শেফালী একদিন টুক করে মরে গেল। যতদূর জানা যায় বিকট ছবি এঁকে দারোগার মেয়ের মনে ভীতি উৎপাদনের অপরাধে গোপনে নিবারণের ওপর কিছু অত্যাচার হয়েছিল।

তাইতেই মনমরা হয়ে গেলেন পটুয়া নিবারণ। কেননা ছবি—আঁকা ছিল তাঁর প্রাণ। ছবিতেই কথা বলতে চাইতেন নিবারণ, সংসারের নানারকম মারকে ছবি দিয়েই ঠেকাতে চাইতেন। ছবি আঁকা ছাড়া আর কিছুই শেখেননি তিনি। নিশি দারোগা তাঁর সেই ছবি—আঁকা প্রায় বন্ধ করে দেবার যোগাড় করলেন। কেননা কথা ছিল শেফালীর মনে হবে যে তার চারিদিকে গাছপালা লতা ফুল পাখি মেঘ ও বাতাস রয়েছে—প্রকৃতি—টকৃতির ভিতরেই রয়েছে সে—এবং এইভাবে এক জটিল মানসিক প্রক্রিয়ায় কিছুকাল প্রকৃতি—ভক্ষণ করলে শেফালীর রোগের উপশম হতে পারত। অন্তত হরি ডাক্তারের এই রকমই ধারণা ছিল।

এদিকে নিবারণের বয়স হয়ে এসেছিল। ছবির দিকেও ভাঁটা পড়ছিল। কেননা জনশ্রুতি শোনা গেল পটুয়া নিবারণের যাবতীয় শিল্পকর্ম তাঁকেই আক্রমণ করতে শুরু করেছে। ভয়ে তিনি ঘরে ঢুকতে পারেন না। স্বপ্নের ভিতরেও তিনি স্বচ্ছ পেটওয়ালা বাঘ, মুণ্ডহীন ছেলেমেয়ে ও দারোগার কঙ্কাল—ভক্ষণ দেখতে শুরু করেছেন। তাঁর ক্রমশ বিশ্বাস হচ্ছিল একদিন এরা সবাই ছবি ছেড়ে বেরিয়ে আসবে এবং রুগ্ন অশক্ত ও বৃদ্ধ অবস্থার কোনো সুযোগে তাঁকে আক্রমণ করবে। সুতরাং কয়েকদিন তিনি সুন্দর ও স্বাভাবিক কিছু আঁকবার চেষ্টা করে দেখলেন—ছবি ছেড়ে বেরিয়ে এলেও যা তাঁর খুব বেশি ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু কিছুই আঁকতে পারলেন না। এই সময়ে তিনি শক্ত সমর্থ একজন সঙ্গী খুঁজছিলেন—যে তাঁকে তাঁর শিল্পকর্মের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে। আর ছবি—আঁকা ভুলবার জন্য তিনি অন্যদিকে মন দিলেন। কখনো দেখা যেতে লাগল নিবারণ উঠোনের মাটি কোপাচ্ছেন, নয়তো ছাঁচতলা থেকে কন্টিকারির ঝোপ টেনে তুলে সাফ করছেন। যদিও বিয়ে করেননি, তবু মনে হচ্ছিল, সংসারে মন দিয়েছেন পটুয়া নিবারণ। এইবার হয়তো বিয়ে করবেন।

করলেনও।

মিস কে. নন্দীর নামডাক আজকাল আর শোনা যায় না। শোনবার কথাও নয়। তিনি যেসব খেলা দেখাতেন, আজকাল আর তা চলে না। কিন্তু আমাদের আমলে সেইসব খেলা দেখিয়েই দারুণ নাম হয়েছিল মিস কে. নন্দীর। 'প্রবর্তক সার্কাস' যখন নানা জায়গায় ঘুরছিল তখনই মুখে মুখে অমানুষিক শক্তিসম্পন্ন সর্বভুক মহিলা মিস কে. নন্দীর নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। মনে পড়ে মিস কে. নন্দীর জন্য প্রবর্তক সার্কাসে একটা আলাদা তাঁবু ছিল—যার চারদিকে সারাদিন ভিড় লেগে থাকত। সার্কাসের খেলা আরম্ভ হলে এই তাঁবু থেকেই একটা চাকাওয়ালা খাঁচায় মিস কে. নন্দীকে নিয়ে আসা হত রিংয়ের পাশে। হই—হই পড়ে যেত চারদিকে। কিন্তু মিস কে. নন্দীকে দেখা যেত না—খাঁচার চারপাশে কালো পরদা ফেলা। ওর ভিতরে বাস্তবিক কে. নন্দী আছেন কিনা বা থাকলেও কি করছেন কিছুই বুঝবার উপায় ছিল না। এদিকে ক্রমে ট্রাপিজের খেলা, দড়ির ওপর নাচ, ভৌতিক চক্ষু এবং বাঘ সিংহের খেলা শেষ হয়ে আসত। তারপর একজন স্যুট টাই পরা লোক পরদা সরিয়ে একটা গোপন দরজা দিয়ে খাঁচার ভিতরে ঢুকে যেত। কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে নিত। হাততালিতে কানপাতা দায় হত তখন। আর তখন দেখা যেত মিস কে. নন্দীকে। প্রকাণ্ড নয়, বরং রোগাই বলা যায় কে. নন্দীকে. রং কালো। পরনে গোলাপি রঙের সাটিনের হাফ প্যান্ট, বুকে কাঁচুলি—সেও গোলাপি রঙের সার্টিনের। মাথায় চুল ঝুঁটি করে ওপরে বাঁধা, চোখে কাজল, ঠোঁটে লিপস্টিক, পায়ে গোলাপি মোজা, গোলাপি জুতো। কাঠের একখানা ঝকঝকে চেয়ারে নিশ্চল বসে থাকতেন মিস কে. নন্দী—আধবোজা চোখ, মুখে একটু হাসি। হঠাৎ মনে হয় ঘুমিয়ে আছেন, নয়তো' সম্মোহিত করে রাখা হয়েছে তাঁকে। একটা মুরগিকে সেই সময়ে ছেড়ে দেওয়া হত খাঁচার ভিতরে—কোক্কর কোঁ করে সেটা ডাকতে থাকত। আর, সেই ম্যানেজার গোছের লোকটা মিস কে. নন্দীকে ডাকতে থাকত, উত্তেজিত করত, হাতের লম্বা সরু সাঠিটা দিয়ে সজোরে খোঁচা মারত কে, নন্দীর পেটে, কোমরে। অবশেষে হঠাৎ কে. নন্দী রক্তবর্ণ একজোড়া চোখ খুলতেন, চারিদিকে তাকিয়ে দেখতেন, তারপর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াতেন। আর একবার হাততালি পড়ত। সম্ভবত ওই শব্দেই ক্ষেপে যেতেন মিস কে. নন্দী। মুরগিটার সঙ্গে তার প্রাণপণ

লড়াই শুরু হয়ে যেত—সেই প্রাণান্তকর পাখা ঝাপটানোর শব্দ, মুরগির অস্ফুট ডাক, আর কে. নন্দীর দাঁত কড়মড় করবার শব্দে আমাদের গায়ের রোমকূপ শিউরে উঠত। মুরগিটা ধরা পড়ত অবশেষে—ততক্ষণে মিস কে. নন্দীর কৌশলে—বাঁধা চুল খুলে পিঠময় মুখময় ছড়িয়ে পড়েছে—ভয়ংকর দেখাচ্ছে তাঁকে। প্রথমেই দু—হাতে টেনে মুরগির মুণ্ডুটাকে ছিঁড়তেন কে. নন্দী—মুরগিটার গলা থেকে হঠাৎ হঠাৎ শ্বাস নির্গত হতে থাকত বলে তখনো তার অস্ফুট ডাক শোনা যেত। পট করে ছিঁড়ে যেত গলাটা—মুন্ডুটা ছুঁড়ে ফেলে কে নন্দী ধড়টাকে দু—হাতে ধরতেন—কাটা গলাটা মুখের কাছে নিয়ে ডাবের জল খাওয়ার ভঙ্গিতে রক্তপান করতেন মিস কে নন্দী। তখন কষ বেয়ে, গোলাবি কাঁচুলি বেয়ে, তলপেট থেকে চুইয়ে গোলাপি জুতো পর্যন্ত নেমে আসত রক্তের কয়েকটা ধারা। তারপর মুরগিটাকে খেতে শুরু করতেন—দু—হাতে পালক ছাড়াচ্ছেন আর ভিতরের মাংসের জঙ্গলে কামড় বসাচ্ছেন—এ দৃশ্যের কোথাও শিল্প ছিল কিনা বলতে পারি না।

মুরগি খাওয়া হয়ে গেলে রক্তমাখা দেহে মুরগির পালক, নাড়িভুড়ি ইত্যাদি ভুক্তাবশিষ্টের মধ্যে অস্থিরভাবে পায়চারী করতেন মিস কে. নন্দী। তখনো তাঁর অভিনয় কেউ ধরতে পারত না। এই সময়ে একটা সাপের ঝাঁপি সেই খাঁচার ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হত। স্যুট পরা ম্যানেজার হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠতেন —'লেডী গণপতি দেখু—উ—উ—ন—ন—'। তার অবাঙালি টানের কথাটা বিটকেল শোনাত। দেখা যেত ঝাঁপির চারধারে কে. নন্দী লাফিয়ে বেড়াচ্ছেন আর ম্যানেজার হাতের সরু সাদা লাঠিটা খাঁচার ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে ঝাঁপির ঢাকনাটা খুলে দিতেই ছিটকে উঠত সাপ। পেখমের মতো ফণা মেলে দিয়ে কে. নন্দীর দিকে তাকাত। প্রথমটায় ভয় পাওয়ার ভান করতেন তিনি—কয়েক পা পিছিয়ে যেতেন। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে হাত বাড়িয়ে দিতেন সাপের দিকে। সাপ ততক্ষণে ঝাঁপি ছেড়ে খানিকটা নেমে এসেছে—ছোবল দিতেই হাত সরিয়ে নিতেন কে. নন্দী। সারা তাঁবুতে শুধু দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শোনা যেত তখন। দ্বিতীয় ছোবলের মুখেই সাপের গলাটা চেপে ধরতেন—আর সারা হাত জুড়ে লিকলিক করে উঠত সাপ, কিলবিল করে জড়িয়ে ধরত তাঁর হাত। অনেকক্ষণ সময় নিতেন কে. নন্দী। খুব আস্তে আস্তে হাতটাকে মুখের কাছে নিয়ে আসতেন —যেন সাপের ঠোঁটে চুমু খাবেন তিনি। এই সময়ে তাঁর শিল্পকর্ম বোঝা যেত—ভঙ্গিতে পেলবতা ফুটিয়ে তুলতেন, তাঁর চোখেমুখে বন্য হরিণের সরল কৌতূহল ফুটে উঠত। পরমুহূর্তেই প্রকাণ্ড হাঁ করলে তাঁর চোখেমুখে বন্য হরিণের সরল কৌতূহল ফুটে উঠত। পরমুহূর্তেই প্রকাণ্ড হাঁ করলে তাঁর রক্তাক্ত মুখ্যাভ্যন্তর দেখে বাচ্চা ছেলেরা ভয়ে চীৎকার করে উঠত, আমরা চোখ বুজে ফেলতাম। ওইটুকুই ছিল কৌশল। হয়তো চোখ চেয়ে ঠিকমতো দেখলে দেখা যেতো বাস্তবিক সাপের মুণ্ডুটাকে খাচ্ছেন না তিনি। পরমুহূর্তেই চোখ চেয়ে দেখা যেত মুণ্ডুহীন সাপের দেহ একখণ্ড দড়ির মতো ঝুলছে, আর সাপের মুড়োটা আরামে চিবোচ্ছেন মিস কে. নন্দী। খেলা ভেঙে গেল।

কিন্তু মাত্র একদিনের জন্যই। তারপর থেকে মিস কে. নন্দী আবার খেলা দেখাতে শুরু করলেন। কিন্তু ওই একদিনেই তাঁর বাজার নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, লোকে ধরে ফেলেছিল মিস কে. নন্দীকে। আর ভিড় জমল না। কে. নন্দীর খেলা শুরু হওয়ার আগেই তাঁবু ফাঁকা হয়ে যেতে লাগল। অবশেষে সার্কাস থেকে তাঁকে বিদায় দেওয়ার সময় হয়ে এল।

আমাদের পটুয়া নিবারণ এই সময়েই একজন মজবুত সঙ্গী খুঁজছিলেন—যে তাঁকে তাঁর শিল্পের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে। প্রবর্তক সার্কাসের ম্যানেজারের কাছে একদিন দরবার করলেন নিবারণ, কিছু টাকাপয়সা দিয়ে কে. নন্দীকে ছাড়িয়ে আনলেন, তারপর একেবারে বিয়ে করে ঘরে তুললেন।

এই সময়ে আমি একদিন নিবারণ কর্মকারের সঙ্গে দেখা করতে যাই। একখানা ছবির সামনে নিবারণ কর্মকার বসেছিলেন। আমাকে দেখে সম্ভবত বিরক্ত হলেন, কিন্তু কিছু বললেন না। কিছুক্ষণ আমরা মুখোমুখি চুপচাপ বসে রইলাম। কিছুই বলার ছিল না। নিবারণ তাঁর ডান হাতটা চোখের সামনে ধরে মনোযোগ দিয়ে

কিছু লক্ষ্য করছিলেন। মনে হল তিনি তাঁর ভাগ্যরেখা ও রবিরেখা মিলিয়ে দেখছেন। অনেকক্ষণ পর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'আমার দুটো আঙুল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।'

আমি কিছু না বুঝে প্রশ্ন করলাম, 'কোন আঙুল!'

উনি ওঁর ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী আমায় দেখালেন 'কিছু বুঝতে পারছেন?'

আমি বললাম, 'না'।

'আমিও বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা। কিন্তু আঙুল দুটো ক্রমশ অবশ হয়ে আসছে।'

আমি আঙুল দুটো দেখলাম। স্বাভাবিক বলেই মনে হল। রোগটা ওঁর মানসিক সন্দেহ করে আমি বললাম, 'শুনেছিলাম আপনি ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়েছেন। আর আঁকছেন না!'

'ছেড়ে দিইনি। তবে দেব।' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন নিবারণ, 'আঙুল দুটোর জন্যেই ছেড়ে দিতে হবে।'

আমি চুপ করে রইলাম। উনি নিজেই বললেন, 'এখন থেকে খেতখামারের কাজ করব ভাবছি।'

আমি ওঁর সামনের সদ্য—আঁকা ছবিটা দেখছিলাম। পালঙ্কের ওপর মিথুনবদ্ধ নগ্ন নর—নারীর ছবি এঁকেছেন তিনি; আর দেখা যাচ্ছে একটা সাপ পালঙ্কের শিয়রে ফণা তুলে পুরুষটিকে দংশন করতে উদ্যত; মেয়েটি সাপটাকে দেখছে—অথচ কিছুই করছে না; তার চোখ সম্পূর্ণ নির্বিকার। কিংবা এও হতে পারে যে মিথুন তখন এমন পর্যায়ে যে বাধা দিলে তার মাধুর্য নষ্ট হয়—তাই মেয়েটি যা নিয়তি তাকে মেনে নিচ্ছে।

হঠাৎ খুকখুক করে হাসলেন নিবারণ। আমি উঠে পড়লাম।

চলে আসবার সময় কে. নন্দীকে দেখা গেল—ঘোমটা মাথায় সারা বাড়ি ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছেন। মনে হল সম্মোহন কেটে গেছে—সেই আধোঘুম ও অর্ধস্বপ্ন থেকে ম্যানেজারের লাঠির খোঁচায় জেগে উঠেই অমানুষিক খাদ্যবস্তুর সম্মুখীন হতে হচ্ছে না বলে তিনি বোধহয় সুখী। কিংবা কে জানে—আমার দেখার ভিতরে ভুলও থাকতে পারে।

গ্রামে জনশ্রুতি ছিল, নানারকম গল্প প্রচলিত হচ্ছিল। কিন্তু সার্কাসের সর্বভুক মহিলার সঙ্গে পটুয়ার যৌথ জীবন ঠিক কোন পর্যায়ে এসে দাঁড়াল তা বোঝা যাচ্ছিল না। কেননা, নিবারণ আমাদের আর ডাকতেন না, গেলে বিরক্ত হতেন। কে. নন্দীও পাঁচজনের সামনে কদাচিৎ বের হতেন। ক্রমশ বাইরের জগৎ থেকে দুজনেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিলেন। এক রকম ভাবে তাঁরা আর পাঁচজনের মনোযোগ থেকে আত্মরক্ষা করে রইলেন।

দীর্ঘদিন পর আমাকে আর একবার ডেকে পাঠালেন নিবারণ। গিয়ে দেখি আঁকবার ঘরে চুপচাপ বসে আছেন নিবারণ। আমি যেতেই প্রশ্ন করলেন, 'আমার স্ত্রীকে আপনি চিনতেন?'

থতমত খেয়ে উত্তর দিলাম, 'ঠিক কি বলছেন বুঝতে পারছি না। তবে মিস কে. নন্দীকে আমরা অনেকেই দেখেছি।'

'আপনি কি বিশ্বাস করেন যে উনি ডাকিনী কিংবা পিশাচ—সিদ্ধ?'

'না'।

'তবে?'

'তবে কি?'

খুব চিন্তিত দেখাল নিবারণকে। কুঞ্চিত কপালে ছোট চোখে উনি ওঁর চারদিকে স্তূপাকৃতি পটগুলোর দিকে চেয়ে দেখছিলেন। সেই চেয়ে—দেখার ভিতর খানিকটা ভয়ের ভাব ছিল। শুকনো ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে উনি বললেন 'কুসুম সার্কাসে যা করত তাকে লোকে কি বলে! সেটা কি শিল্প, না খেলা?'

'কে কুসুম?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'কুসুম মানে—' হতচকিত হয়ে উত্তর দিলেন নিবারণ—'আমার স্ত্রী।'

'কে. নন্দী?'

'হ্যাঁ।' মাথা নাড়লেন নিবারণ 'আমার সন্দেহ ছিল কাঁচা মুরগি ও সাপের মাথা খাওয়ার কথা শুনেছিলাম, ওকে বলা হত পিশাচ—মহিলা।' আবার ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন নিবারণ 'কিন্তু আমার কী মনে হয় জানেন?'

'কী?'

হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন নিবারণ। আর কোনো কথা বললেন না। দেখলাম উনি স্থির দৃষ্টিতে নিজের ডান হাতের দিকে তাকিয়ে আছেন। হঠাৎ বললেন, 'আমি কুসুমকে বুঝবার চেষ্টা করছি।' একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, 'হয়ত একটা জীবন সময় অনেক কিছুর জন্যই যথেষ্ট নয়।'

নিবারণ কর্মকার সামান্য পটুয়া—তাঁর চিন্তায় কিছু উদ্ভট ব্যাপার ছিল—এইটুকুই আমরা জানতাম। সব মিলিয়ে মানুষটা আমাদের কাছে ছিল মজার। কিন্তু এখন কেমন সন্দেহ হল—নিবারণের গলার স্বরে, চোখের চাউনিতে অন্যরকম কিছু প্রকাশ পাচ্ছে। হঠাৎ উঠে গেলেন নিবারণ, দরজার বাইরে মুখ বার করে কী দেখে নিলেন, ফিরে এসে নিজের ডান হাতের দিকে পূর্ববৎ চেয়ে থেকে নিচু গলায় বললেন, 'কিছুদিন আগে এক দুপুরবেলা দেখি কুসুম ছাঁচবেড়ার ওপর এসে বসা একটা মোরগের দিকে স্থির চোখে চেয়ে আছে। আমি ওকে ডাকলাম, সাড়া দিল না।' একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'আপনার কী মনে হয়?'

আমি মাথা নাড়লাম—জানি না।

নিবারণ বললেন, 'আমার মনে হয় স্বাভাবিক মানুষ যা খায়—তা খেয়ে কুসুমের তৃপ্তি হয় না। এ ব্যাপারে আপনি কিছু বলতে পারেন?'

আমি আবার মাথা নাড়লাম—না। আমার গা শিউড়ে উঠছিল।

নিবারণ বললেন, 'একদিন আমি ওর খেলা দেখতে চাইলাম। ও প্রথমে রাজি হল না। বলল—সার্কাসে যা দেখাত তার সবটাই ছিল কৌশল। কিন্তু আমার সন্দেহ ছিল। অবশেষে একদিন আমার সাধ্য—সাধনায় রাজি হল। গভীর রাত্রে আমার সামনে একটা মুরগি কাঁচা খেল ও। সে দৃশ্য বড় ভয়ংকর।' বললেন নিবারণ কর্মকার—তাঁর মুখচোখে ভয় ফুটে উঠছিল—যেন চোখের সামনে গভীর রাত্রে একা এক পিশাচ—মহিলার সামনে বসে থাকার সেই অভিজ্ঞতা তাঁকে এখনো তাড়া করছে। একটু দম নিয়ে বললেন, 'কল্পনা করুন ঘরের বউ যাকে খুব চিনি জানি বলে মনে হয়—হঠাৎ গভীর রাতে তার চেহারা ও স্বভাব বদলে যেতে দেখলে কী মনে হয়!'

আমার কিছুই বলার ছিল না। চুপ করে রইলাম।

নিবারণ বলল, 'কিন্তু ভেবে দেখলে এ ব্যাপারে বোধহয় ভয়ংকর কিছু নেই।' বলেই খানিকক্ষণ চিন্তা করলেন নিবারণ, তারপর প্রায় আপন মনে বললেন, 'ছবি আঁকার সঙ্গে এর তফাত কী? আমি ভেবে দেখছি—অভ্যাস না কৌশল না অসুখ—কোনটা?' দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন নিবারণ, আবার নিজের ডানহাতের সন্দেহজনক দুটো আঙুলের দিকে চেয়ে রইলেন। হঠাৎ বললেন, 'আপনার কি মনে হয় না যে এ ব্যাপারে ওর কিছুই করার নেই;'

'কী রকম?' আমি প্রশ্ন করি।

হাসলেন নিবারণ কর্মকার—'যেমন ছবির ব্যাপারে আমার কিছুই করবার ছিল না। নিশিদারোগার মেয়ের ঘটনাটা ভেবে দেখুন।'

'দেখব'। বললাম। কেমন সন্দেহ হল নিবারণের মাথায় কোনো অদ্ভুত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। কেননা হঠাৎ এক সময়ে বললেন, 'আমার আঙুলগুলো তো' নষ্টই হয়ে যাচ্ছে'—একটু দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'কুসুমকে বলে দেখব, যদি ও আমার ছবি—আঁকার আঙুল দুটো খেয়ে ফেলতে পারে।' বলেই পুরোনো ধরনের খিকখিক হাসি হাসলেন নিবারণ। হঠাৎ গলা নামিয়ে বললেন, 'আপনারা কুসুমকে ভয় করেন, না?'

আমি তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। পাগল আর কাকে বলে! যখন চলে আসি তখনো নিবারণ বিড়বিড় করে যা বলছিলেন তার অর্থ—ওঁর ছবি আঁকার আঙুলগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

আমরা ভেবেছিলাম মিস কে. নন্দী দেবীচৌধুরানীর মতো প্রফুল্লে রূপান্তরিত হয়েছেন। কিন্তু ব্যাপারটা যা বোঝা যাচ্ছে তাতে মনে হয় কোথাও কোনো গোলমাল থেকে গেল।

এদিকে গাঁয়ের লোকেরা কে. নন্দী কিংবা নিবারণ কারুরই এই গাঁয়ে থাকা পছন্দ করছিল না। তারা বলে বেড়াচ্ছিল কে. নন্দী এবার তাঁর শেষ খেলা দেখাবেন। তিনি বড়ই উচ্চাকাঙ্ক্ষাসম্পন্না মহিলা—সাপ মুরগির পর এবার তিনি আরো বড় কিছুর জন্য হাঁ করেছেন। নিবারণের বিপদ ঘনিয়ে এল বলে। মনে হচ্ছিল কে. নন্দীর সেই শেষ খেলাটা দেখার জন্য অনেকেই অপেক্ষা করছে।

ছবি—আঁকা ছেড়েই দিলেন নিবারণ। ঘর থেকে বড় একটা বেরোতেন না। কিন্তু তাঁর ভিতরে যে একটা বিপর্যয় ঘটে গেছে একদিন তার প্রমাণ পাওয়া গেল। গাজনের বাজনা শুনে হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে ঘর ছেড়ে বেরোলেন তিনি। ডেকে উঠলেন—হাত—পা ছুঁড়ে চিৎকার করলেন এবং এই সব ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত রক্তাক্ত শরীরে অবশেষে বুড়ো শিবতলার বটগাছের নীচে লুটিয়ে পড়লেন। কে. নন্দীর সেবা—যত্নে তাঁর শরীর ক্রমশ সুস্থ হল, কিন্তু রোগ কমল না। পথে পথে ঘুরে বেড়ান আর বুড়ো বাচ্চা সকলকেই ডেকে তাঁর ডানহাতটা দেখান 'দ্যাখো তো, আমার আঙুলগুলো, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কেন?'

এই সময়ে একদিন রাস্তায় আমার সঙ্গে দেখা। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে কষ্টে চিনতে পারলেন আমায়। বললেন, 'শুনেছেন কিছু; নিশি দারোগা বলে পাঠিয়েছে যে কুসুমকে ত্যাগ করতে হবে। আশ্চর্য!'

আমি কিছু বললাম না। নিবারণের পিঠে হাত রাখলাম। নিবারণ নিজেই বলে চললেন, 'কুসুম চলে গেলে আমার আঁকার কী হবে!'

'আপনি আবার আঁকছেন?'

'না।' মাথা নাড়লেন নিবারণ, 'আমার আঙুলগুলো নষ্ট হয়ে গেছে।' খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বললেন, 'কিন্তু কুসুমকে আপনারা ভয় পান কেন? আমি তো দেখছি কুসুম সার্কাসে যা করত তাও একটা খেলা। ছবি আঁকা যেমন খেলা, ঠিক তেমনি। কিন্তু মুশকিল—আমরা কেউই অভ্যাস ছাড়তে পারছি না।' বলেই হঠাৎ হা হা করে হাসলেন নিবারণ—'কয়েকদিন আগে আমি একটা পায়রা মারলাম। তারপর ঘাড় মটকে সেটার গলার নলীর দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলাম।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে গম্ভীর হয়ে বললেন, 'মুখ দিতে প্রবৃত্তি হল না। কিন্তু দেখবেন, চেষ্টার অসাধ্য কিছু নেই।'

কয়েকদিন পর নিবারণকে বাস্তবিক দেখা গেল বনডুবির মাঠে—একপাল ছেলেপুলে ঘিরে ধরেছে তাঁকে, আর মাঝখানে নিবারণ একটা আধমরা কবুতরের পালক দু—হাতে পটপট করে ছিঁড়ছেন, কাঁচা মাংসের জঙ্গলে ব্যগ্র কামড় বসাচ্ছেন। তাঁর মুখের বিস্বাদ, বমনোদ্রেক সব কিছুই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল।

এরপর প্রায় সব কিছুই ভক্ষণ করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়লেন নিবারণ। মাঝে মাঝে জ্যান্ত পাঁঠা—ছাগল কামড়ে ধরেন, কুকুরকে তাড়া করে ফেরেন। দু—বার গাঁয়ের লোক তাঁকে বাঁশ পেটা করে আধমরা করল। লোকে নিবারণের নামের আগে 'পাগলা' কথাটা জুড়ে দিল।

আমার মনে হয় নিবারণ ঠিক পাগল হয়ে যাননি। কে. নন্দী সার্কাসে যখন মুরগি এবং সাপ ভক্ষণ করতেন —তখন কেউ তাঁকে পাগল বলেনি, বরং অনেকদূর থেকে পয়সা খরচ করে দেখতে গেছে। নিবারণ সম্পর্কে আমার এই মনে হয় যে তিনি তাঁর শিল্পের অভ্যাস পরিবর্তিত করতে চাইছিলেন মাত্র। মনে হয়েছিল ছবি ছেড়ে বাস্তবিক তাঁর শিল্পগুলি এইবার তাঁকে আক্রমণ করতে শুরু করেছিল। তাই শিল্পান্তরে যেতে চাইছিলেন মাত্র।

এর কিছুদিন পরে একদল বেদে এল আমাদের গাঁয়ে। নানারকম খেলা দেখাল, ওষুধপত্র শিকড়বাকড় বিক্রি করল। তারপর একদিন ছাউনি গুটিয়ে চলে গেল।

দু—একদিন পর নিবারণ আমার কাছে এসে বললেন, 'আমার স্ত্রী কুসুমকে আপনি চিনতেন?'

আমি মাথা নাড়ালাম—হ্যাঁ।

হঠাৎ খিকখিক করে হেসে উঠলেন নিবারণ, বললেন, 'কুসুমের সার্কাসের খেলাগুলো কিন্তু তেমন সাঙ্ঘাতিক কিছু ছিল না। ওর চেয়ে সাঙ্ঘাতিক খেলা আমিই আপনাকে দেখাতে পারি।'

আমি নিবারণকে দেখছিলাম—আগেকার মতোই আছেন নিবারণ। লক্ষ্য করলাম তিনি আর তাঁর ডানহাতের দিকে চাইছেন 'না এবং তাঁর বগলে মোড়কের মধ্যে কয়েকটা ছবি রয়েছে বলে মনে হল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ব্যাপার?'

খিকখিক করে হাসলেন নিবারণ 'কুসুমের সেই খেলাটার কথা বলছিলাম। সেই খেলাগুলো আমিই কুসুমকে দেখাতে শুরু করলাম। কুসুম কিন্তু ভয় পেয়ে গেল। খেলা দেখাতো কুসুম, কিন্তু ওই খেলা নিজে কখনো দেখেনি সে।' একটু চুপ করে থেকে বললেন 'আমার মতোই অবস্থা হল কুসুমের। তার শিল্পও তাকে আক্রমণ শুরু করল।'

আমি চেয়ে ছিলাম। খানিকটা আন্দাজ করে বিস্মিত না হয়ে আমি প্রশ্ন করলাম, 'কে. নন্দী কোথায়?'

'ঠিক জানি না। একদল বেদে এসেছিল লক্ষ্য করেছেন?' আমি বুঝলাম। চুপ করে থেকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার আঙুল।'

নিবারণ উত্তর দিলেন না। আস্তে আস্তে ছবিগুলোর মোড়ক খুলে আমার সামনে পেতে দিলেন। প্রথম ছবিটাতে ছিল দুটো ভয়ংকর কালসাপ পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছে। আমি আর ছবিগুলো দেখলাম না। দেখবার দরকারও ছিল না।

বুঝলাম, পটুয়া নিবারণকে এবার ঠেকান মুশকিল হবে। কেননা, তিনি বুঝতে পেরেছেন তাঁর অস্তিত্বের অপরাংশ তাঁর শিল্পকর্মের বিদ্রোহী যাবতীয় ভয়ংকরতা ও হিংস্রতাকে ভক্ষণ করতে সক্ষম।

## লুলু

লুলুই হচ্ছে সব কিছু মূলে।

লুলু আসলে কে বা তার গুরুত্বই বা কী তা আমার কাছে অস্পষ্ট। তবে যতবারই দেশে কোনো না কোনো ঘটনা ঘটে তখনই আমাকে লুলুর কাছে আসতে হয়, তার সাক্ষাৎকার নিতে। এ যাবৎ তার কত যে সাক্ষাৎকার নিয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু তবু লুলু আমাকে আদপেই মনে রাখেনি। দেখা হলে সম্পূর্ণ নতুন করে পরিচয় দিতে হয় এবং পুরোনো পরিচয়ের কোনো স্মৃতির ঝলকানিও লুলুর ভাবসাবে কখনো ফুটে ওঠে না। এটাই যাকে বলে আপশোস কি বাত।

১৯৪৭ সালের ষোলোই আগস্ট আমি লুলুর সাক্ষাৎকার নিতে আসি, মনে আছে। তখন লুলুর চেম্বার শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ছিল না, তবে সে তখনো এখনকার মতোই ব্যস্ত মানুষ ছিল। দেখা করার জন্য আমাকে অপেক্ষা করতে হয়। ঘরে ঢুকে কিন্তু লুলুকে একটুও ব্যস্ত দেখিনি। টেবিলের ওপর পা তুলে সে বসেছিল। চেয়ারটা পিছন দিকে হেলে দুটো পায়ার ওপর বিপজ্জনকভাবে ভারসাম্য রক্ষা করছে কোনোক্রমে। লুলু মৃদু হেসে বলল—বী কুইক।

—এই স্বাধীনতা, এই চূড়ান্ত জয়, এই দেশ বিভাগ এবং এই...এই... আবেগে আমার গলা বসে গেল।

লুলু মাথা নেড়ে বলল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই স্বাধীনতা, এই দেশ বিভাগ আর যা কিছু সবই খুব চমৎকার। অতি চমৎকার। এই জয়... তবে আমার একটা ভয় হচ্ছে যে, যেসব ইংরেজ এদেশে মারা গেছে তাদের ভূতগুলো চলে যাচ্ছে না। সেগুলোকে যদি না তাড়ানো যায় তবে পাকে প্রকারে ইংরেজও থাকছে। এবং ইংরেজীয়ানাও। এখন আমাদের উচিত হবে ভারতের অতীতের ভূতদের ইংরেজ ভূতের বিরুদ্ধে লাগানো।

লুলু যে সামান্য মাতাল অবস্থায় ছিল তা তখন আমি টের পাই।

গান্ধী—হত্যার পর আমি লুলুর কাছে গিয়ে আবার ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করার পর চেম্বারে ঢুকে দেখি লুলু অবিকল সেইভাবেই বসে আছে।

বলি—এই বিশ্বাসঘাতকতা, এই হত্যা...

লুলু মাথা নেড়ে বলল—জঘন্য। আসলে একজনকে খুন করার মধ্যে কী যে আছে আমার মাথায় আসে না। লাভ কী? আমার তো ভাবতেই জ্বর আসে। খুনের পর ধরা পড়তে হবে, দিনের পর দিন স্নায়ু—ছেঁড়া মামলা চলবে। তারপর ফাঁসি...ওঃ। তার চেয়ে ভালো ব্যবস্থা আছে। ধরুন, কাউকে মারার ইচ্ছে হলে আমি তার একটা মূর্তি তৈরি করে সেটার ওপর গুলি চালালাম, ইচ্ছে মতো তারপর লোকটাকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিলাম যে, অমুক দিন অমুক সময়ে তোমাকে আমি মেরে ফেলেছি। বাস, লোকটাও তা জানার পর একদম মৃতের মতো হয়ে যাবে। অর্থাৎ সব কাজ কর্ম অ্যাকটিভিটি বন্ধ করে দেবে। হত্যাটা হবে প্রতীকী এবং তাতে হিংস্রতাও থাকবে না।

চীন—যুদ্ধের সময় ফের পত্রিকার তরফ থেকে লুলুর কাছে যাই।

—এই যুদ্ধ সম্পর্কে...

লুলু অবিকল একইভাবে চেয়ারে দোল খেতে খেতে বলে—হোপলেস। যুদ্ধ টুদ্ধের কোনো মানেই হয় না। বিশেষ করে চীনেদের সঙ্গে। আমার মনে হয়, এসব ডিসপিউট মেটানোর জন্য অন্য ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

সাগ্রহে বলি—কীরকম?

—ধরুন, চীনের সঙ্গে ভারতের একটা হকি ম্যাচের ব্যবস্থা হল। যদি ভারত জেতে তাহলে তার কথাই থাকবে। হকিতে আপত্তি থাকলে চীন পিংপংয়েও ভারতকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। যাই হোক, আমার কথা হচ্ছে, স্পোর্টসের যুদ্ধটা সেরে নেওয়া ভালো। সিরিয়াসলি মারপিটটা নিছক ছেলেমানুষি। আমি জানি চীন বলছে যে, তিব্বত তাদের। আমার প্রথম বিয়ের আগে আমার বউও বলত সে নাকি আমার, একান্তই আমার। তারপর আরও চারবার বিয়ে করতে হয়েছে আমাকে এবং এখন আবার আমি দারাহীন, কিন্তু প্রথম বউয়ের মতো সব বউই আমাকে ওই একই কথা বলেছে, এবং ওই একই কথা হয়তো এখনো তারা তাদের নতুন নতুন প্রেমিক বা স্বামীর কাছে বলছে। এ সবের কোনো মানে নেই। দুনিয়াতে কেউ বা কিছু কারও বা কিছুর নয়।

সেদিনই আমি লুলুকে বলি—আপনার চেম্বারটা এয়ারকণ্ডিশনড করান না কেন? আর ওই বিপজ্জনক চেয়ারের বদলে আপনি তো অনায়াসে একটা রিভলভিং চেয়ারের ব্যবস্থা করতে পারেন।

এরপরও পাকিস্তান যুদ্ধ, ভিয়েতনাম, কংগ্রেস ভাগ, নকশাল আন্দোলন, যুক্তফ্রন্ট ইত্যাদি বিষয়ে আমাকে লুলুর সাক্ষাৎকার নিতে হয়। কিন্তু সেগুলোর কথা থাক। ইমারজেন্সির পর যখন আমি লুলুর কাছে যাই তার বেশ কিছু দিন আগে তার চেম্বার শীতাতপনিয়ন্ত্রিত হয়েছে এবং সে একটা রিভলভিং চেয়ারে বসে দোল খাচ্ছে। একটু মাতাল।

বললাম—ইমারজেন্সি সম্পর্কে কিছু বলবেন?

লুলু টেবিলে মৃদু চাপড় দিয়ে বলে—আলবাত।

—কী?

—দেয়ার ইজ অ্যান ইমারজেন্সি। খুবই জরুরি ব্যাপার। খুবই আর্জেন্ট। অনেকক্ষণ ধরেই এটা আমি ফিল করছি। চলুন যাওয়া যাক।

—কোথায়?

—জরুরি কাজে। খুবই জরুরি।

এই বলে লুলু উঠে পড়ে। আমার হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নামিয়ে আনে রাস্তায়, গাড়িতে ওঠায় এবং একটা মদের দোকানে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে বলে—এ ব্যাপারটা খুবই জরুরি।

—কিন্তু আমি জরুরি অবস্থা জারি প্রসঙ্গে...

লুলু আধো চোখে আমাকে দেখল। খুবই তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি। দুপেগ করে হুইস্কির হুকুম দিয়ে আমার দিকে চেয়ে বলল—আপনি নতুন জার্নালিজম করছেন, তাই না?

—না। আমি দীর্ঘকাল ধরে...ইন ফ্যাকট আমি আপনার ইন্টারভিউ তো বহুবার... লুলু মাথা চেপে ধরে একটা কাতর শব্দ করল। তারপর বলল—তাহলে আপনি একটি গর্দভ রিপোর্টার।

—কেন? আমি ফুঁসে উঠে বলি। পরমুহূর্তেই আমার মনে পড়ে যায় যে, লুলু অত্যন্ত ইমপর্ট্যান্ট লোক। দেশের অন্যতম প্রধান নায়ক। সবকিছুর মূলেই লুলু। তাই আমি আবার বিনীত হয়ে বলি—হতেও পারে।

লুলু বলে—অত্যন্ত জরুরি।

—কী?

—এই জরুরি অবস্থা। অন্তত সাতাশ বছর আগে এটা জারি করা উচিত ছিল।

কেন?

লুলু তার হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলে—ফর ওয়ান থিং। গত সপ্তাহে আমার দিল্লি যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে যাওয়া বাতিল করতে হয়। আমি ট্রেনের রিজার্ভেশন ক্যানসেল করার জন্য রেল অফিসে ফোন করি। ফোনের রিং হতেই ওপাশে কে যেন রিসিভার তুলে বলল নমস্কার। আমি রং নাম্বার ভেবে ফোন ছেড়ে দিই। কিন্তু তারপর আরও তিন তিন বার সেই আশ্চর্য ঘটনা। রেল অফিস টেলিফোনের জবাব দিচ্ছে,

এবং জবাব দেওয়ার আগে নমস্কারও জানাচ্ছে। জাস্ট থিংক অফ ইট। গত সাতাশ বছর ধরে আমি রেল অফিসে ফোন করে আসছি, কখনো এরকম ঘটনা ঘটেনি।

আমি খুব মন দিয়ে নোটবইতে কথাগুলি লিখছিলাম। লুলু নোটবইটা সরিয়ে নিয়ে বলল—ওহে ইডিয়ট রিপোর্টার, ইমারজেন্সির মর্ম কবে বুঝবে? তোমার হুইস্কির গ্লাসে এক্ষুনি একটা দারুণ ইমারজেন্সি দেখা যাচ্ছে। বরফ গলে গরম হয়ে যাচ্ছে হুইস্কি। আগে ওটা খাও, তারপর লিখবে।

লুলু খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। তার অবাধ্যতা চলে না। হুইস্কি খেতে খেতে আমি বলি—কিন্তু রেল অফিস থেকে টেলিফোনে নমস্কার জানানোটাই তো বড় কথা নয় মিস্টার লুলু। এতে দরিদ্র ভারতবাসীর কী লাভ হবে। ভারতবর্ষের বহু কোটি লোক টেলিফোন জীবনে একবারও ব্যবহার করেনি বা তারা রেল অফিসেও কোনোদিন টেলিফোন করবে না।

লুলু গম্ভীরভাবে বলে—সরকারের বর্তমান নীতিই হচ্ছে ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত গ্রামে গঞ্জে জনসাধারণের হাতের কাছে, নাগালের মধ্যে টেলিফোন পৌঁছে দেওয়া। প্রত্যেক টেলিফোনের সঙ্গে নোটিশ দেওয়া থাকবে : নমস্কারের জন্য রেল বা সরকারি অফিসে টেলিফোন করুন।

আমি উদ্বিগ্ন হয়ে বলি—কিন্তু টেলিফোন করার জন্য তো পয়সাও দিতে হবে মিস্টার লুলু।

—তা হবে। তবে নমস্কারটা ফ্রি পাওয়া যাবে।

কোলের ওপর নোটবই রেখে লুলুর চোখকে ফাঁকি দিকে মন্তব্যটা লিখে নিয়ে আমি বলি—নাগরিক অধিকার সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন উঠেছে এবং বাকস্বাধীনতা।

লুলু আরও দু—পেগ টেনে নিয়ে আরো দু—পেগের প্রথম কিস্তিতে চুমুক দিয়ে বলে—মানবিক অধিকার ভারী সুন্দর কথা, কিন্তু মানে হয় না। অন্তত সতেরোটা ডিকশনারি খুঁজেও অর্থ বের করতে পারিনি।

আমি লুলুর ভুল শুধরে বলি—মানবিক নয়, নাগরিক।

—ওঃ! বলে লুলু হেসে বলে—তাই বলুন। নাগরিক অধিকার! আমি মানবিক ভেবে এমন ঘাবড়ে গিয়েছিলাম! আসলে মানুষ এবং নাগরিক কথা দুটোই আলাদা, অর্থও দুরকম। নাগরিক মানেই কিন্তু মানুষ নয়। এ কথাটা মনে রাখলে আর কোনো গোলমাল থাকে না।

আমি একটু গোলমালে পড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করি—নাগরিক এবং মানুষ কি আলাদা শ্রেণি?

—আলবাত! লুলু প্রায় চেঁচিয়ে বলে ওঠে। চোঁ করে হুইস্কি টেনে নিয়ে আবার খুব নিচু গলায় বলে—আসলে কোনোটারই মানে হয় না।

আমি কিন্তু কিন্তু করে বলি—কিন্তু...

—মূর্খ সাংবাদিক, আপনি অকারণ সময় নষ্ট করছেন। চারদিকে এখন জরুরি অবস্থা। আমাদের প্রয়োজনগুলিও অত্যন্ত জরুরি। সময় নেই। আয়ু বয়ে যাচ্ছে, একদম সময় নেই। দেরি করলে যৌবন ফিরে যাবে, বসন্ত শেষ হবে। উঠে পড়ুন।

লুলুর গুরুত্ব অপরিসীম। তাই আমি তার আদেশে উঠে পড়লাম।

গাড়ি করে লুলু আমাকে এক বিশাল ম্যানসনে নিয়ে গেল। এত বড় একটা বাড়ি কলকাতার মহার্ঘ প্রায় বিঘে দুই জমিতে কি করে জমিয়ে বসেছে তা ভাববার কথা।

স্বয়ংক্রিয় লিফটে ওপরে উঠতে উঠতে লুলু আমার দিকে চেয়ে মহা বদমাশের মতো মুচকি হেসে বলে—এ বাড়িতে আমার প্রায় আধ ডজন প্রেমিকা থাকে।

বলে লুলু আমার মুখের ভাব লক্ষ করতে লাগল। আমি যতদূর সম্ভব মুখখানা ভাবলেশহীন রাখার চেষ্টা করতে করতে বললাম—থাকতেই পারে। খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।

লুলু হাসল না। খুব গম্ভীর মুখে ভ্রূকুটি করে বলল—থাকতেই পারে কেন? আর স্বাভাবিক ব্যাপারই বা কী করে হল?

মুশকিলে পড়ে বললাম—বিজ্ঞান বলে পুরুষেরা বাই নেচার বহুগামী।

লুলু—তাহলে আইন করে একাধিক বিয়ে বন্ধ করা হল কেন? যদি জানোই যে, পুরুষরা বহুগামী তবে তাদের সেই গমনপথে গর্ত খোঁড়ার মানে কী? পচা রিপোর্টার, অনেক লোক যদি বউ থাকা সত্ত্বেও আর পাঁচটা মেয়ের সঙ্গে শোয় তবে তোমরা তেমন গা করো না। বোধহয় তোমরা নিজেরাও শোও। কিন্তু এক জন ভদ্রলোক যদি দ্বিতীয়বার বিয়ে করে তবে সেটা তোমাদের কাছে খবর হয়ে দাঁড়ায়, বুদ্ধু সাংবাদিক, তুমি কি জানো তোমার কতটা ইররাশনাল?

আমি একটু রেগে গিয়ে বলি, কোনো মেয়ের সঙ্গে শুই না। ইন ফ্যাকট আমি এখনো সুযোগই পাইনি। আমার আছে সোশ্যাল স্ট্যান্ডিং, সামাজিক সম্মানবোধ এবং নিজের স্ত্রী সম্পর্কে ব্যক্তিগত ভয়—সেই কারণে ইচ্ছে থাকলেও আমি চরিত্রহীন হতে পারছি না।

লুলু খুবই স্নেহের সঙ্গে আমার দিকে চেয়ে 'তুমি' থেকে আবার আপনিতে ফিরে গিয়ে বলে—রিপোর্টার মহোদয়, এবার বুঝতে পারছেন তো আপনার মতো একটি ছাগলের পক্ষে নাগরিক স্বাধীনতা কত অর্থহীন একটি শব্দ! এমন কী দেশ জুড়ে যেসব নাগরিক রয়েছে তারাও অধিকাংশই মানুষ নয়, আপনারই মতো ছাগল! নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্য মহিলার সঙ্গে শোওয়ার ইচ্ছে ও স্বাধীনতাকে তারা স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়েছেন। সুতরাং নাগরিক স্বাধীনতা নিয়ে আপনারা কী করবেন?

কত তলায় লিফট থেমেছে তা আমি লক্ষ্য করিনি। দোর খুলে লুলু বেরোলো। সঙ্গে আমিও। খুব ঝকঝকে করিডোর দিয়ে লুলুর পিছু পিছু হাঁটতে হাঁটতে আমি বললাম কিন্তু বাক স্বাধীনতা? মিস্টার লুলু, স্বাধীনতার ব্যাপারটা নিয়েও কি আপনি ভাবছেন না?

লুলু সে কথার জবাব না দিয়ে পিতলের পাতে নম্বর লেখা একটা দরজায় কলিং বেল টিপল। দরজা খুলে বছর পঁয়ত্রিশের এক অসাধারণ সুন্দরী দরজার ফ্রেমে দাঁড়িয়ে লুলুকে দেখতে দেখতে তার মুখ ভাবালু এবং মোহাচ্ছন্ন হয়ে গেল। চোখ আলোয় ভরে উঠল, ঠোঁট টসটস করতে লাগল, সমস্ত শরীর প্রত্যাশায় ভারসাম্য হারিয়ে টলোমলো করছিল। লুলু দুহাতে তাকে শরীরের মধ্যে টেনে নেয়, চুম্বন করে এবং বলে—

যা বলে তা অবশ্য লেখা যায় না। চূড়ান্ত ভালোবাসার অসভ্যতম কথা সব। আমি চোখ নামিয়ে নিই এবং না শোনার ভান করতে থাকি।

লুলু সশব্দে তার দশম চুম্বন শেষ করে আমার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে চোখ টিপে বলে—গেঁতো রিপোর্টার, নোট নিচ্ছ না যে বড়? আমি যা বলছি এবং যা করছি এ সব কি ইম্পর্ট্যান্ট নয়? না কি তুমি আমাকে ঠিক গুরুত্ব দিতে চাইছ না?

আমি অনিচ্ছুক আঙুলে ডটপেন বাগিয়ে ধরি কিন্তু লিখতে হাত সরে না।

লুলু বলল—স্কাউন্ড্রেল ছোটলোক ইডিয়ট!

লুলুর গুরুত্বের কথা ভেবে আমি চুপ করে থাকি। এমনকী একটু হাসবারও চেষ্টা করি।

লুলু ঘরে ঢোকে এবং ইশারায় আমাকেও ঢুকতে বলে। আমি ঘরে ঢুকলে লুলু দরজা বন্ধ করে দিয়ে আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে—এবার বলো। আমি অভয় দিচ্ছি, তোমার কোনো ক্ষতি করব না।

আমি মুশকিল পড়ে বলি—কী বলব?

লুলু অবাক হয়ে বলে—তোমার কিছু বলতে ইচ্ছে করছে না?

—না তো!

—ধূর্ত! খল! মিথ্যেবাদী! আমাকে তোমার কিছুই বলতে ইচ্ছে করছে না?

ভয় পেয়ে বলি—না। কিছুই না।

লুলু এবার হা—হা করে হেসে বলে—তোমার সামনেই একটা নষ্ট মেয়েকে চুমু খেলাম; অসভ্য কথা বললাম, তোমাকে না হক গালাগাল দিলাম, অথচ তোমার কোনো রি—অ্যাকশান হচ্ছে না? এটা কি বিশ্বাসযোগ্য মহাত্মা রিপোর্টার? বরং তোমার এখন আমাকে খিস্তি করতে ইচ্ছে করছে, লাথি মারতে ইচ্ছে করছে। বলো, করছে না? কিন্তু হায়, তোমার সেই বাকস্বাধীনতা তুমি কখনোই কাজে লাগবে না। শোনো

কাপুরুষ, আমার যদি কখনো কাউকে শুয়োরের বাচ্চা বা বেজন্মা বলতে ইচ্ছে করে তবে আমি বলি, তুমি কেন পারো না বলতে?

আমি গম্ভীর হয়ে বলি—ভদ্রতাবোধে বাধে।

লুলু হা—হা করে হেসে ওঠে বলে—তাহলে বাকস্বাধীনতা দিয়ে তুমি কি করবে ভিতু সাংবাদিক? যখন যা মনে আসবে তা যদি বলে ফেলতে পারো তবে তোমার বাকস্বাধীনতা আছে, যদি না পারো তো নেই।

বিরক্ত হয়ে আমি বললাম—গালাগাল দেওয়ার অধিকারই তো একমাত্র বাক স্বাধীনতা নয় মিস্টার লুলু। পলিটিক্যাল ইডিওলজি নিয়ে যে মত—বিরোধ, সরকারের কাজকর্ম সম্পর্কে যে বিরুদ্ধে সমালোচনা তাই যদি না করা যায়...

লুলু আমাকে একদম পাত্তা না দিয়ে তার ভাঁটানো যৌবনের সুন্দরী প্রেমিকার দিকে এক পা এগোলো। ঘরের মাঝখান থেকে তার প্রেমিকাও স্খলিত চরণে এগিয়ে আসে এক পা। তাদের দুজনেরই মুখচোখে আনন্দের মোহ, তীব্র কাম ও বিহ্বলতা তবু সে অবস্থাতেও লুলু আমার দিকে জ্বলন্ত একটা দৃষ্টিক্ষেপ করে চাপা স্বরে বলে—নোট নাও বুদ্ধু, সবকিছু নোট করে নাও। প্রত্যেকটা স্টেপ লক্ষ করো। সঙ্গম শেষে আমি আমার প্রেমিকাকে খুন করব। খুব লক্ষ কোরো ব্যাপারটা...

আমি চোখ বুজে ফেলি এবং কানে আঙুল দিই। এবং ওই অবস্থাতেই সোফায় বসে আমি ঘুমিয়েও পড়ি। কিছুক্ষণ বাদে লুলুই আমাকে ঝাঁকুনি দিয়ে জাগায়। আমি চোখ মেলতেই লুলু বিরক্তির গলায় বলে—ড্যাম ইনএফিসিয়েন্ট!

লুলুর পদমর্যাদার কথা মনে রেখে আমি বলি—আজ্ঞে।

একটা আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে কাচে ছায়া দেখে টাইয়ের নট ঠিক করতে করতে লুলু বলে—রিপোর্টার, লাভ—হেট রিলেশন বলে কী একটা কথা আজকাল চালু হয়েছে না? অর্থাৎ আমরা যখন আমাদের প্রিয় বা প্রেমাস্পদকে একই সঙ্গে ভালোবাসি এবং ঘৃণা করি? আমারও ঠিক সেই অবস্থা। আমি আমার সব প্রেমিকাকেই কেন ঘৃণা করি এবং ভালোবাসি বলো তো? এর আগে আমি আমার চোদ্দোজন প্রেমিকাকে খুন করেছি।

বাস্তবিকই লুলুর প্রেমিকাকে ঘরে দেখা যাচ্ছিল না। উপরন্তু সেন্টার টেবিলের ওপর লুলুর সাইলেন্সার লাগানো রিভলভার পড়ে আছে। ঘরের বাতাসে বারুদের কটু গন্ধ। আমি বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে সোজা হয়ে বসি এবং বলি—মিস্টার লুলু, আপনি তাহলে সত্যিই আপনার প্রেমিকাকে খুন করেছেন? সর্বনাশ।

লুলু অবাক হয়ে বলে—খুন করার কথাই ছিল যে!

উত্তেজনায় আমার শরীর কাঁপতে থাকে, আমি চিৎকার করে বলি—বাড়াবাড়ির একটা সীমা আছে মিস্টার লুলু। আমি এক্ষুনি পুলিশের কাছে যাচ্ছি। আপনি যত বড় মাতব্বরই হোন, এর জন্য আমি আপনাকে ফাঁসিতে ঝোলাবে।

মহান লুলু বোধহয় এই প্রথম একটু ভয় পেল। তার চোখে—মুখে দ্বিধা ফুটে উঠেছে। একটু চাপা ধমকের স্বরে সে বলে—চুপ করো মূর্খ! আশেপাশে কেউ শুনে ফেলবে।

আমি চেঁচিয়েই বলি—কিন্তু এটা যে খুন মিস্টার লুলু! আমি এটা চেপে রাখতে পারি না।

লুলু ব্যথিত মুখে চেয়ে বলে—বোকা, ব্যাপারটা ভালো করে ভেবে দেখ। পুলিশের কাছে যাওয়ার চেয়ে অনেক বেশি ভালো কাজ হবে না—যাওয়া। এ ব্যাপারটা চেপে রাখার জন্য তোমাকে আমি অনেক টাকা দেব। অনেক টাকা, যত টাকা—তোমার দশ বছরের বেতনের চেয়েও বেশি। উপরন্তু পুলিশের কাছে গেলে মামলা মোকদ্দমা এবং তজ্জনিত নানা ঝামেলায় তোমাকে জড়িয়ে পড়তে হবে। আর একটা কথা—বলে লুলু তার রিভলভারটা তুলে নিয়ে আমার দিকে তাক করে বলে—ইচ্ছে করলে টাকার বদলে অন্য উপায়েও আমি তোমার মুখ বন্ধ করে দিতে পারি।

লুলু হাসল। আমার শরীরে ঘাম দিল। শ্বাস ছেড়ে আমি বললাম—কত টাকা?

—দু—লাখ।

আমি রুমালে কপালে ঘাম মুছে বললাম—আড়াই।

লুলু রিভলভার পকেটে পুরে নিয়ে আলমারি খুলল। কয়েকটা নোটের বান্ডিল আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল—এই টাকা দিয়ে একদিন আমি জিনিকে কিনে নিয়েছিলাম। এই টাকার হুকুমেই জিনি তার অন্য সব প্রেমিককে ভাগিয়ে দিয়েছিল। আজ সেই টাকায় তোমাকে কিনছি রিপোর্টার। কে জানে এই টাকাতেই কখনো আর একজনকে কিনতে হবে কি না।

আমি টাকার বান্ডিলগুলো ছুঁয়ে থেকে একটু শিউরে উঠি। বলি—আপনি আমাকে ওয়ার্নিং দিচ্ছেন না তো মিস্টার লুলু?

লুলু গম্ভীর হয়ে বলে—না। কিন্তু এ ধরনের রোজগারে কিছু রিস্ক যে সব সময়েই থাকে, তা আপনাকে মনে করিয়ে দিলাম।

আমি গম্ভীর হয়ে বলি—আমাকে ভয় দেখাবেন না মিস্টার লুলু, আমার হার্ট খুব ভালো নয়।

লুলু কাঁধ ঝাঁকিয়ে পুরো প্রসঙ্গটি অবহেলায় ঝেড়ে ফেলে বলে—আপনি নাগরিক অধিকার ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সম্পর্কে কী যেন জানতে চাইছিলেন?

পাশের ঘরেই হয়তো জিনির মৃতদেহ পড়ে আছে। পরিস্থিতিটা খুবই অস্বাভাবিক। তবু নিজের কর্তব্যে অবিচল থেকে আমি নোটবই বের করি এবং আগ্রহের গলায় বলি—দয়া করে বলুন।

কিন্তু পরমুহূর্তেই আনমনা হয়ে যায় লুলু। টাইয়ের ল্যাজে আদর করে হাত বোলাতে বোলাতে উলটোদিকের সোফায় বসে আপনমনে বলতে থাকে—ভালোবেসে দেখিয়াছি মেয়ে—মানুষেরে, ঘৃণা করে দেখিয়াছি মেয়ে—মানুষেরে, অবহেলা করে দেখিয়াছি মেয়ে—মানুষেরে...

—মানে? আমি কিছু অবাক হই।

লুলু হাই তুলে বলে—লিখে নাও, আমরা চাই ভালোবাসার বা সঙ্গমের স্বাধীনতা, ঘৃণা করার স্বাধীনতা, খুন করার স্বাধীনতা।

মিস্টার লুলু! আমি মহান লুলুকে তার মন্তব্য সম্পর্কে সাবধান করার জন্য একটু ধমকের সুরে বলি।

লুলু আমার দিকে অবাক চোখে চেয়ে বলে—তুমিও কি তাই—ই চাও না রিপোর্টার? ভেবে দেখ, খুব ভালো করে ভেবে দেখ, একজন অ্যাভারেজ ভারতবাসী—সে চাকুরে, বেকার বা পলিটিক্যাল ওয়ার্কার যাই হোক—তার মোটামুটি চাহিদাটা কী? সে কিসের স্বাধীনতা চায়? কিসের অধিকার তার কাম্য? ভেবে দেখ রিপোর্টার, ব্যক্তিগত জীবনে তুমিও চাও ভালোবাসা বা আনন্দের স্বাধীনতা। এরপর সামাজিক জীবনের কথা ভেবে দেখ। দেখবে প্রতিনিয়ত রোজ রোজ রাস্তায়, ঘাটে, অফিসে দফতরে যত লোকের সঙ্গে তুমি মুখোমুখি হচ্ছো, তাদের প্রায় অধিকাংশকেই তুমি ঘৃণা করো কি না। করো, তার কারণ তাদের অধিকাংশের আচার ব্যবহার, কথা, ইডিওলজির সঙ্গে তোমার মিল নেই। তৃতীয়ত, ভেবে দেখ, তুমি যাদের ঘৃণা করো, যাদের সঙ্গে তোমার ভাবনাচিন্তা বা বিশ্বাসের অমিল, তোমার স্ত্রী বা প্রেমিকা—যাদের কাছ থেকে তুমি যতটা চাও তার অর্ধেকও পাও না তাদের কাউকে তুমি জেনুইনলি খুন করতে চাও কি না। এবং সেই হননেচ্ছাকে প্রতিদিন তুমি ভদ্রতাবোধ, শিষ্টাচার, মায়া—মমতা ইত্যাদি দিয়ে চাপা দিয়ে রাখছো কি না। ধরো, যদি আজ একটা আইন করে বলা হয়, কেউ খুন করলে তার ফাঁসি বা জেল হবে না, কোনো শাস্তিই দেওয়া হবে না তাকে, তাহলে তোমার কি মনে হয় না যে আইন পাস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশে লক্ষ লক্ষ লাশ পড়ে যাবে?

—আমি জানি না মিস্টার লুলু।

—জানো জানো, স্বীকার করো না। বুদ্ধু রিপোর্টার, আমরা আসলে এই স্বাধীনতাগুলি চাই। লিখে নাও।

আমি ঘামতে ঘামতে লিখতে থাকি।

লুলু উঠে দাঁড়ায় এবং ব্যস্ত পায়ে বেরিয়ে যায়। আমি লিখতে গিয়ে দেরি করে ফেলি। কোনোক্রমে লুলুর শেষ কথাগুলি টুকে নিয়ে যখন ধাঁ করে উঠে দাঁড়াই, তখনই হঠাৎ সামনে দেখি জিনির ভূত দরজায় পিঠ

দিয়ে দাঁড়ানো। মুখে লোল হাসি এবং বিলোল মুগ্ধতা।

ভয় পেয়ে আমি আবার সোফায় বসে পড়ে আড়াই লাখ টাকায় গর্ভবতী আমার ব্রীফ—কেস চেপে ধরি বুকে। জিনি এসে আমার পাশে বসে। আমাকে ছোঁয় এবং বলে—আই অ্যাম ফর সেল।

—তুমি মরোনি জিনি? আমি বলি।

—মরেছি হাজার মরণে। জিনি বলে এবং হাসে।

আমি বুঝতে পারি যে, আড়াই লাখ টাকা আমি রোজগার করতে পারিনি। বুঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলি। কিছুদিন আগে রাইটার্স বিল্ডিংসে আমি একজন মন্ত্রীর ব্রিফিং নিতে যাই। মন্ত্রীর সঙ্গেই যখন করিডোরে বেরিয়ে আসি, তখন বাইরেটা ঘন মেঘে কালো, তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে। মন্ত্রী আর আমি রেলিঙে ভর দিয়ে বৃষ্টি দেখতে থাকি। উনি তখন বলছিলেন, ন্যাশনাল ইনস্ট্রুমেন্টের ফ্যাংশনে দেওয়া ওঁর বক্তৃতাটা আমি কাগজে সবটুকু দেব কি না। আমি ওঁকে আশ্বাস দিচ্ছিলাম। আর তখন হঠাৎ সেই বর্ষা সমাগমের সৌন্দর্য দেখে আনন্দিত মন্ত্রী গুনগুন করে গেয়ে ওঠেন—আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে...। ঋতু বিচার করলে খুবই ভুল গান। কিন্তু তবু সেই অতুলন বৃষ্টির দৃশ্য দেখে তাঁর হৃদয় যে নেচেছিল, তা তো অস্বীকার করার উপায় নেই। কিছুক্ষণ উনি তো কাগজে ওঁর স্টেটমেন্টের কতটা ছাপা হবে, সেই দুশ্চিন্তা ভুলে ছিলেন।

বলতে কি আমিও এই প্রবল সংকটের সময়ে গুনগুন করে গেয়ে ফেললাম—আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে...

জিনি এগিয়ে আসে। মুখে—চোখে বিহ্বল আসঙ্গলিপ্সা, সম্মোহিত স্খলিত বিভঙ্গ। আমিও কি রকম হয়ে যেতে থাকলাম।

কয়েক মাসের মধ্যেই জিনি তার আড়াই লাখ টাকা আমার কাছ থেকে বের করে নিল।

কংগ্রেসের বিপুল পরাজয় ও জনতা পার্টির ক্ষমতায় আসার পর আমি আবার লুলুর কাছে যাই। দেখি, মহান লুলু আগের মতোই তার চেয়ারে বসে, টেবিলের ওপর পা।

বলি—মিস্টার লুলু।

—আপনি বোধহয় কোনো রিপোর্টার।

—আজ্ঞে। আমাকে চিনতে পারছেন না তো! এক সময়ে আপনি আমাকে খুবই স্নেহ করতেন।

লুলু নির্বিকারভাবে বলে—এখনো করি, কিন্তু তার মানে এ নয় যে চিনি।

তার অর্থ?

—ধরুন, ভারতবর্ষের কোনো মহান নেতা কোটি কোটি দেশবাসীকে প্রাণাধিক ভালোবাসেন। দিনরাত তাদেরই মঙ্গল চিন্তা করছেন। কিন্তু তার মানে এ নয় যে কোটি কোটি ভারতবাসীর প্রত্যেককে তাঁর চিনতে হবে। এও নয় যে, একজন দুজন দশজন বা দশ হাজার জন ভারতবাসী না খেয়ে থাকলে, ভিক্ষে করলে, চুরি জোচ্চুরি রাহাজানি করলে, বন্যার কবলে পড়লে বা মরলে তাঁকে বুক চাপড়াতে হবে। এমনকী সারা দেশের মানুষের প্রত্যেককে একবার করে কুশল প্রশ্ন করতে হলেও তাঁর এক জীবনের আয়ুতে কুলোবে না। সুতরাং স্নেহ বা ভালোবাসার সঙ্গে চেনা—পরিচয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। সুতরাং আমি সবাইকে ভালোবাসি, কিন্তু নেসেসারিলি সবাইকে চিনি না।

আমি বিনীতভাবে বলি—বিখ্যাত ও মহানদের ক্ষেত্রে এটা খুবই সত্য কথা।

লুলু হাত নেড়ে প্রসঙ্গটা উড়িয়ে দিয়ে বলে—সে যাকগে। আপনি কি কংগ্রেসের পতন এবং জনতার অভ্যুদয় সম্পর্কে জানতে চান?

—হ্যাঁ, এই পতন অভ্যুদয়ের কথা যদি বলেন।

লুলু উদাস গলায় বলে—জরুরি অবস্থা জারি করাটা খুবই খারাপ হয়েছিল, আর তার ফলেই কংগ্রেসের পতন।

—কিন্তু মহান লুলু আপনিই বলেছিলেন আরও সাতাশ বছর আগেই জারি করা উচিত ছিল, কিন্তু তার মানে এ নয় যে, আরও সাতাশ বছর আগে জরুরি অবস্থা জারি করলে আজ আর তার জারি করার

প্রয়োজনই থাকত না।

—শ্রদ্ধেয় লুলু, জরুরি অবস্থায় যে সব বাড়াবাড়ি ঘটেছে সে সম্পর্কে আপনার মত কী?

খুবই বাড়াবাড়ি ঘটেছিল। রেল অফিস থেকে নমস্কার জানানোটা তার মধ্যে অন্যতম বাড়াবাড়ি।

—লুলু, আপনার কি মনে হয় না এখন রাষ্ট্রের ক্ষমতা বদলের ফলে নাগরিকদের জীবনে নিরাপত্তা ও অধিকার ফিরে এল? মনে হয় না কি জনগণের ইচ্ছাই এর ফলে জয়ী হয়েছে। এ কী জনগণের এবং গণতন্ত্রের জয় নয়?

—নিশ্চয়ই। তবে একথাও ঠিক যে, এই দেশে বরাবরই, এমনকী জরুরি অবস্থার সময়েও জনগণেরই শাসন বলবৎ ছিল। এই শাসক জনগণ হচ্ছে তারাই যাদের রাজ্য বা কেন্দ্রের কোনো মন্ত্রী, কোনো রাজ্যপাল বা স্বয়ং রাষ্ট্রপতি ভালোবাসেন, কিন্তু চেনেন না। তাঁরা জনগণের অস্তিত্বর কথা জানেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা কারা সে সম্পর্কে ভালো ধারণা তাঁদের নেই। এই জনগণেরই একজন এক রিকশাওয়ালা বৃষ্টির দিনে সাউথ এন্ড পার্কের এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে আমাকে পৌঁছে দেওয়ার সময় পাঁচ টাকা নিয়েছিল। আমি তাকে জরুরি অবস্থার কথা বলতে সে খুব কর্তৃত্বের গলায় বলেছিল—তাতে কি? একই রকমভাবে হাওড়া স্টেশনের এক কুলিও আমার কাছ থেকে পাঁচ টাকা আদায় করে। প্রিয় সাংবাদিক, আপনি মহান পুলিশদের কথা ভাবুন, আপনি পবিত্র আদালতের কর্তব্যপরায়ণ কর্মচারীদের কথা ভাবুন, আপনি ছোট এবং বড় ব্যবসায়ীদের কথা ভাবুন, দোকানদারদের মুখশ্রী কি আপনার মনে পড়ে না? আপনি যে—কোনো বৃত্তিতে নিযুক্ত মানুষদের কথা ভেবে দেখুন। বেকার ছেলেছোকরাদের কথা ভাবুন। এরা সবাই সেই মহান জনগণ। রাষ্ট্রের নামে এঁরাই বরাবর দেশ শাসন করে আসছেন। এরা সবাই সেই মহান জনগণ। রাষ্ট্রের নামে এঁরাই বরাবর দেশ শাসন করে আসছেন। এদেশে পুলিশ যখন কোনো চোর, ঘুষখোর বা খুনিকে ধরে, তখন আপনার হাসি পায় জানি। কারণ, পুলিশ যাকে ধরে তার সঙ্গে পুলিশের নিজের কোনো পার্থক্য নেই। তবু মনে রাখবেন ওটুকু পুলিশবেশী জনগণের ন্যায্য শাসন। আদালতে যখন আপনাকে হয়রানি থেকে বাঁচার জন্য গুনোগার দিতে হয় তখন সেটাও জনগণের জন্য জনগণের দ্বারা জনগণের শাসন বলেই মনে করবেন। দোকানদাররা ভেজাল মাল দিলে, দামে বা ওজনে ঠকালে সেটাও তা জনগণেরই লাভ। পাড়ার ছোকররা পুজো বা পলিটিকসের নাম করে চাঁদা তুলে যখন মাল খায়, তখন সেটা জনগণের জন্য জনগণের দেয় বেকার ভাতা বলেই ধরা উচিত নয় কি?

আমি উত্তেজিত হয়ে বলি—মিস্টার লুলু, আপনি প্রসঙ্গান্তরে চলে যাচ্ছেন।

লুলু মাথা নেড়ে বলে—না প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় সাংবাদিক। আমি বলতে চাইছি, এদেশে জনগণের অধিকার ও গণতন্ত্র কখনো ক্ষুণ্ণ হয়নি। বরাবরই ছিল, এখনো আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। জনগণ এক বৃহৎ ও মহান শক্তি। এই শক্তি জনগণের মধ্যেই পারস্পরিক ক্রিয়া করে। রামকে শ্যাম মারে, শ্যাম যদুকে ঠকায়, যদু মধুর কাছ থেকে চাঁদা তোলে এবং মধু রামকে ঘুষ দিয়ে কাজ আদায় করে নেয়। আর এইভাবেই জনগণের বিপুল শক্তি তার ভারসাম্য রক্ষা করছে। আর এভাবেই চলবে। আমার মনে হয়, আমাদের দেশে আর গভর্নমেন্টের কোনো প্রয়োজনই নেই। আমরা স্টেটলেস সোসাইটির কল্পনাকে সার্থক করে তুলেছি।

আমি চোখ কপালে তুলে বলি—বলেন কি মহান লুলু! সরকার না থাকলে যে ভয়ংকর কাণ্ড হবে।

লুলু মাথা নেড়ে বলে—শোনো মূর্খ, সরকার তুলে দেওয়ার কথা আমি বলি না। নট্ট কোম্পানি বা বহুরূপীর নাটুকে দলের মতো বা ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের মতো জনজীবনে উত্তেজনাময় এন্টারটেনমেন্টের জন্য সরকারও থাকবে। একটা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে অন্য একটা রাজনৈতিক দলের তরজা বা কবির লড়াই চলবে, ভোটযুদ্ধ হবে, সংসদে আজকের মতোই যাত্রার আসর বসবে। সেখানে জনগণের মঙ্গলের জন্য আইন পাস হবে, অর্থ বরাদ্দ হবে, ধাঁধা প্রশ্নোত্তরের আসর বসবে। কিন্তু সেগুলির সঙ্গে জনগণের নিজস্ব শাসনব্যবস্থার কোনো হেরফের হবে না।

আমি ভীষণ উত্তেজিতভাবে বলি—মিস্টার লুলু, আপনি এ—সব কী বলছেন এ যে সরকারের অসম্মান।

লুলু উঠে দাঁড়ায় এবং জানলার কাছে গিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলে—সাংবাদিক, এসো দেখ এসে বাইরে কী সুন্দর দৃশ্য।

আমি মহান লুলুর আদেশে জানলার কাছে যাই।

মুহূর্তে দুর্দান্ত লুলু আমাকে পাঁজাকোলে তুলে গরাদহীন জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দেয়। আমি বিকট একটা চিৎকার করে চোখ বুজে ফেলি।

কিন্তু পড়লাম না। লুলু আমার একটা হাত ধরে রেখেছে। একমাত্র লুলুর হাতটিই আমার অবলম্বন, পায়ের তলায় পাঁচতলার শূন্যতা। আমি ঊর্ধ্বমুখ হয়ে কাতর স্বরে বলি—হে মহান লুলু, হে দয়ালু লুলু, আমাকে তুলুন।

লুলু আমাকে ধরেই থাকে। ঠিক যেমন দেখেছিলাম "টু ক্যাচ এ থিফ" ছবিতে। ক্যারি গ্র্যান্ট বাড়ির ছাদ থেকে একটা চোর মেয়েকে ঝুলিয়ে রেখে যেভাবে স্বীকারোক্তি আদায় করেছিল, ঠিক সেইভাবেই লুলু বলল—বলো প্রিয় সাংবাদিক, দিল্লির বা রাজ্যের সরকার এখন তোমার জন্য কী করছে! তুমি যদি এখন মরে যাও তাহলে সরকার কতটা ধাক্কা খাবে? কিংবা তুমি মরে গেলে কিনা সেই সংবাদ কি প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতির কাছে কোনোদিন পৌঁছোবে? তুমি যে আছো তাই তাঁরা জানবেন না।

ঝুলতে ঝুলতে আমি লুলুর কথার সত্যতা খানিকটা বুঝতে পারি। বলি—মহান আপনার কথা অতি সত্য।

—মূর্খ সাংবাদিক, সরকার সরকার বলে দিন রাত তোমরা চেঁচিয়ে বেড়াচ্ছো কিন্তু কোনোদিন বুঝলে না সরকার নয়, তুমি বেঁচে আছো নিজেরই দায়িত্বে। তুমিই তোমার বেঁচে থাকা বা মরে যাওয়ার জন্য দায়ী। তুমি কবে বুঝবে সরকার নয়, তোমার আশেপাশের সামনের ও পিছনের জনগণই তোমাকে দেখছে, দয়া করছে, ঘৃণা করছে, খুন করছে আবার ভালও বাসছে। মূর্খ, আমি সেই জনগণের এক প্রতিনিধি হয়ে তোমাকে আজ জিজ্ঞেস করছি, বলো, তুমি এদেশে রাষ্ট্রমুক্ত সমাজের কথা মানো কি না।

আমি নীচের প্রকাণ্ড শূন্যতার দিকে চেয়ে আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠি—মানি।

—বলো গণতন্ত্রের জয়।

—গণতন্ত্রের জয়।

—বলো তুমিই সেই জনগণ।

—আমিই সেই জনগণ।

এরপর মহান লুলু আমাকে টেনে তোলে। তারপর ব্যক্তি স্বাধীনতা, নাগরিক অধিকার ও গণতন্ত্রের অর্থ বুঝতে আমার আর দেরি হয়নি।

# খোলস

স্কচের বোতলটা খুলতেই একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ বেরিয়ে এল। তারপর যেন নিজেকে একটু সামলে নিয়ে একটা ভারী মোটা গলা বলে উঠল, হাই! গুড ইভনিং!

বোতলটার খোলা গোল মুখটার দিকে স্থির চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বিষাণ বলল, ইভনিং! কিন্তু দীর্ঘশ্বাসটা কেন?

দীর্ঘশ্বাস! ওঃ, নো নো! দীর্ঘশ্বাস কেন হবে। জাস্ট ইগনোর ইট।

দীর্ঘশ্বাসটাও কিন্তু একটা এক্সপ্রেশন। আমার জন্য দুঃখ হচ্ছে?

আরে নাঃ। সন্ধের পর দুনিয়ার লক্ষ লক্ষ লোক হুইস্কি নিয়ে বসে, দুঃখ কিসের? আনন্দ করার জন্যই তো হুইস্কি!

কিন্তু আমার তো সবসময়ে হুইস্কি খেলে আনন্দ হয় না। কখনো কখনো ভারী দুঃখও হয়। ভীষণ দুঃখ, আই ফিল লোনলি।

তাহলে মালে গন্ডগোল আছে। ব্র্যান্ড চেক করে নেবেন।

দোষটা বোধহয় ব্র্যান্ডের নয়। দুঃখও একটা এনজয়মেন্ট।

তাহলে তো ঠিকই আছে। দুঃখেও যদি আনন্দ হয় তো বাক আপ। সঙ্গে একটু শুয়োরের নাড় খেয়ে দেখুন, ব্যাপারটা জমে যাবে।

শুয়োরের নাড়?

সসেজের কথা বলছিলাম স্যার। ফ্রিজে আছে।

ফ্রিজটা নিঃঝুম হয়ে ছিল। ভিতরের ঠান্ডা আরামে যেন কুঁকড়ে বসে আছে। চেতনা নেই। বিষাণ উঠে গিয়ে ফ্রিজের পাল্লাটা খুলতেই ভিতর থেকে একটা বিরক্তির শব্দ বেরিয়ে এল, আঃ, জ্বালালে। মাঝরাতে ঘুমটা ভাঙল...

বিষাণ বলল, সরি। একটু সসেজটা নেব।

সরি স্যার, কাঁচা ঘুমটা ভাঙায় বেফাঁস কমেন্ট করে ফেলেছি। নিন স্যার, আপনারই জিনিস।

সসেজের পাত্রটা বের করে বিষাণ বলল, গুড নাইট।

থ্যাঙ্ক ইউ স্যার, অলওয়েজ ওয়েল কাম...

দরজাটা বন্ধ করে বিষাণ শুধু বলল, শালা।

চলন্ত টিভি থেকে একটা হাই তোলার শব্দ এল। ঘোষককে দেখা যাচ্ছে। সাউন্ড লেভেল মিনিমামে রাখা হয়েছে বলে ঘোষকের কথা শোনা যাচ্ছে না। তবে ছবি দেখা যাচ্ছে। হাই—এর শব্দটা কিন্তু বেশ স্পষ্ট কানে এল বিষাণের।

ঠান্ডা সসেজটা কামড়ে এক চুমুক হুইস্কি খেল সে। তারপর টিভিটার দিকে চেয়ে নিউজ চ্যানেলের অদ্ভুত সব স্পষ্ট কভারেজ একটুও না বুঝে দেখতে লাগল। কোথাকার ছবি, কিসের ছবি তা সে বুঝতে পারছিল না বটে, তবে এটা বোঝা যাচ্ছে যে, পৃথিবীতে কিছু ঘটনা ঘটছে। ঘটেই চলেছে।

যে—লোকটা অ্যাঙ্করিং করছিল সে হঠাৎ বিষাণের দিকে চেয়ে বলল, আর কতক্ষণ চলবে?

কী?

এই বোকা বাক্সের তামাশা? এই ভারচুয়াল রিয়ালিটি?

চলুক না, ক্ষতি কি?

আপনি তো ইমপ্রেসড হচ্ছেন না মশাই।

আমার হাত থেকে রেহাই চাই?

পেলে মন্দ হয় না। অলস লোকের চিত্তবিনোদনই আমাদের কাজ। কিন্তু আপনার চিত্ত বিনোদিত হচ্ছে না। বন্ধ করে দিলেই তো হয়। আই সে টেক এ বিট অফ রেস্ট।

ওকে। বলে বিষাণ রিমোটটা তুলল।

টিভি—টা অফ হয়ে যাওয়ার পর অ্যাঙ্কারের গলা পাওয়া গেল, গুডনাইট, স্লিপ টাইট। থ্যাঙ্ক ইউ।

হুইস্কিটা জলের মতো লাগছে। সসেজ যেন রবার। তবু চিবোতে চিবোতে দেয়ালে টাঙানো আয়নাটার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় বিষাণ। এবং অবাক হয়ে দেখে, আয়নায় তার কোনো প্রতিবিম্ব নেই। শুধু আলোকিত ঘরখানা দেখা যাচ্ছে।

বিষাণ রেগে গিয়ে চিৎকার করে উঠল, আরে। আমার রিফলেকশন কোথায়? অ্যাঁ! কোথায় আমার রিফলেকশন?

আছে বাবা, আছে! বলতে বলতে আয়নার ভিতরে একজন লম্বাপানা লোক খালি গায়ে পায়জামার দড়ি বাঁধতে বাঁধতে এসে দাঁড়ায়।

বিষাণ ধমক দিয়ে বলল, কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

লোকটা একটু অপ্রস্তুত হাসি হেসে বলল, আই ওয়াজ হ্যাভিং সেক্স উইথ ইওর ওয়াইফ!

অ্যাঁ! উইথ মাই ওয়াইফ!

থুড়ি থুড়ি। ভুল হয়ে গেছে। তোমার বউয়ের রিফলেকশনের সঙ্গে।

মিথ্যে কথা! আমার বউয়ের সঙ্গেই তুমি...

আহা, তাতেই বা দোষটা কী হল? তুমি কি তোমার বউয়ের কোনো খোঁজ রাখো? জান এখন সে কোথায়? কিংবা তার মুখশ্রী কি তোমার মনে আছে?

সেসব কি তোমার কাছে শিখতে হবে নাকি?

বল তো সে এখন কোথায়?

আছে কোথাও। এটা বিশাল বড় ডুপ্লেক্স ফ্ল্যাট, আটটা বেডরুম, কে কখন কোথায় থাকে তার কি কিছু ঠিক আছে?

কতদিন তোমাদের দেখা হয়নি?

খুব বেশি দিন নিশ্চয়ই নয়। দিন পনেরো আগেই দেখা হয়েছে। আমরা কথাও বলেছি।

কিন্তু খবর হল, গত পরশু দিনও তোমার সঙ্গে তোমার বউয়ের দেখা হয়েছে, কিন্তু তুমি তাকে চিনতে পারোনি।

মিথ্যে কথা! কোথায় দেখা হয়েছিল?

সিঁড়িতে। সেদিন লিফট খারাপ থাকায় তুমি হেঁটে উঠেছিলে সন্ধেবেলায়, তোমার বউ নামছিল।

ওঃ। হতে পারে আমি তখন অন্যমনস্ক ছিলাম, লক্ষ্য করিনি।

বাজে বোকো না। সুন্দরী মেয়েদের লক্ষ্য করতে তোমার কখনো ভুল হয় না। তুমি হাঁ করেই তোমার বউকে দেখেছিলে। ড্যাব ড্যাব করে।

বাজে বোকো না। তুমি অত্যন্ত টেঁটিয়া লোক।

লোকে তোমাকেও তাই বলে।

অ্যাই! তোমার লজ্জা করে না? দেখছ আমি গায়ে পাঞ্জাবি পরে আছি। তুমি আমার রিকলেকশন হয়েও কি করে খালি গায়ে দাঁড়িয়ে আছ?

সরি, সরি, এক মিনিট।... এই যে দেখ, পাঞ্জাবি পরে এসেছি।

তোমার হাতে মদের গেলাস কোথায়?

তাড়াহুড়োয় ভুল হয়ে গেছে।... এই যে, এবার দেখ। তোমার ডান হাতে মদের গেলাস, আমার বাঁ হাতে। এবার ঠিক আছে?

গো টু হেল।

থ্যাঙ্ক ইউ। আই লাভ হেল।

বিষাণ আয়নার কাছ থেকে সরে এল। বিশাল লিভিংরুম পেরিয়ে সে তার আলো—আঁধারি শোওয়ার ঘরটায় এসে ঢুকল। বড় বড় কাচের জানালায় মোটা পরদা ঝুলছে। ফুটলাইটের আলোতে ঘরখানা খুব সামান্য আলোকিত। মাঝখানে বিশাল খাট? বিছানাকে আজকাল ভয় পায় বিষাণ, ভয় পায় রাত্রিকেও। এক একদিন যথেষ্ট হুইস্কি খেলেও ঘুম আসতে চায় না।

ঘরে ঢুকে পাঞ্জাবি ছেড়ে একধারে ছুঁড়ে ফেলে দিল সে। তারপর স্বগতোক্তি করল, আজ ঘুম আসবে কি?

ভারী মিষ্টি একটি মেয়েলি কণ্ঠস্বর বলে উঠল, আসছি সোনা, একটু বাদেই আসছি। তুমি শুয়ে পড়, আমি লেখাগুলো শেষ করেই আসব তোমার কাছে। সারা রাত তোমাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকব।

লিখছ! কী লিখছ তুমি?

তোমার জন্য কয়েকটা স্বপ্ন লিখছি আমি।

কীরকম স্বপ্ন, ভয়ের না আনন্দের?

তোমাকে সারপ্রাইজ দেব, তাই বলব না।

আমি স্বপ্ন দেখতে চাই না। নিঃসাড়ে ঘুমোতে চাই শুধু।

তাই কি হয়! কত কষ্ট করে লিখছি।

স্বপ্ন থাক, শুধু তুমিই এসো ঘুম।

স্বপ্ন হল আমার গয়না, আমার রূপটান। তুমি শুয়ে পড়ো লক্ষ্মীটি, শুয়ে শুয়ে হিজিবিজি ভাবো, দেখবে কখন নিঃশব্দে আমি তোমাকে বুকে টেনে নিয়েছি, টেরও পাবে না।

প্রায়ান্ধকার ঘরে একটু দাঁড়িয়ে রইল অনিশ্চিত বিষাণ। বলল, রাত্রিটা নিয়েই আমার যত প্রবলেম।

একটা গমগমে পুরুষ—গলা বলে উঠল, আসলে আমার কালো পোশাকটার জন্যই অনেকে ওরকম ভাবে। পোশাকটা কালো হলেও তার মধ্যে মজা কিছু কম নেই।

বিষাণ বিছানায় নিজেকে পেতে ছিল। যদি অতর্কিতে গোপন প্রেমিকার মতো তার ঘুম আসে।

মোবাইল ফোনটার কথা খেয়ালই ছিল না বিষাণের। ছুঁড়ে দেওয়া পাঞ্জাবির বাঁ পকেটে ছিল। বাচ্চা একটা ছেলের হাসির শব্দ হচ্ছে। ওটা তার মোবাইলের সেট করা রিংটোন।

বিষান উঠল। কার্পেটের ওপর পড়ে—থাকা পাঞ্জাবিটা তুলে মোবাইলটা বের করে কানে চেপে ধরে ফের শুয়ে পড়ল।

আমি স্বপ্না।

স্বপ্না! কে স্বপ্না?

তুমি কি খুব বেশি মাতাল হয়ে গেছ? আমি স্বপ্না, তোমার বিয়ে করা বউ।

গড! আসলে আমার একটু তন্দ্রা এসে গিয়েছিল বোধহয়।

তন্দ্রা! তুমি এখন কোথায়?

ফ্ল্যাটে, সাত তলায়।

সরি, ঘুম ভাঙালাম।

তুমি কোথায়?

এই ফ্ল্যাটেই। ছয় তলায়। জয় তোমাকে বার্থ ডে গ্রিটিংস পাঠিয়েছে, এস এম এস করে। পেয়েছো?

না তো!

পাঁচ ছটা মোবাইল থাকলে এরকমই হওয়ার কথা। যাক গে, আমাকে জানিয়েছে, যেন তুমি নাইন ফোর থ্রি থ্রি এইট টু সিক্স টু ফোর ফাইভ নম্বরটা চেক করে দেব।

বার্থ ডে! বার্থ ডে—টা কবে?

আজ। ইউ আর ফর্টি ফাইভ টুডে।

তাই বুঝি!

কে গ্রিটিংস পাঠিয়েছে বললে?

জয়, তোমার ছেলে। জয় যে দুন মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে পড়ছে তা আশা করি ভুলে যাওনি।

আরে না! আই মিসড দি নেম ওভার টেলিফোন। আচ্ছা আমি চেক করে নেবো।

তোমার ইচ্ছে।

ও ঠিক আছে তো!

ঠিক আছে।

গুড নাইট।

নাইট।

ঘুমের গায়ে একটা কোলনের গন্ধ কি? ভারী মোহময়। ভীষণ নরম। ঘুম বিছানায় বেড়ালের মতো নরম শরীরে গড়িয়ে যাচ্ছে। দু—হাতে ঘুমকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে বিষাণ। ধরা দিয়েও দিচ্ছে না। এই সময়টায় ঘুম ও জাগরণের চৌকাঠ বড় সংকটের সময়। জেগে থাকাটাই ধীরে ধীরে ডাইল্যুট হয়ে যায় স্বপ্নে, ঘুমে। এই সময়টায় দোল খায় শরীর, চমকে ওঠে। তারপর ঘুমের কুয়োর মধ্যে পড়ে—যাওয়া।

সেরকমই হল।

বালিশটা ফিসফিস করে তার কানে কানে বলল, হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ স্যার।

ধন্যবাদ, নাউ শাট আপ।

বেড—সাইড রিডিং ল্যাম্পটা নেবানো ছিল। হঠাৎ সেটা কয়েকবার জ্বলে উঠে নিবে যেতে লাগল। বলতে লাগল, হ্যাপি বার্থ ডে...হ্যাপি বার্থ ডে...

তারপর একটা মৃদু কোলাহল সারা ঘর জুড়ে জেগে উঠতে লাগল। আলমারি, চেয়ার, টেবিল, ওয়ার্ডরোব সব জায়গা থেকেই হ্যাপি বার্থ ডে... শোনা যেতে লাগল।

বিরক্ত বিষাণ পেল্লায় একটা ধমক ছাড়ল, চোপরও বেয়াদব!

ঘরটা চুপ করে গেল।

ঘুমের মিষ্টি মেয়েলি গলাটা ভারী করুণ স্বরে বলল, তুমি কি খুব রেগে গেছ সোনা? অত রেগে গেলে আমি কী করে তোমার কাছে যাব বলো তো! আমার যে ভয়—ভয় করছে!

প্লিজ কাম মাই লাভ। প্লিজ...

শুয়ে শুয়ে একটু হিজিবিজি ভাবতে থাকো তো। মাথাটা একটু ঠান্ডা হোক।

মুখোমুখি দেওয়ালে মোনা লিজার একটা বড় প্রিন্ট সুন্দর ফ্রেমে বাঁধিয়ে শখ করে টাঙিয়েছিল স্বপ্না। একদা, যখন এই মাস্টার বেডরুমে তারা একসঙ্গে থাকত। এখন স্বপ্নার আলাদা এস্টাব্লিশমেন্ট ডুপ্লেক্স ফ্যাটটার নীচের তলায়। মোনা লিজার ছবিটা সে কেন নিয়ে যায়নি কে জানে।

মোনা লিজা তাকে দেখছিল। চোখ দুটো ফুটলাইটের আলোয় কেন এত ঝলমল করছে কে জানে। হাসিটাও যেন একটু চওড়া। এতটাই যে, ওর সুন্দর দু—পাটি মিহিন দাঁত দেখা যাচ্ছে।

কোলের ওপর থেকে দুটো হাত তুলে ফ্রেমের ওপর রেখে ঝুঁকে তাকাল মোনা লিজা। ঠিক যেমন কোনো মেয়ে জানালায় হাত রেখে বাইরে নীচের দিকে তাকায়।

কতটা উঁচু বলো তো! নামতে পারব?

বেশি উঁচু নয়। পাঁচ ছয় ফুট হবে।

আমার যা জবরজং পোশাক, নামতে গিয়ে পোশাকে না পা জড়িয়ে যায়।
নামবার দরকারটা কী?
তেষ্টা পেয়েছে যে!
দাঁড়াও, জল দিচ্ছি।
জলের তেষ্টা নয়।
তবে?
বলছি বাপু, আগে নামতে দাও। নামটা ডিফিকাল্ট হবে মনে হচ্ছে।
ওরকম জবরজং পোশাক পরো কেন?
পোশাকটাকে হ্যাটা করছ নাকি? মনে রেখো, এটা জগদ্বিখ্যাত পোশাক।
হলেই বা। আধুনিক পোশাক অনেক ভালো।
মানছি বাপু, কিন্তু আমার তো উপায় নেই। শো—গার্লরা কি নিজের ইচ্ছেমতো পোশাক পরতে পারে?
তুমি কি শো—গার্ল?
তা নয়তো কি বলো? চৌপর দিন লোকে প্যাট প্যাট করে চেয়ে চেয়ে আমাকে দেখছে, তিনশো পঁয়ষট্টি দিন।
ফ্রেমের চৌকাঠে উঠে পড়ল মোনা লিজা। মুখে একটু দুষ্টুমির হাসি। নীচের দিকে চেয়ে বলল, মুক খেয়ে নামছি কিন্তু। পড়ে গেলে একটু ধোরো আমাকে।
ঠিক আছে। নেমে পড়ো, বেশি উঁচু তো নয়।
মোনা লিজা তার বড়সড় ঘের—ওলা গাউন সমেত নেমে পড়ল।
হুইস্কিটা কোথায় রেখেছে?
তাই বলো। হুইস্কির তেষ্টা পেয়েছে তোমার!
ইস, কতক্ষণ ধরে গন্ধ পাচ্ছি আর প্রাণটা আঁকুপাঁকু করছে।
ফ্রিজে রেখেছি। খাও গিয়ে কিন্তু বেশি গিলোনা, আরও মোটা হয়ে যাবে। এমনিতেই তুমি বাপু বেশ থলথলে।
গুলি মারো। আমি বাপু ফ্যাট নিয়ে মাথা ঘামাই না। ভালো—মন্দ খেতে ভালোবাসি, মদ না খেলে শরীর ম্যাজ ম্যাজ করে।
তা চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। অথচ দুনিয়ার লোক তোমার জন্য কেন পাগল কে জানে! দেখতে তো তেমন কিছু নও।
অ্যাই! ভালো হবে না বলছি!
আমি আর্টিস্ট হলে কখনো তোমার মতো সাদামাটা আর গিন্নিবান্নি চেহারার মহিলার ছবি আঁকতে রাজি হতাম না। দা ভিঞ্চি তোমার প্রেমে পড়েছিল বলে এঁকেছিল।
ভ্যাট। প্রেমে পড়বে কি? লোকটা তো হোমো সেক্সুয়াল।
তাই যদি হবে, তাহলে মেয়েদের এত ছবি এঁকেছে কেন?
ও দিয়ে কিছু প্রমাণ হয় না। তবে বাপু, সত্যি কথা যদি বলতে হয় তো বলি আমার ভিতরে সত্যিই কিন্তু রহস্য—টহস্য কিছু নেই। কেন যে মাথা—পাগলা লোকগুলো আমার ছবির দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে আর পাতার পর পাতা মোনা লিজা এই, মোনা লিজা সেই, মোনা লিজার পেটে বাচ্চা আছে, মোনা লিজা আসলে মেয়েবেশী পুরুষ বলে নানা থিওরি আর বুকনি ঝেড়ে সকলের মাথা গরম করে কে জানে বাবা। আমি তো জানি আমি একজন আহ্লাদী, হালকা—পলকা মনের সাদামাটা মেয়ে। কেন যে আমাকে নিয়ে লোকের এত মাথা ব্যথা, আচ্ছা তোমার ফ্রিজে বোধহয় সসেজ আছে, না?
হ্যাঁ। বেশি সাঁটিও না। হাই ক্যালোরি।

হোক বাপু, আমি হুইস্কির সঙ্গে কিছু নোনতা না খেয়ে পারি না।

যাও বাপু, গেল, কিন্তু আমি বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছি। এবং স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছি।

রিনরিনে মেয়েলি গলাটি বলে উঠল, না সোনা, তুমি এখনও ঘুমোওনি। যা দেখছো তা ভারচুয়াল রিয়ালিটি। তোমার মনের প্রক্ষেপ। ওই হারামজাদি খুব নটখটে মেয়েছেলে। তোমার মাথাটা গরম করে দিয়ে গেল। ওই দেখ, ঢক ঢক করে হুইস্কি গিলছে।

এই ফাঁকে তুমি চলে এসো। আমরা ঘুমিয়ে পড়ি!

রোসো বাপু রোসো। যতক্ষণ ওই মোনা লিজা মাগি জেগে আছে ততক্ষণ বিশ্বাস নেই। আমি পাহারা দিই। তুমি বরং তোমার আরও কিছু হিজিবিজি ভাবনা ভাবতে থাকো।

কিসের একটু সুঁই সুঁই শব্দ হচ্ছিল। ঠিক বুঝতে পারছিল না বিষাণ। শব্দটা খুব কাছেই হচ্ছে। সে গাড়ির ব্যাক সিটে বসে এপাশে ওপাশে তাকিয়ে দেখল। কিছু বুঝতে পারল না।

ড্রাইভার, চাকার হাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছে নাকি?

তার ড্রাইভার নরেশ ফিরে তাকিয়ে গম্ভীর মুখে বলল, না স্যার।

তাহলে হাওয়া বেরোবার শব্দ হচ্ছে কেন?

হাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছে বলেই শব্দ হচ্ছে।

তবে বলছ কেন যে চাকার হাওয়া বেরোচ্ছে না?

চাকার হাওয়া বেরোচ্ছে না স্যার।

তবে?

আপনার হাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছে।

আমার হাওয়া! হাউ স্ট্রেঞ্জ। আমার হাওয়া কী করে বেরোবে?

শরীরে তো অনেক ফুটো স্যার, নাক, কান, গুহ্যদ্বার। কখনো কখনো তার কোনো একটা দিয়ে মানুষের হাওয়া বেরিয়ে যায়।

শাট আপ।

ও কে স্যার।

আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল বিষাণ। শব্দটা হয়েই যাচ্ছে। মৃদু কিন্তু অবধারিত। খুব ধীরে, অল্প অল্প করে কোথা থেকে একটা হাওয়া বেরোনোর শব্দ আসছেই।

গাড়ি থামাও। আই মাস্ট চেক।

নরেশ গাড়ি থামাতেই নেমে পড়ল বিষাণ। নেমে গাড়ির চারটে চাকাই ঘুরে ঘুরে দেখল সে। না, চাকা লিক করছে না। তাহলে? তাহলে?

ড্রাইভারের সিট থেকে নরেশ সকৌতুকে তাকিয়ে আছে তার দিকে। পিত্তি জ্বলে গেল বিষাণের। সে ধমক দিয়ে বলল, এই স্টুপিড, অমন হাঁ করে কী দেখছিস?

কে জানে কেন, নরেশ ভয় পেয়ে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে, বিষাণকে ফেলে রেখেই চলে গেল।

এই! এই! বলে চিৎকার করে ছুটছিল বিষাণ। কিন্তু পেরে উঠল না। তার গা থেকে ধড়াস করে কী যেন একটা খুলে পড়ে গেল ফুটপাথে। পিছনের লোকজন হইহই করে উঠল।

বিষাণ অবাক হয়ে পিছনে তাকিয়ে দেখল, ফুটপাথে একটা ফাটা প্রমাণ সাইজের মানুষের খোল পড়ে আছে। আর মানুষজন ছুটে আসছে সেটা দেখতে।

বিষাণ এগিয়ে যেতেই একজন মোটা মতো লোক পানের পিক ফেলে বলল, এটা কি আপনার খোল নাকি মশাই?

বিষাণ খোলসটার দিকে চিন্তিতভাবে চেয়ে ছিল। হ্যাঁ, এটা তারই খোলস। কি করে যে পড়ে গেল গা থেকে!

একটা সবুজ জামা—পরা ছোকরা বলল, সাইকেলের দোকানে নিয়ে যান মশাই, সলিউশন মেরে সারিয়ে দেবে।

একজন বুড়ো মাথা নেড়ে বলল, আরে না। এটা নিতে হবে মোটর টায়ার সারানোর দোকানে। অনেকটা ফেটে গেছে।

পানখেকো লোকটা বিষাণের দিকে চেয়ে হেসে বলল, ওসব কথায় কান দেবেন না। খোলসটা নিয়ে আমার সঙ্গে আসুন। আমি ঠিক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি আপনাকে চলুন।

বিষাণ নিজের খোলসটা তুলে বাঁ কাঁধে চাদরের মতো ঝুলিয়ে নিয়ে বলল, কোথায় যাব?

আরে, এই তো সামনের মোড়টা থেকে বাঁ হাতে ঘুরলেই ভগবানদাস মুচির দোকান। এখন আর কেউ পোঁছে না বটে, তবে বড় ভালো কারিগর। কাঁটা—ছেঁড়া—জোড়ায় ওর কোনো জুড়ি নেই। এমন জুড়ে দেবে যে জোড়ের দাগ অবধি থাকবে না। আসুন আমার সঙ্গে।

মোড় ঘুরে একটা পুরোনো বাড়ির সামনে এসে লোকটা যে জায়গাটা দেখিয়ে দিল সেটা হল, পুরোনো বাড়ির রকের নীচে একটা গুহার মতো গর্ত। সেই গর্তে কতকালের অন্ধকার জমে আছে কে জানে। সামনে চামড়া, রবারের টুকরো, দস্তানা, ভাঙা পুতুল, পুরোনো জুতো, কত কি ঝুলছে। আর তারই ভিতরে একটা খুব বুড়ো থুথুরে লোক কী যেন একটা সেলাই করে যাচ্ছে তার রোগা হাতে।

যান না, মশাই, সাহস করে চলে যান। পারলে ওই বুড়োই পারবে।

এরকম নোংরা, ঝুলকালো কোনো দোকানে কখনো যায়নি বিষাণ। দোকান নয়, যেন প্রাচীন এক গুহা। বুড়ো মানুষটা কি কানে শোনে? চোখে দেখে? বিশ্বাস তো হয় না।

দোকানের সামনে গিয়ে কাঁধের খোলসটা নামিয়ে নিচু হয়ে বিষাণ বলল, শুনছেন। এই খোলসটাই সারিয়ে দিতে পারবেন?

লোকটা মুখ তুলে তাকাতেই কেমন যেন বিহ্বল হয়ে গেল বিষাণ। মুখখানায় যেন কোন সুদূর অতীতের প্রাচীন বলিরেখা। চামড়ার কুঞ্চনের মধ্যে যেন শত সহস্র বছরের ঋতু আবর্তন তার ছাপ রেখে গেছে। মাথায় সাদা চুল কতকাল ছাঁটেনি। গায়ে হাফুচ ময়লা একটা জামা। একবার তাকিয়েই মুখ নামিয়ে তার কাজ করে যেতে লাগল লোকটা।

শুনছেন?

লোকটা আর চোখ না তুলেই বলল, হাঁ হাঁ, শুনিয়েছি মালিক। খোলস সিলাই হবে তো?

পারবেন তো!

লোকটা তেমনি মাথা নিচু রেখেই বলল, হাঁ হাঁ, পারবে, পারবে। বইসুন, হাতের কাজটা করে লেই।

লোকটা তাকে বসতে বলছে? কিন্তু বসবে কোথায় বিষাণ? বসার তো কোনো ব্যবস্থাই রাখেনি লোকটা।

বুড়ো তেড়ছাভাবে তাকে একবার দেখে নিয়ে ফোকলা হেসে বলল, ইটের উপরে বইসুন মালিক। ওই যে, ইট।

লোকটার স্পর্ধা দেখে অবাক মানে বিষাণ। তাকে ইটের ওপর বসতে বলছে! অ্যা।

কতক্ষণ লাগবে?

লোকটা খোলটা তুলে নিয়ে উলটে পালটে একটু দেখে নিয়ে বলল, ভিতরে হাওয়া কমজোরি হলে মাঝে মাঝে এইসন হোয়, হয়ে যাবে বাবু, বইসুন।

বিষাণ বসল না। গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কিছুক্ষণ তার অন্তহীন সেলাই করে যেতে লাগল বুড়ো। তারপর মিহিন গলায় জিজ্ঞেস করল, সিলাই তো হোবে মালিক, কিন্তু ট্যাক্সিডার্মি করতে হব তো! ভিতরে কী ভরবেন?

তার মানে! ওটা তো আমার খোলস!

হাঁ হাঁ, উ তো জরুর। বাত তো ঠিক আছে। লেকিন খোলের মধ্যে কী ভরবেন মালিক? খড়—বিচালি ভরতে পারেন, কাঠের গুঁড়া ভি ভরতে পারেন, মিট্টি ভি ভরতে পারেন।

বিষাণ রাগের গলায় বলে, আমার খোলসের মধ্যে ওসব ভুসিমাল ভরব কেন?

লোকটা একমনে কাজ করতে করতে খুব দূরের গলায় বলে, ভুসিমাল ভরবেন না তো কী করবেন মালিক?

বিষাণ বিরক্ত হয়ে বলে, আহা, আমার খোলসের মধ্যে তো আমি ঢুকব হে মুচিভাই। ভুসিমাল ভরব কেন?

লোকটা যেন বহু দূর থেকে ভারী স্তিমিত স্বরে বলে, হাঁ হাঁ কিউ নেহি? উতো সব বরাবর আছে মালিক। ভুসিমাল ভরলেও যা, আপনি ঘুমে গেলেও তা। সব তো বরাবর আছে মালিক।

বিষাণ রাগে যেন দেশলাই কাঠির মতো দপ করে জ্বলে উঠল। বলে কি বুড়োটা? সে আর ভুসিমাল কি এক হল? লোকটাকে কোটর থেকে টেনে এনে বারকয়েক ঝাঁকুনি দিতে খুব ইচ্ছে হচ্ছিল তার।

তার মনের ইচ্ছেটা টের পেয়েই যেন লোকটা একবার মুখ তুলে তার দিকে তাকাল। দুটো ব্যথাতুর চোখের আর্দ্র দৃষ্টি যেন তার সর্বাঙ্গে পালকের মতো স্পর্শ করে গেল।

কাম হয়ে যাবে মালিক। বইসুন।

বিষাণ খুব ধীরে প্রথমে হাঁটু গেড়ে, তারপর একখানা ইটের ওপর থ্যাবড়া হয়ে বসে পড়ল। নিজের খোলসটার দিকে চেয়ে কেন যে তার চোখে জল আসছিল কে জানে।

কিন্তু এখন তার কোনো তাড়াহুড়ো নেই আর। লোকটার কখন সময় হবে কে জানে। সে চুপ করে বসে অপেক্ষা করতে লাগল।